বেহেশতের রমণীগণ

আলহাজ্জ মৌঃ মোঃ নূরুজ্জামান

বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ
৬, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ জাকির হোসেন ভূঁইয়া
৬, প্যারীদাস রোড,
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৯৯ ইং

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

হাদিয়া ঃ ৯০.০০ টাকা

মুদ্রণে ঃ আবেদ আর্ট প্রেস
৩৮, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রসংগ কথা

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ১৩
ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের গুরুত্ব ১৫
বিবাহ একটি, না একাধিক করা চাই ১৯
একই সাথে কয়জন স্ত্রী রাখা যায় ২১

হযরত খাদীজা (রাঃ)

হযরত খাদীজার (রাঃ) বংশ ও জনক-জননী ২৩
ভাগ্যবতী খাদীজার (রাঃ) জন্মের পূর্বে ২৪
হযরত খাদীজার (রাঃ) জন্ম, শৈশব ও কৈশোর ২৫
হযরত খাদীজার (রাঃ) শিক্ষা-দীক্ষা ২৭
হযরত খাদীজার (রাঃ) দৈহিক সৌন্দর্য ২৭
বিবাহের পয়গাম ২৮
অবশেষে পর পর তিনটি বিবাহ ২৮
পথ পরিষ্কার ৩১
হযরত খাদীজার (রাঃ) ব্যবসার সূচনা ৩২
কন্যার প্রতি শেষ উপদেশ ৩৩
খোয়াইলিদের পরলোক যাত্রা ৩৪
ব্যবসায় ক্ষেত্রে খাদীজা (রাঃ) ৩৫
ব্যবসায় ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ৩৭
হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর খাদীজার (রাঃ) ব্যবসায়ে নিযুক্তি ৩৮
বাণিজ্য সফরে বিদেশ যাত্রা ৩৮
শুকনা বৃক্ষের নবজীবন প্রাপ্তি ৩৯
মাথার উপরে পাখির ছায়াদান ৪০
হযরত খাদীজার (রাঃ) খুশী ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ৪০
প্রণয়ের উন্মেষ এবং বিবাহের প্রস্তাব দান ৪২
বিবাহ সম্পন্ন ৪৫
তৎকালীন বিবাহরীতি ৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
দেন মোহর প্রসঙ্গ	৪৬
খুৎবাহর প্রচলন	৪৭
অভিবাবকের মাধ্যমে বিবাহ	৪৭
নৃত্যগীত প্রসঙ্গ	৪৮
হযরত খাদীজার (রাঃ) প্রতি কোরায়েশদের আক্রোশ	৪৮
কোরায়েশদের ব্যবস্থার প্রতিবিধান	৫০
হযরত খাদীজার (রাঃ) দানের প্রতিদান	৫১
ইসলামের পূর্বাভাস এবং হযরত খাদীজা (রাঃ)	৫২
হযরত খাদীজার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ	৫৭
দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন	৫৯
হযরত খাদীজার (রাঃ) মর্যাদা	৬৪
হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলী	৬৫
হযরত খাদীজার (রাঃ) পরপার যাত্রা	৬৭
হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর সন্তান-সন্ততি	৬৮

হযরত সাওদা (রাঃ)

বংশ ও মাতৃ-পিতৃ পরিচয়	৬৯
প্রথম বিবাহ	৭০
স্বপ্নে সৌভাগ্যের আভাস	৭১
হুযুরে পাক (সঃ)-এর সাথে হযরত সাওদার (রাঃ) শুভ পরিণয়	৭১
সতিনী আয়েশার (রাঃ) সাথে সাওদার (রাঃ) আচরণ	৭৩
স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত	৭৪
স্বামীর অনুবর্তিতায় নিষ্ঠার পরিচয়	৭৫
হযরত সাওদার (রাঃ) বৈশিষ্ট্য	৭৫
হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ	৭৬
সরলমনা হযরত সাওদা (রাঃ)	৭৬
দানশীলতা	৭৭
হযরত সাওদার (রাঃ) মদীনায় হিজরত	৭৮
হজ্জের সফরে হুযুর (সঃ)-এর সঙ্গিনী	৭৮
হাদীস রাওয়ায়েত	৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত সাওদার (রাঃ) রুচি-বৈশিষ্ট্য	৭৯
পরলোক গমন	৭৯

হযরত আয়েশা (রাঃ)

বংশ ও জনক-জননী	৮০
হযরত আয়েশার (রাঃ) জন্মগ্রহণ	৮১
নাম সম্পর্কিত কিছু আলোচনা	৮১
শৈশব	৮২
বিবাহ-পূর্ব শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ	৮৫
শুভ পরিণয়	৮৭
একটি প্রশ্ন ও তাহার জবাব	৮৯
হযরত আয়েশার (রাঃ) বিবাহের পরের ঘটনা	৯০
রুসুমাত অনুষ্ঠান	৯২
হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর শিক্ষার পরিপূর্ণতা	৯৩
স্বামী হুযুর (সঃ)-এর সাথে পারিবারিক জীবন	৯৯
আদর্শ রমণী হযরত আয়েশা (রাঃ)	১০৬
ইবাদত-বন্দেগী	১০৯
অতিথিপরায়ণতা	১১০
বদান্যতা	১১০
জ্ঞান সাধনার অনুপম নমুনা	১১১
ইলমুল কোরআন	১১২
ইলমুল হাদীস	১১৪
ইলমুল ফিকাহ	১১৫
ইলমুল কিয়াস	১১৬
ইলমুল কালাম	১১৬
ইলমুল আদব	১১৭
ইলমুত্তারীখ	১১৭
চিকিৎসা বিজ্ঞান রসায়ণ	১১৭
বক্তৃতা	১১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিক্ষকতা	১১৯
মানবীয় প্রকৃতি	১১৯
ঈলার ঘটনা	১২১
তা'খীর বা দুইটি বস্তুর একটি গ্রহণ করার অধিকার প্রদান	১২৪
হযরত আয়েশার (রাঃ) জীবনে একটি অবান্তর অপবাদ বা এফকের ঘটনা	১২৫
তাইয়াম্মুমের সূচনা	১৩১
হুযুরে পাক (সঃ)-এর মহাপ্রয়াণকালে	১৩৩
হুযুরে পাক (সঃ) বিদায় গ্রহণের পরে ও হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে	১৩৫
হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর চিরবিদায় গ্রহণকালে	১৩৬
হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে	১৩৬
হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে	১৩৭
হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে	১৩৮
জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রযুদ্ধ	১৪১
হযরত আয়েশার (রাঃ) বৈশিষ্ট্যাবলী	১৪৩
নারী জগতে হযরত আয়েশার (রাঃ) আসন	১৪৫
পরলোক গমন	১৪৬

হযরত হাফসা (রাঃ)

বংশ ও পিতা-মাতা	১৪৮
জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ	১৪৯
প্রথম বিবাহ	১৪৯
স্বামীর পরলোক গমন	১৫০
রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে শুভ পরিণয়	১৫০
রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে বিবাহোত্তর জীবন যাপন	১৫১
স্বভাব-প্রকৃতি	১৫২
দাজ্জালের ভয়	১৫৩
ভ্রাতা আবদুল্লাহর প্রতি উপদেশ	১৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে অপকৌশল প্রয়োগ	১৫৪
বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এবং উল্লেখযোগ্য ভক্ত ও গুণগ্রাহীগণ	১৫৪
পরলোক গমন	১৫৫

হযরত জয়নব বিনতে খুজাইমা (রাঃ)

নাম-ধাম, বংশ ও পিতৃ পরিচয়	১৫৫
বিভিন্ন গুণাবলী	১৫৬
প্রথম বিবাহ	১৫৬
নবী-সহধর্মিণীর মর্যাদা লাভ	১৫৭
পরলোক গমন	১৫৭

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)

নাম-ধাম ও বংশ-গোত্র	১৫৮
প্রথম বিবাহ	১৫৯
ইসলাম গ্রহণ	১৫৯
হিজরত	১৫৯
স্বামী আবু সালমার শাহাদাত	১৬১
স্বামীর প্রতি গভীর ভালবাসা	১৬২
হুযুরে পাক (সঃ)-এর সাথে শুভ পরিণয়	১৬৩
বিবাহের পরবর্তীকাল	১৬৩
স্বভাব-চরিত্র	১৬৪
শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গরিমা	১৬৫
বিভিন্ন ঘটনাবলী	১৬৫
হুযুরে পাক (সঃ)-এর ঔষধ সেবন	১৬৫
তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা	১৬৬
ওমর (রাঃ)-কে ধমকি প্রদান	১৬৬
স্বপ্নযোগে রাসূল (সঃ)-এর সাক্ষাত লাভ	১৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাদীস বর্ণনা	১৬৭
হযরত আয়েশা (রাঃ) যাহা বলেন	১৬৭
শিষ্যমণ্ডলী	১৬৭
হুযুরে পাক (সঃ)-এর পবিত্র কেশলাভ	১৬৮
উম্মে সালমার (রাঃ) দৈহিক সৌন্দর্য	১৬৮
সন্তান-সন্ততি	১৬৮
ইন্তেকাল	১৬৮

হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)

নাম, পিতা-মাতা, বংশ	১৬৯
প্রথম বিবাহ	১৬৯
স্বামী-স্ত্রীতে অবর্গ-অমিল	১৭০
হযরত রাসূলে করীম (সঃ) কর্তৃক জয়নবের পাণিগ্রহণ	১৭০
পর্দার নির্দেশ	১৭১
গুণ-গরিমা, গৌরব ও বৈশিষ্ট্য	১৭২
চরিত্র ও ইবাদত-বন্দেগী	১৭২
দৈহিক গঠন	১৭৩
হাদীস বর্ণনা	১৭৩
ইন্তেকাল	১৭৩

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ)

নাম, বংশ ও পিতৃকুল পরিচিতি	১৭৪
প্রথম বিবাহ	১৭৪
মুরাইসীর যুদ্ধ	১৭৪
রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন	১৭৫
বন্দীমুক্তি ঘটনা	১৭৬
উত্তম চরিত্র ও গুণাবলী	১৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাদীস বর্ণনা	১৭৭
পরলোক গমন	১৭৭

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ)

নাম, পিতা-মাতা ও বংশ পরিচয়	১৭৭
প্রথম বিবাহ ও বৈধব্য প্রাপ্তি	১৭৮
হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত বিবাহ	১৭৮
স্বভাব-চরিত্র	১৭৯
সন্তান-সন্ততি	১৭৯
দৈহিক গঠন	১৭৯
হাদীস বর্ণনা	১৮০
ইন্তেকাল	১৮০

হযরত মায়মুনা (রাঃ)

পিতা-মাতা ও বংশ পরিচয়	১৮০
প্রথম দুই বিবাহ	১৮১
নবী-মহিষী হওয়ার মর্যাদা লাভ	১৮১
হুযুরে পাক (সঃ)-এর নির্দেশ পালন	১৮২
হাদীস বর্ণনা	১৮২
পরলোক গমন	১৮২

হযরত সুফিয়া (রাঃ)

পরিচিতি	১৮৩
প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ	১৮৩
হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত সুফিয়ার (রাঃ) বিবাহ	১৮৩
শারীরিক গঠন	১৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাদীস বর্ণনা	১৮৪
বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী	১৮৪
হযরত জয়নবের কটুক্তি	১৮৪
বিপ্লবীদের বেতমিজী	১৮৪
রাসূল (সঃ) কর্তৃক সান্ত্বনা দান	১৮৫
উত্তম রান্না ও আয়েশার অশোভন আচরণ	১৮৫
বিদায় হজ্জের সঙ্গিনী	১৮৫
পরলোক গমন	১৮৫

হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়া (রাঃ)

পরিচিতি	১৮৬

পরিশিষ্ট

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর বহু বিবাহের হেতু	১৮৮

প্রসংগ কথা

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

মানব জীবনে বিবাহ প্রথা অপরিহার্য। কেননা মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলমীনের মানব সৃষ্টির মূল রহস্যই এই যে, তিনি মানব বংশ বিস্তার করতঃ মানব সন্তান দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ ভরিয়া দিবেন। আর তজ্জন্যই মানব-মানবী তথা একটি পুরুষ ও একটি মহিলার মধ্যে বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন রহিয়াছে। একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা আদি মানব হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেহেশতে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার মূল লক্ষ্য সাধন করিতে আদি মানবী মা হাওয়াকে হযরত আদম (আঃ)-এরই এক অঙ্গ হইতে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকেও বেহেশত মধ্যে জায়গা দিলেন। তারপর অবিলম্বে পিতা আদম ও মাতা হাওয়াকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। এইভাবে আদি পুরুষ ও আদি মহিলা হইতেই বিবাহ প্রথার সূত্রপাত হইল।

অতঃপর ঘটনাক্রমে এবং মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হযরত আদম (আঃ) ও মা হাওয়াকে বেহেশত হইতে নশ্বর পৃথিবীতে প্রেরণ করা হইল। সেইদিন হইতেই শুরু হইয়া গেল তাঁহাদের পারিবারিক জীবন যাপন। পিতা আদম (আঃ)-এর ঔরসে মাতা হাওয়ার উদরে জোড়ায় জোড়ায় সন্তান-সন্ততি হইতে লাগিল। একই জোড়ায় থাকিত একটি পুত্র আর একটি কন্যা সন্তান। ইহাদের এক জোড়ার পুত্র সন্তানের সাথে অন্য জোড়ার কন্যা সন্তানের বিবাহ হইতে লাগিল। এই বিবাহের মাধ্যমে তাহাদেরও সন্তান জন্ম শুরু হাইয়া গেল। এইভাবে অচিরেই দুনিয়াতে মানব সন্তান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিন যতই যাইতে লাগিল, মানব বংশ ততই বৃদ্ধি পাইয়া চলিল।

এখানে একটি প্রশ্ন থাকিয়া গেল যে, মানব বংশ বিস্তার করাই যদি আল্লাহ তায়ালার লক্ষ্য হইয়া থাকে তবে সেজন্য বিবাহের কি দরকার ছিল? বিবাহ ছাড়াও যদি একটি নর ও একটি নারীর যৌন মিলন হয়, তবে তাহারই তো সন্তান সৃষ্টি হয়। অযথা আবার বিবাহের ঝামেলা কেন? মানব ব্যতীত অন্য সব জীব-জানোয়ারের বেলায় তো তদ্রূপই হইতেছে। উহাদের কাহারও মাঝেই বিবাহ প্রথার প্রচলন নাই। অথচ প্রতিটি শ্রেণীর জীব-সন্তানেই পৃথিবী পূর্ণ হইয়া আছে।

এই প্রশ্নের অতি যৌক্তিক ও সুন্দর জবাব আছে।

মানব জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন এবং তিনি নিজেই এ জাতিটিকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সেরাসৃষ্টি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং সে হিসাবে তাঁহাকে জ্ঞান, অনুভূতি ও বুদ্ধি-বিবেচনাও দান করিয়াছেন। যাহা জীব জগতের অন্য কোন জাতি বা প্রাণীকেই দেওয়া হয় নাই। অতএব মানব তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক চালনা করিয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনগুলি প্রকাশ করিতে একান্তই বাধ্য।

মানব ব্যতীত জীবের তথা পশু-পাখি ও ইতর শ্রেণীর যে কোন জীব-জানোয়ারের যেইভাবে জীবন-যাপন করা সম্ভব, মানব জাতির পক্ষে তাহা করা সম্ভব নয়। যেহেতু ইতর ও নিকৃষ্ট জীবের যেমন জ্ঞান-বুদ্ধির বালাই নাই, লজ্জা-শরম, সঙ্কোচ বা দ্বিধার কারণ নাই, তাই তাহাদের ক্রিয়া-কর্ম ও আচরণাদি নির্লজ্জ, অশালীন অভদ্রোচিত ও অসামাজিক হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, মানব জাতির সবকিছু তাহার বিপরীত হইতে বাধ্য।

মানুষ এমন কিছু করিতে পারে না, যাহাতে নির্লজ্জতা প্রকাশ পায় বা যাহা অভদ্রোচিত বিবেচিত হয় কিংবা যাহাকে সামাজিক কাজরূপে মনে করা যায় না। মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার প্রয়োজনে লজ্জাকে তাহার প্রধান ভূষণস্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। তাই একটি পশু বা ইতর শ্রেণীর জীব প্রকাশ্যে যেখানে-সেখানে আর একটি পশু বা ইতর জীবের সাথে যৌন মিলনে রত হইতে পারিলেও মানুষ তাহার স্বভাবসুলভ লজ্জার কারণে তাহা পারে না। কেননা ইহাতে সে নিজস্ব স্তর হইতে নিম্নস্তরে নামিয়া যায়। তখন আর তাহার সহিত ইতর জীবের প্রভেদ থাকে না।

এতো গেল লজ্জার কথা। সামাজিক দিক দিয়াও মানুষ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে একান্তই বাধ্য। এইকথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব জাতি সভ্য ও সামাজিক জীব। সভ্যতার আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তু হিসাবে সে আল্লাহর তরফ হইতে দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসা প্রভৃতি জন্মক্ষণ হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সামাজিক জীবন-যাপনের জন্য এইগুলির প্রয়োজন অপরিহার্য। আবার সামাজিক জীবনের মূল উৎস এবং আসল বস্তু পরিবারিক জীবন। তাই মানুষকে সামাজিক জীবরূপে পরিচয় দিতে হইলেই তাহাকে পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার প্রধান এবং মূল কাজটিরই নাম বিবাহ। বিবাহ ব্যতিরেকে পরিবার গঠনের আশা বাতুলতা মাত্র। আর পরিবার গঠন ছাড়া যে সমাজের সৃষ্টি হয় না, তাহা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না।

পরিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপনের লক্ষ্যে যেই বিষয়-বস্তুগুলির একান্ত প্রয়োজন সেই বিষয়বস্তুসমূহ তথা স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রেম-প্রীতি প্রভৃতিকে মানব স্বভাবে আল্লাহ জন্মলগ্নেই দান করিয়াছেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এইগুলি সার্থক ও কার্যকর হয় মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়া। মানুষ যদি পরিবারবিহীন এবং অসামাজিক জীবন-যাপন করিত তবে ঐ বিষয়বস্তুগুলির কোন প্রমাণ মিলিত না। ধরুন যদি জনৈক নর মানুষ জনৈকা নারী মানুষের সাথে যখন ইচ্ছা মিলন ঘটাইয়া যে যাহার পথে চলিয়া যাইত, কেহই কাহারও খবরই রাখিত না। তারপর এই মিলনের ফলে নারীটি হয়ত একটি সন্তান প্রসব করিত, কিন্তু কে ঐ সন্তানের পিতা, কোনদিনই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত না। আর ঐ নর মানুষটিও একথা সহজে স্বীকার করিত না যে, সন্তানটি তাহারই ঔরসজাত। স্বীকার করিতে বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধাও আছে। কেননা ঐ পুরুষটি যেমন ঐ নারীর সাথে মিলন ঘটাইয়াছে; তাহার পরক্ষণেই হয়ত ঐ নারী অন্য কোন পুরুষেরে সাথেও সম্ভোগরত হইয়াছে। এমতাবস্থায় ঐ সন্তান যে প্রকৃতপক্ষে কাহার ঔরসজাত তাহা নির্ণয়ও করা যায় না। যাহার ফলে স্বীয় সন্তানের প্রতি যে স্নেহ থাকা স্বভাবিক তাহা অন্তরে থাকা সত্ত্বেও অবস্থার বিপাকে পড়িয়া ঐ সন্তান সেই পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইত। এতটুকুই নয় শুধু, পারিবারিক জীবনযাত্রা বিহনে মানব সমাজে একটা চরম বিশৃংখলা ও অরাজকতা দেখা দিত। কাহারও সাথে কাহারও পরিচয় বা কোনরূপ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিত না। তখন মানুষের মধ্যকার সব মানবসুলভ স্বভাবগুলি অচিরেই বিলীন হইয়া যাইত। যাহাতে তেমনটি না হইতে পারে তজ্জন্যই পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছে ও সেই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে বিবাহ প্রথাকে।

বিবাহের মাধ্যমে সর্বপ্রথম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে শ্বশুর-জামাতা, শাশুড়ী-জামাতা, শ্যালক-শ্যালিকা, ভগ্নিপতি প্রভৃতি আরও বিভিন্ন কতকগুলি সম্পর্কের

মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধন গড়িয়া উঠে। অতঃপর যখন স্বামী-স্ত্রীর একটি সন্তান জন্ম হয়, তখন হইতে পরস্পরের মধ্যে পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, দাদা, দাদী, নানা, নানী, নাতনী প্রভৃতি সম্পর্কের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করে। ইহার পর ভ্রাতা-ভগ্নি, চাচা-চাচি এবং আরও বহু সম্পর্কের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই যে সম্পর্ক বা আত্মীয়তার বন্ধনগুলি ইহা বিবাহ প্রথার ব্যবস্থা না থাকিলে কোন প্রকারেই সৃষ্টি হইত না। তখন যে মানুষের কি অবস্থা হইত ও তাহারা কেমনভাবে জীবন-যাপন করিত সে কথা ভাবিলেও মন বিষাইয়া উঠে।

কিন্তু আল্লাহর রহমতে মানব জাতির প্রতি তাঁহার অপরিসীম দয়া ও করুণার বলে মানুষকে আল্লাহ সেই অবস্থায় পতিত করেন নাই। মানুষের মাঝে একমাত্র বিবাহ প্রথার মধ্য দিয়াই মানুষ তাহার জীবনের শৃংখলা, সভ্যতা, শোভনীয় আচরণ, শালীনতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছে। বিবাহের এত প্রয়োজন ও গুরুত্ব এই কারণেই বৈ কি! এ জগতে মানব সমাজে এমন কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় নাই, যাহারা বিবাহ প্রথাকে অস্বীকার বা বর্জন করিয়াছে। পক্ষান্তরে, সর্বপ্রকার শ্রেণী, জাতি বা ধর্মানুসারী নির্বিশেষে, সকলেই ইহাকে মানব জীবনে অপরিহার্য বিধান বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ও ইহা সকলেই পালনও করিতেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের গুরুত্ব

জগতের সুসভ্য জাতিগুলির মধ্যে ইসলামের স্থান সবার উপরে। ইহা কোন পক্ষপাতিত্বের কথা নয়, একদেশ-দর্শিতা নয় কিংবা যুক্তিহীন দাবীর কথাও নয়। মানব জীবনে বিবাহের প্রয়োজন আছে, একটি পুরুষের জন্য একটি নারীর প্রয়োজন আছে, ঠিক একইরূপ একটি নারীর জন্যও একটি পুরুষের প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ একটি পুরুষ ও একটি মহিলার সমন্বয় সাধনের মধ্যেই উহাদের উভয়ের জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। উপরোক্ত সমন্বয় বিধান কিংবা পরস্পরের মধ্যে একটা সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করার নামই বিবাহ। এই সম্পর্কে ইসলামের ধর্মগ্রন্থে যেইভাবে পরিষ্কার ও স্পষ্ট উক্তি ঘোষিত হইয়াছে, অন্য কোন ধর্মগ্রন্থেই তদ্রূপ দেখা যায় না। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হইয়াছে, 'হুন্না লিবাসুল্লাকুম অ আনতুম লিবাসুল লাহুন্না' অর্থাৎ পুরুষদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, "হে পুরুষগণ! নারীগণ তোমাদের ভূষণস্বরূপ এবং তোমরাও তাহাদের ভূষণস্বরূপ।" তোমাদের কেহ কাহাকেও বাদ দিয়া চলিতে পার না। কত চমৎকার এই ঘোষণা। কি সন্দুর, গূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে এই ঘোষণার মধ্যে।

অত্র ঘোষণায় অতি স্পষ্টভাবেই একথা বুঝা যাইতেছে যে, কোনও পুরুষ জীবনই একটি নারী ব্যতীত পূর্ণতা লাভে সক্ষম নহে। অনুরূপভাবে কোন নারী জীবনও একটি পুরুষ ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

ইহাছাড়া আর এক কথা এই যে, ইসলাম ধর্মের মতে মানব জাতিকে আল্লাহ এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, কি সেই উদ্দেশ্য তাহা নিজেই আল্লাহ কোরআন মজীদে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা ঃ আমি জ্বিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্য পয়দা করিয়াছি। ইবাদাতের সংকীর্ণ অর্থ শুধু আল্লাহর গুণগান করা ও নামায, রোযা, হজ্জ যাকাত প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ কার্য আদায় করা হইলেও

উহার ব্যাপক অর্থ হইল, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজেকে চালনা করা। মানুষের বাহির ও ভিতর পরিষ্কার এবং পবিত্র রাখাও মুসলমানের এক ধর্মীয় নির্দেশ এবং অবশ্য পালনীয়। সে হিসাবে মানুষের দেহ-মন অপবিত্র বা অপরিষ্কার হইয়া পড়িলে যেমন উহা পাক-পবিত্র করা দরকার ঠিক তেমনি ভাবেই যাহাতে উহা নাপাক ও অপবিত্রতা হইতে না পারে সেদিকেও বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার। আর সেদিকে সতর্ক থাকিতে গেলেই অনেক বিষয়-বস্তু ইসলামের বিভিন্ন বিধি ও বিধান নজরে আসিয়া যায়। ইসলাম বলে যে, একটি নর ও একটি নারীর সমন্বয় সাধন দ্বারা উভয়ের জীবনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় কিন্তু তাহা হইতে হইবে বিবাহের মাধ্যমে। বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় যদি একে অপরের সান্নিধ্যে আসে তবে তাহা হইবে ইসলামের দৃষ্টিতে মহা অন্যায়। এইরূপ ঘটনা ইসলামের বিধানে ভীষণ জঘন্যতা ও ইহাদের উভয়ের জন্য চরম অপবিত্রতা। অথচ এই জঘন্যতা ও অপবিত্রতাই আবার বিবাহ ক্রিয়ার মাধ্যমে হইলে তাহাতে উভয়ের জীবনে আসিবে পরম সার্থকতা এবং পবিত্রতা। উপরন্তু আল্লাহর পক্ষ হইতে মিলিবে অফুরন্ত নেকী।

উল্লেখ্য যে, মহাজ্ঞানবান ও পরম বিচক্ষণ আল্লাহ তায়ালা মানব বংশ বিস্তার এবং সেই কারণে সন্তান জন্মের প্রয়োজনে এক অচিন্তনীয় কৌশল গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা নর-নারী পরস্পরের মধ্যে যৌন আকর্ষণ। যে আকর্ষণের কারণে উভয়ের মধ্যে যৌন মিলন ঘটে ও তাহার ফলে সন্তান জন্মলাভ করে। এই কৌশল বা সূক্ষ্ম ব্যবস্থাটি শুধু মানবের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য প্রতিটি জীবের বেলায়ই অবলম্বিত হইয়াছে। আল্লাহর এই মহান কৌশল যে কতখানি কার্যকর তাহা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেহেতু উহার প্রমাণ আমরা সারা জগত ভরিয়া দেখিতেছি।

তবে আল্লাহ তায়ালার এই কৌশলগত ব্যবস্থাটি এমনই প্রবল যে, ইহার প্রভাব এড়াইয়া চলা ইতর প্রাণী জীব-জানোয়ার কিংবা সেরাসৃষ্টি মানব জাতি কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষতঃ আল্লাহ স্বীয় কৌশল ক্রিয়াটিকে অধিকতর সার্থক এবং কার্যকর করার তাগিদে নর ও নারীর মধ্যে নারীকে কতগুলি দিক দিয়া নরের নিকটে আকর্ষণীয় ও লোভনীয়রূপে গণ্য করিয়াছেন। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে করা হইয়াছে কোমল ও সুন্দর। মুখমণ্ডলকে করা হইয়াছে সুশ্রীমণ্ডিত, কণ্ঠস্বর করা হইয়াছে মিষ্টি-মধুর, যাহাতে অতি স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়।

এই ব্যবস্থা জন্মরহস্য জনিত কারণে অবশ্যই অতি প্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে এই ব্যবস্থারই কারণে অবার একটি ভয়াবহ অবস্থারও সৃষ্টি হইতে পারে। অভিশপ্ত ইবলীস সদা-সর্বদা মানুষের পিছনে লাগিয়া আছে। কিভাবে মানুষকে বিপথে নেওয়া যায়, কোন পথে নিয়া তাহার সর্বনাশ সাধন করা সম্ভব হয়, ইহাই তাহার সার্বক্ষণিক ভাবনা ও চেষ্টা।

একেতো মানুষের ভিতরে আল্লাহ কামোত্তেজনা ও যৌন তাড়না দিয়া রাখিয়াছেন, তদুপরি নারীদের দৈহিক রূপ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য উহা আরও প্রবল করিয়া তুলে। এমতাবস্থায় ইবলীস নরের মনের ভিতর ঢুকিয়া উহাকে বিপথে চালিত করার জন্য মরিয়া হইয়া উঠে। ঠিক এমনি অবস্থা সৃষ্টি হওয়া মাত্রই অপরিচিত পুরুষ একটি অপরিচিতা নারীর সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হইয়া যায়। আর এভাবেই এই দুইটি মানুষ তাহাদের দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতাকে বিনষ্ট করিয়া মারাত্মক পাপ ডাকিয়া আনে।

অপরিপক্ক জ্ঞানসম্পন্ন কোন কোন লোক বলে যে, তাহারা মানসিক সাধনার দ্বারা মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিয়া ঐরূপ দুর্ঘটনার কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু সত্য ও বাস্তবতার নিরীখে এবং পরিপক্ক জ্ঞানসমৃদ্ধ লোকদের কাছে ওকথা নিছক অবান্তর। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহাকে অস্বীকার করা খামখেয়ালীর তুল্য। প্রয়োজনের তাগিদে আল্লাহ প্রদত্ত কোন কাম রিপুটিকে কোন সাধনার দ্বারা বিতাড়িত করা সম্ভব নয়—যদিও বা সাময়িকভাবে নিস্তেজ করা যায়। কিন্তু সহসা সে নিজেরই অগোচরে আত্মপ্রকাশ করিয়া মহা অঘটন ঘটাইয়া দেয়। ইহা বারণ করার সাধ্য কোন ব্যক্তিরই নাই। যাহারা ইহা অস্বীকার করিয়া অন্য কথা বলে, তাহারা হয় নির্বোধ, না হয় মিথ্যাবাদী। তেঁতুল দেখিলে যে কোন লোকের রসনা সিক্ত হয়। একথা যে স্বীকার করে না, তাহার কথার কোন মূল্য নাই। পুরুষের কাছে নারী অবিকল তেঁতুলতুল্য। তেঁতুল দেখিলে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক রসনায় পানি আসিবেই। ঠিক একইভাবে একটি যুবক পুরুষ একটি যুবতী নারীকে দেখিলে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক মনের কোণে কু-বাসনা জাগিয়া উঠিবেই, যাহা মানুষকে অতি সহজেই পাপপথে নিয়া যায়।

এখন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তবে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় কোথায়? এই রোগটির চিকিৎসা কি? ইহার জবাব একটি—তাহা, পরিণত বয়স আসিলেই নর ও নারীর বিবাহ বন্ধন। বিবাহের ফলে মানব মনের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা লাঘব হইয়া যায়। চরিত্রে ধীর-স্থিরতার আগমন ঘটে। মন শান্ত ও নিষ্কলুষ হয়। কুধারণা, কুবাসনা মন হইতে বিদূরীত হয়। তাহাছাড়া আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

অতঃপর আর এক কথা বলি, যদি ধরিয়াও লওয়া যায়—চেষ্টা, যত্ন, সাধ্য-সাধনার দ্বারা কামপ্রবণতাকে নিস্তেজ করা সম্ভব। আর এমনও শুনা যায়, বিভিন্ন ধর্মের কোন কোন লোক ব্রাহ্মচর্য অবলম্বন করে। তাহারা বিবাহের পক্ষপাতী নয়। আমাদের ধর্মেও কিছু এমন লোক আছে, যাহারা মনে করে যে, বিবাহর দ্বারা পার্থিব ঝামেলা সৃষ্টি হইয়া থাকে। যথা, সংসার সৃষ্টি হইয়া সন্তান-সন্ততির উদ্ভব হইয়া মানুষ দুনিয়াবী মোহ ও মায়া-মমতায় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। যাহার ফলে পারলৌকিক চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও আল্লাহর ইবাদাতের খেয়াল তাহার অন্তর হইতে দূর হইয়া যায়। কাজেই তাহারা সংসার ও পরিবারের মায়াময় পরিবেশ হইতে নির্জন বনে-জঙ্গলে গিয়া আল্লাহর ধ্যানে নিবিষ্ট হয়। কিন্তু এ পথও মানুষের কাম্য হইতে পারে না। যেহেতু আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা এ পথে ব্যাহত হইয়া থাকে। ইসলাম কোনদিনই এই নীতিকে উত্তম বলে নাই। ইসলাম বলে, আল্লাহর নির্দেশ পালন কর। তাঁহার রাসূল (সঃ)-এর নীতি অনুসারে চল এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন কর। এই দুনিয়া যদিও ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করা চলে না। দুনিয়ার মায়া-বন্ধন ও মোহ-মমতায় আকৃষ্ট হইয়া পরকাল ভুলা যাইবে না কিন্তু দুনিয়ার প্রয়োজনীয় কাজগুলি অবশ্যই করা চাই। দুনিয়ায় আসিয়া সংসারধর্ম পালন করা ও মানুষের সাথে যথাবিধি সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলা, নিজের ভিতরে যে গুণ ও যোগ্যতাগুলি আছে, তদ্দ্বারা মানুষের উপকার করা ও মানুষকে সেই গুণে গুণবান ও যোগ্যতায় সুযোগ্য করিয়া তোলা ইসলামের এক প্রধান নির্দেশ। তাহাছাড়া মানুষের সমাজে থাকিয়া গুণবান ও

যোগ্যতম মানুষের নিকট হইতে গুণ ও যোগ্যতা অর্জন করাও এক বিশেষ কর্তব্য। মানব সমাজ ছাড়িয়া নির্জন এলাকায় বসবাস দ্বারা এসব কাজগুলি করা সম্ভব হয় না। তাহাছাড়া সংসার ধর্ম পালন তথা পারিবারিক জীবন-যাপন করা ইসলামের বিধানে এক প্রধান কর্তব্য। স্মরণ রাখার কথা যে, ইসলামে বৈরাগ্যের কোন স্থান নাই। সংসার বিরাগী—চিরকৌমার্য ব্রত পালনকারী—নির্জনবাসী দরবেশ ব্যক্তির সারাদিন-রাত্রির ইবাদাত অপেক্ষা সংসার ধর্ম পালনকারী বিবাহিত ব্যক্তির কিছুক্ষণের ইবাদাতের মূল্য অনেক বেশী।

এ কথাটিতো অতি সহজেই বুঝা যায়, যেখানে কোন একটি কাজ করার ব্যাপারে কোন বাধা নাই, প্রতিবন্ধকতা নাই, যেখানে উহা সম্পাদন করা সহজ হইয়া থাকে। বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ স্থানে উহা সম্পাদন করা তেমন সহজ নয়। তবু যদি বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ উপেক্ষা করিয়া উহা সম্পাদন করে তবে তাহার গুরুত্ব অনেক বেশী। কথাটি আর একটি উপমার দ্বারা খুলিয়া বলিতেছি। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি। তাহাদের প্রতি নির্দেশ আল্লাহর হুকুম পালন করা। উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী সারা জীবন ভরিয়া তাহারা আল্লাহর হুকুম পালন করিতেছে ও রোজ কিয়ামত পর্যন্তই একইভাবে পালন করিয়া যাইবে। অবশ্য তাহাদের হুকুম পালনে কোন বাধা-বিপত্তি বা প্রতিবন্ধকতা নাই। কোন প্রতিকূল পরিবেশও নাই। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তাঁহার বান্দা মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকেও তাঁহার ইবাদাত করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। অথচ আল্লাহ মানুষকে ইবাদাতে বাধাদানকারীরূপে তাহার অভ্যন্তরে ষড়রিপুরূপী কু-প্রবৃত্তিকে বাসা বানাইয়া দিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, মানব জাতির চিরশত্রু প্রবল শক্তির অধিকারী ইবলীসকে মানুষের পিছে নিয়োগ করিয়াছেন। আর সে প্রতিমুহূর্তে মানুষকে ইবাদাত-বিমুখ করিয়া বিপথে চালনা করার চেষ্টায় নিয়োজিত রহিয়াছে। এই কারণেই মানুষের ইবাদাতের মূল্য ফেরেশতাদের ইবাদাত অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক। এই কারণেই মানুষের মর্যাদা ফেরেশতাদের তুলনায় অনেকাংশে বেশী।

মূল কথা, প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে থাকিয়া উদ্দেশ্য সাধনে সফল হইলে তাহাই হইল প্রকৃত সফলতা। আর অনুকূল পরিবেশে বসবাস করিয়া সফলতা লাভ সহজসাধ্য বিধায় তাহার মূল্য ও গুরুত্ব অনেক কম। কেননা ইহাতে তাহার পরীক্ষা হইল না যে, প্রতিকূল পরিবেশে কতদূর কি করিতে পারিত।

সর্বশেষ কথা, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন যে, "লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ" অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের জন্য পরমোৎকৃষ্ট আদর্শ নিহিত রহিয়াছে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে।

আল্লাহর এই অতি স্পষ্ট বাণীর দ্বারা আমরা একথা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারি যে, আমাদের সেই মহান রাসূল (সঃ) আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, আমাদের জন্য কেবল উহাই গ্রহণীয় ও সর্বক্ষেত্রে পালনীয়ও তাহাই। যেহেতু উহাই আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ আমরা তাঁহার পবিত্র জীবনে কি কি আদর্শ দেখি? দেখিতেছি, তিনি নিজের জীবনে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার সন্তান-সন্ততি হইয়াছে। বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন বেষ্টিত জীবন-যাপন করিয়াছেন তিনি। শুধু তাই নয়, পুরাপুরি

এক সংসারী লোকের ন্যায়ই তিনি পরিবার প্রতিপালনের জন্য দস্তুরমত রুজী-রোজগারও করিয়াছেন। কে না জানে—তিনি সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সকল নবী-রাসূলের সরদার। অথচ তিনি আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য ও তাঁহাকে গভীরতরভাবে স্মরণ এবং ডাকার উদ্দেশ্যে নির্জন এবং নিরিবিলি পরিবেশ তথা সংসার ছাড়িয়া বন-জঙ্গলবাসী হন নাই। বরং অন্যকেও বিবাহের জন্য উৎসাহ দিয়াছেন। উৎসাহই নয় শুধু; বিবাহ করার জন্য তিনি মুসলমানগণকে কঠোর নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, যে লোক বিবাহ করিল না, সে আমার দলভুক্ত নয়।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! এইবার চিন্তা করুন স্বয়ং আল্লাহ যাহার সম্পর্কে বলেন, তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ রহিয়াছে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর মধ্যে। আমরা কি তাঁহার আদর্শ অবলম্বন করিব, না তাঁহার বিপরীত আদর্শের কথা যাহারা বলে, তাহাদের কথা পালন করিব? অথচ আমরা স্পষ্টরূপেই দেখিতেছি, আমাদের রাসূল (সঃ)-এর আদর্শসমূহ বাস্তবধর্মী, মানবীয় স্বভাব ও চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যশীল। পক্ষান্তরে, তাহার বিপরীত আদর্শসমূহ একেবারেই অবাস্তব এবং মানবীয় চরিত্রের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিবাহ একটি, না একাধিক করা চাই

পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হইল ও বুঝা গেল যে, প্রতিটি নর ও নারীর জন্য বিবাহ প্রথা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। যে এ কার্যে বিরত থাকে বা ইহাকে অবহেলা করে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) তাঁহাকে স্বীয় উম্মত বলিয়া স্বীকার করেন না। অতএব বুঝিতে পারা গেল যে, নিজেকে হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর খাঁটি উম্মতরূপে পরিচয় দিতে গেলে তাহার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। অতঃপর বাকী থাকে বিবাহ জীবনে একটি, না একাধিক করার প্রয়োজন আছে। এই প্রশ্নের উত্তর মাত্র একটি কথায় দেওয়া সম্ভব নয়; বরং তা কিছুটা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। এমন কতকগুলি কাজ আছে, যাহা এক অবস্থায় গ্রহণীয় কিন্তু অন্য অবস্থায় বর্জনীয়। আবার এমন কাজও আছে, যাহা একজনের পক্ষে করা উচিত আবার অন্যজনের পক্ষে অনুচিত। বিবাহের সংখ্যা নির্দ্ধারণ ঠিক এই শ্রেণীর কাজ।

মূল বিবাহের ক্ষেত্রে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু তাহা কয়টি করিবে, এই ব্যাপারে প্রথম কথা হইল, স্বাভাবিক অবস্থায় যে কোন পুরুষ বা নারীর জন্য একটি বিবাহই কাম্য। তবে অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইলে যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কারণবশতঃ বিচ্ছেদ ঘটিলে অথবা উভয় পক্ষের মধ্যে কোন একজনের মৃত্যু ঘটিলে অন্যজনের পক্ষে পুনর্বিবাহ করা অবাঞ্ছিত নয় বরং বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তব্য হইয়া পড়ে।

তারপর কথা থাকে যে, পুরুষ একটি স্ত্রী থাকিতে আরও স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে কি না এবং নারীরই বা একজন স্বামী বর্তমান থাকাকালে আরও স্বামী গ্রহণ করার অধিকার আছে কি না?

প্রশ্নটিতে দুইটি অংশ বিদ্যমান। উভয় অংশের উত্তর এক সাথে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই ভিন্ন ভিন্নভাবেই উহা উল্লেখ করিতেছি। প্রথম অংশের জবাব এই যে, একটি পুরুষ তাহার স্ত্রী বর্তমান থাকাকালে আরও স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। শরীয়তে ইহা সিদ্ধ। তবে

শরীয়ত মোটামুটিভাবে এই কাজকে সিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ দিলেও অবস্থার তারতম্যে ইহাতে সুফল ও কুফল দুইটি দিকেরই সম্ভাবনা থাকে। যেমন কাহারও বেলায় একাধিক স্ত্রী দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে দারুণ অশান্তি এবং চরম অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, আবার কেহ কেহ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতঃ দাম্পত্য ও পারিবারিক শান্তির উদ্ভব ঘটাইতে সক্ষম হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইহা এমন একটি ব্যাপার যে, ঘটনা, অবস্থা এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন রকম ফল দান করে। ধরুন একটি অত্যন্ত রোগাটে, স্বাস্থ্যহীন, অর্থহীন ও অভাবগ্রস্ত পুরুষ, যাহার পক্ষে একটি স্ত্রীরই দাম্পত্য চাহিদা এবং ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য প্রয়োজনসমূহ মিটানো সম্ভব নয়, সে যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে তবে তাহার সংসারে চরম অশান্তি দেখা না দিয়া যাইবে কোথায়? আবার ধরুন যেন লোকটির স্বাস্থ্য, অর্থ সবই আছে কিন্তু সমদর্শিতা গুণ নাই। একাধিক স্ত্রী রাখিয়া সে একজনের জন্য বহু খরচ করিতে পারে কিন্তু অন্যজনের দিকে তাহার আদৌ দৃষ্টি নাই। অথচ প্রতিটি স্ত্রী তাহার স্বামীর নিকট হইতে ষোল আনা দাবী কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে চায়, সেইক্ষেত্রে যদি স্বামীর সমদর্শিতা গুণের অভাবে কোন স্ত্রী বঞ্চিত হয়, তবে সে গৃহও অশান্তির আগাররূপে পরিণত। অতএব এই সকল অবস্থায় পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী (একই সাথে) গ্রহণ বা রক্ষণ করা কোনক্রমেই বাঞ্ছিত হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, যে পুরুষ ব্যক্তি নিরোগ এবং সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী, আর্থিক সঙ্গতি ও সচ্ছলতাও আছে, সমদর্শিতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা গুণেরও অভাব বা ত্রুটি নাই, অথচ ঘটনাক্রমে তাহার স্ত্রীটি রোগা কিংবা ক্ষীণ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী। তখন ঐ পুরুষটির প্রয়োজনের তাগিদে এবং ঈমান ও স্বভাব-চরিত্র নিখুঁৎ রাখার লক্ষ্যে তাহার জন্য আরও স্ত্রী গ্রহণ করাকে অন্যায় তো বলাই চলে না; বরং তাহার জন্য এই কাজটিকে একান্তই প্রয়োজন বলিতে হয়। তারপর মনে করুন ঐ ধরনের গুণসম্পন্ন পুরুষের স্ত্রী যদি রোগা বা স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা সম্পন্ন নাও হয় তবু ঐ পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ তাহার নিজের, সংসার ও পরিবারের ব্যক্তিগতভাবে অনাথা-অনাশ্রিতা নারীর এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের নানা রকমের উপকার, কল্যাণ এবং সমস্যা সমাধানের কারণ হইয়া থাকে। অতএব এই ধরনের ক্ষেত্র হইলে তখন বহু বিবাহকে সমালোচনা করার বদলে বাঞ্ছিত কার্য বলিয়া বরণ করিতে হয়।

যাহা হউক এইবার আমরা পূর্বোক্ত প্রশ্নের শেষাংশটির জবাব দিতেছি। উহার জবাব আমাদের ইসলাম ধর্মের শরীয়ত মতে একেবারেই পরিষ্কার। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই কোন নারী তাহার স্বামী বর্তমান কালে অন্য যে কোন পুরুষকে নিজের স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। যেহেতু ইহা মারাত্মক অন্যায় ও অসঙ্গত। শরীয়ত ইহার ঘোর বিরোধী। যদি কাহারও মনে এমন প্রশ্ন জাগে যে, শরীয়ত এ বিষয়ে পুরুষের জন্য পক্ষপাতিত্ব আর নারীদের উপর অবিচার করিয়াছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা যেমন অবহেলিত, এক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপভাবে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। তবে একথা না বলিয়া পারা যায় না যে, তাহারা আসল ব্যাপারটি উপলব্ধি করিতে না পারার ফলেই তাহাদের মনে এই প্রশ্নটির উদয় হইয়া থাকে। আসল ব্যাপার হইল, স্বামী-স্ত্রী দুইজনের মধ্যে সন্তান জন্মদানের ব্যাপারে স্বামীর ভূমিকা বীর্য সমর্পণ করা আর স্ত্রীর ভূমিকা হইল, বীর্য গ্রহণ করতঃ গর্ভ ধারণ করা। এমতাবস্থায় যদি কোন নারীর একই

সময় একাধিক স্বামী থাকে আর তাহারা একই সময় উক্ত স্ত্রীকে বীর্যদান করে তবে উহাতে সন্তান জন্মিলে সেই সন্তান কোন স্বামীর তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহার ফলে মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চরম সমস্যা উদ্ভূত হয়। যেহেতু সন্তান তাহার পিতার পরিচয় দিতে অপারগ থাকে। পক্ষান্তরে, প্রকৃত পিতাও ঘটনা এবং সমস্যার ঘোরে স্বীয় সন্তানের প্রতি পিতৃত্বের দাবী করিতে পারে না। এই ধরনের সমস্যার তুলনায় বিশৃংখলা আর কি হইতে পারে? অতএব যাহাতে এমন কঠিন সমস্যার সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্যই কোন নারীর পক্ষে একই সময় একাধিক স্বামী গ্রহণ করাকে ইসলাম মারাত্মক অপরাধ এবং মহা পাপকার্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

একই সাথে কয়জন স্ত্রী রাখা যায়

এই কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ইসলাম ধর্মের মতে স্বাভাবিক অবস্থায় একজন পুরুষের জন্য একজন স্ত্রী থাকাই উচিত। তবে প্রয়োজনে বা বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবার নির্দেশ ইসলাম দান করিয়াছে কোন বৃহৎ এবং ব্যাপক স্বার্থ উদ্ধার কল্পে। আর যদি তাহাতে কোন অঘটন না ঘটে এবং দুর্যোগ সৃষ্টি না হয়, কাহারও প্রতি কোনরূপ অন্যায় ও অবিচার না হইয়া পড়ে তাহা হইলে একসাথে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এবং রক্ষণ করা ইসলামে বিধেয় রহিয়াছে। তবে একাধিক বলিতে তাহার সীমা কোথায় কয়জন পর্যন্ত গ্রহণ করা ও রাখা চলে, ইসলাম সে বিধানও প্রদান করিয়াছে। যদি কোন পুরুষের স্ত্রী পর পর কয়েকজনই মৃত্যুবরণ করে কিংবা শরীয়ত সিদ্ধ কারণবশতঃ পর পর কয়েকজন স্ত্রীকেই তালাক দিতে হয়, তবে এইভাবে একজনের পর আর একজনকে এরূপ অনেক স্ত্রীই গ্রহণ করা যায়। ইহার ফলে যদি কাহারও বিবাহ বা স্ত্রীর সংখ্যা শতাধিকও হইয়া পড়ে তবে তাহাতেও কোন দোষ নাই। তবে আসল কথা হইল, যেন কোনরূপ ক্ষুদ্র পার্থিব স্বার্থ অথবা নোংরা কাম লালসা জনিত কারণে এইরূপ না ঘটে। যদি তদ্রূপ হয়, তবে ইসলাম তাহা সমর্থন করে না। আর যে ক্ষেত্রে ইসলাম বহু বিবাহকে সমর্থন করে, সে ক্ষেত্রে তাহার উর্দ্ধ সংখ্যা চারি। অর্থাৎ কোন লোক যত বেশী সংখ্যায়ই বিবাহ করুক না কেন, একসঙ্গে উর্দ্ধে চারিজন স্ত্রীকে নিজ অধিকারে রাখিতে পারে। কোনক্রমেই চারিজনের অধিক স্ত্রী সে এক সাথে রাখিতে পারে না। রাখিলে তাহা ইসলামের বিধানে হারাম হইয়া থাকে। এই নির্দেশ আল্লাহ পবিত্র কোরআনে প্রদান করিয়াছেন। তবে তাহার অর্থ আবার এই নয় যে, এই অধিকার লাভ করিবার ফলে সকলেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবে। আসলে এই নির্দেশটির তাৎপর্য এই যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণের কোন বাস্তব প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তখন আর একটি বিবাহ করিয়া প্রয়োজন মিটাইবে। আর যদি তারপরও প্রয়োজন থাকে, তবে আর একটি বিবাহ করিবে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে যেন তাহা করা না হয়। যদি তিনজন স্ত্রী ঘরে আসার পরেও এমন কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হয়, যাহাতে আরও স্ত্রীর প্রয়োজন থাকে। তাহা হইলে বিবাহ করিয়া আরও একজন স্ত্রী আনা যায়। কিন্তু এই পর্যন্ত সীমা রেখা। ইহার পরে আর অধিকার নাই। অর্থাৎ কাহারও গৃহে চারিজন স্ত্রী বিদ্যমান থাকার পরে যে কোন অবস্থাতেই পুনরায় বিবাহ করা সিদ্ধ নহে।

একটি বিশেষ জরুরী কথা মনে রাখিবেন, স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার যে প্রয়োজনীয়তার কথা বলিলাম, সেই প্রয়োজনীয়তা যেন শরীয়তের মাপ কাঠির দ্বারা নির্ণীত হয়। তাহা

ছাড়া কোন পার্থিব মাপ কাঠির দ্বারা প্রয়োজন নির্দ্ধারণ করিলে তাহা গৃহীত হইবে না। ঐরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ যদিও সিদ্ধ হইবে কিন্তু উহাতে বিবিধ কারণবশতঃ নানাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক এবার আমরা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই আলোচনা শুরু করিবার পূর্বে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় এখানে উল্লেখ করিতেছি। সে বিষয়টি এই যে, অনেকে ভাবেন, পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে জানা যায় যে, মুসলিম পুরুষগণ একই সাথে কিংবা একই সময় উর্দ্ধে চারিজন স্ত্রী নিজ অধিকারে রাখিতে পারেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, যিনি খোদ ইসলামের বিধি-বিধান এবং রীতি-নীতির প্রচারক, তিনি নিজে কেমন করিয়া একসাথে চারির অধিক বিবাহ করিলেন এবং এত বেশীসংখ্যক স্ত্রীকে একই সময় নিজের অধিকারে রাখিলেন?

এই ধরনের ভাবনা বা চিন্তার উদয় অমূলক বা অহেতুক নহে, তাহা আমরা স্বীকার করি। তবে ইহাও সত্য কথা যে, যাহারা দ্বীন প্রচারক—সেই মহানবীর (সঃ) গুরুত্ব, মহিমা ও বৈশিষ্ট্যের কথা উত্তমরূপে অবহিত ও যাহারা তৎকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপট এবং ইসলামের সূচনা লগ্নের ঘটনা ও অবস্থাবলীর সহিত সুপরিচিত, তাহাদের মনে কিছুতেই ঐরূপ ভাবনা-চিন্তার উদয় হইবে না। তাহারা জানেন যে, নবী জীবনের বহু বিবাহ ঘটনাটি নবীর (সঃ) জন্য একটি অতি স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় ঘটনা ছিল। হাঁ, তবে যাহারা উল্লিখিত দুইটি বিষয়ের সহিত পরিচিত নন, এ বিষয়ে পুরাপুরি অনভিজ্ঞ তাহাদের মনে ভাবনা বা প্রশ্নটা উদয় হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। তবে আশা রহিল, আল্লাহ পাকের মর্জী হইলে এই পুস্তকেরই শেষাংশে আমরা পরিশিষ্ট শীর্ষক অধ্যায়ে উক্ত বিষয়ের উপরে কিছু আলোচনা করিব যাহাতে উক্ত বিষয়টি নিয়া ভাবনা-চিন্তা ও প্রশ্নটি মন হইতে দূর হইয়া যায়। তবু এখানে অতি সংক্ষেপে অল্প কথায় একটি ভিন্ন রকম জবাব আমরা পেশ করিতেছি। তাহা এই যে, যাহারা নবীর (সঃ) জীবনে কোন কিছু অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ধরনের ঘটনা দেখিয়া ভাবনায় পড়িবেন, তাহারা এই কথাটিকে স্মরণ করিয়া মনের ভাবনা দূর করিবেন যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বান্দা, সকল নবী-রাসূলের সরদার এবং সারা মানব জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সর্বোপরি তিনি কুল মাখলুকাতের উসিলা। তাই খোদ আল্লাহ তায়ালারই ইচ্ছাক্রমে অনেক কিছুই তাঁহার জন্য শোভনীয় যাহা অন্যের জন্য অশোভনীয় বা একেবারেই নিষিদ্ধ। ইহা মহনবী হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য ব্যতীত আর কিছু নহে।

যাহা হউক এই বিষয়ে এখানে অধিক কথা বাড়াইব না। এখন আমরা মূল আলোচ্য উম্মুহাতুল মু'মিনীন তথা হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রিয় পত্নীগণের জীবন ঘটনাসমূহ পেশ করিতেছি।

হযরত খাদীজা (রাঃ)

হযরত খাদীজার (রাঃ) বংশ ও জনক-জননী

প্রাচীন আরবদেশের কথা কি আর বলিব? যে আরব আজ সারা মুসলিম জাহানের কাছে পুণ্যময় দেশ, যে আরবের বুকে সমগ্র মুসলমানের পবিত্র তীর্থ ভূমি মক্কা শরীফ আল্লাহর কাবাগৃহ বক্ষে ধরিয়া ও পুতঃ পবিত্র মদীনা শরীফ রাসূল (সঃ)-এর পাক রওজাকে বুকে ধারণ করিয়া তাহাকে সারা দুনিয়ার মাঝে অনুপম মহিমাময় ও সেরা গৌরবময় দেশরূপে পরিণত করিয়াছে, যে আরব জাযীরার কেন্দ্র হইতে নিখিলের নির্যাতিত মানবের মুক্তিবারতা ধ্বনিত হইয়া সারা বিশ্বকে সজাগ করিয়াছে, যে আরব ভূমি হইতে আলোক মশাল বাহির হইয়া কূল জাহানকে আলোকোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, প্রাচীন কালের একটি সময় সেই আরবদেশেরই অবস্থা অতীব করুণ ছিল। আরববাসীরা সে সময়টিতে মানবসুলভ আচরণকেই ভুলিয়া গিয়াছিল। ধর্ম-কর্ম বলিতে তখন তাহাদের মাঝে কিছু ছিল না। ছিল শুধু অনাচার, কদাচার, পাপাচার আর শুধু পশু সদৃশ কার্যকলাপ। স্রষ্টা বলিয়া যে কেহ আছেন সেকথা তখন আরবের লোকগণ প্রায় সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই সারা দেশটি জুড়িয়া তখন কেবল অধর্ম ও কুকর্মের স্রোত বহিয়া চলিয়াছিল। আর সেই সর্বগ্রাসী প্রবল স্রোতের টানে তথাকার লোকগুলি যেন অসহায় কচুরি পানার মত অতল সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতেছিল।

তবু এই একঘেয়ে পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতেও কিছু বিপরীত অবস্থা যা ছিল তাহা উল্লেখ না করিলে সত্যের অপলাপ হইবে বিধায় তাহা উল্লেখ করিতেছি। মাঝে মাঝে দেখা যায়, তটিনীর তীব্র স্রোতের টানে পানাদলগুলি যখন ভাসিয়া যাইতে থাকে, তখন উহার মধ্য হইতে দুই একটি পানা ঝোপ ঝাড়ের সঙ্গে বাঁধিয়া এমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকে যে, তীব্র স্রোতের শত চেষ্টাও সেগুলিকে ভাসাইয়া নিতে পারে না। ঠিক এমনি ভাবেই সে যুগের পাপময় স্রোতের টানে ভাসমান লোকগুলির মধ্যে নগণ্য সংখ্যক লোক ঐ স্রোতের টান হইতে বাঁচিয়া রহিয়াছিল।

এইবার তাহাদের পরিচয় এখানে তুলিয়া ধরিতেছি। তখনকার আরবদেশে এই ধরনের লোকদের মধ্যে কিছু লোক ছিল খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। তাহারা হযরত ঈসা নবী (আঃ) তথা যীশু খৃষ্টের অনুসারী ছিল। ইহারা মোটমুটিভাবে ধর্ম-কর্ম, সভ্যতা, ভদ্রতা ও শালীনতা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া চলিত। সত্যি বলিতে কি, ইহারা তখনকার আরব ভূমিতে ব্যতিক্রমধর্মী ছিল। ইহাদের মধ্যে একটি পরিবার ছিল ধর্ম-কর্মের প্রতি খুব বেশী যত্নবান এবং অধিক শ্রদ্ধাশীল। এই পরিবারের লোকেরা এক স্রষ্টার উপাসনা করিত এবং কোনরূপ কুসংস্কার কিংবা অসদাচরণের শিকার হইত না। ইহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে রুজী উপার্জন করিত। তখনকার প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও ইহাদের আকর্ষণ ছিল ও পরিবারস্থ প্রায় সকলেই কিছু না কিছু লিখা-পড়া অবশ্যই শিখিত।

এই পরিবারে খোয়াইলিদ নামক লোকটি তৎকালীন শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে, গুণে ও মান-সম্মানে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাহাছাড়া তিনি স্বীয় গোত্রীয় ও পারিবারিক

ঐতিহ্য হিসাবে ব্যবসায় কর্ম অবলম্বন করতঃ অল্প দিনেই বহু ধন-সম্পদেরও অধিকারী হইয়াছিলেন। এই পরিবারটি বসবাস করিত মক্কা নগরীর কোন এক এলাকায়।

খোয়াইলিদের তখনও বিবাহ হয় নাই। কিন্তু তাহার বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে আরও কিছুদিন আগেই। তাহার অভিভাবকগণ চারিদিকে উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করিতেছিল।

ঠিক একই সময় মক্কার অন্য এলাকায় আর একটি উত্তম বংশীয় পরিবার বসবাস করিতেছিল। বংশীয় আভিজাত্য ও ভদ্রতায় এই পরিবারটিও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। ইহারা মূর্তি বা অগ্নির উপাসনা করিত না, এহুদী কিংবা খৃষ্টান ধর্মীয়ও ছিল না। ধর্মের দিক দিয়া শুধু এক খোদার উপাসক ছিল; এবং স্রষ্টার উপরে তাহাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাই সজ্জীবন যাপন ছিল তাহাদের বংশীয় ঐতিহ্য। এই কারণেই তখনকার আরব বিশেষতঃ মক্কার জঘন্য পরিবেশ পরিবারটিকে এতটুকু মাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই পরিবারের জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির ফাতিমা নাম্নী জনৈকা অতি রূপসী ও গুণবতী কন্যা ছিলেন। শুধু রূপ-গুণই নয়, চরিত্রও ছিল তাঁর অতিশয় নির্মল ও অম্লান। শিক্ষা-দীক্ষাও তাঁহার ছিল। তিনি অবিরত ধর্মকর্মেই ডুবিয়া থাকিতেন। এ কারণে চতুর্দিকে তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যাহার ফলে তাঁহাকে বিবাহ করার জন্য বহু স্থান হইতেই প্রস্তাব আসিতে লাগিল। ফাতিমার পক্ষ হইতেও তাঁহার অভিভাবকগণ যোগ্য পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহারা পাত্রী ফাতিমার যোগ্য পাত্র হিসাবে খৃষ্টান বংশীয় শিক্ষা-দীক্ষায়, মানে-মর্যাদায় এবং জ্ঞানে-গুণে বিভূষিত খোয়াইলিদকে পছন্দ করিবেন। যথাসময়ে ইহাদের মধ্যে বিবাহ কার্যও সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

এই সুযোগ্য যুগল দম্পতির প্রথম যে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেন তাঁহার নাম খাদীজা। যিনি পরবর্তী জীবনে সমগ্র মুসলিম জাহানে উম্মল মু'মিনীন তথা হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রথমা পত্নী হযরত খাদীজাতুল কোবরা নামে সুপরিচিতা।

ভাগ্যবতী খাদীজার (রাঃ) জন্মের পূর্বে

বিভিন্ন লেখক বর্ণিত বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায় যে, হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁহার পিতা-মাতার প্রথমা সন্তান হইলেও তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন তাঁহাদের পিতা-মাতার বিবাহের বহুদিন পরে। তাঁহাদের বুঝি কোন সন্তান ভাগ্যে নাই এইরূপ একটা হতাশা এবং নৈরাশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই পাইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু অসীম কুদরতের মালিক আল্লাহ তায়ালার কুদরতের লীলা-খেলা অজ্ঞ মানুষ কি বুঝিতে পারে? খোয়াইলিদ এবং ফাতিমার হৃদয় যখন নৈরাশ্যের গভীর আঁধারে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তখন সহসা আল্লাহর মর্জীতে ফাতিমা অন্তঃস্বত্ত্বা হইলেন এবং এই ঘটনায় তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর মনে ক্ষীণ আশার আলোক উঁকি দিল, তাঁহারা উভয়ে ভাবিলেন, এইবার হয়ত আল্লাহ তাঁহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

ধর্ম-কর্মে উভয়েই নিবিষ্ট ছিলেন। এখন হইতে তাঁহারা তাহাতে আরও আকৃষ্ট হইলেন। এদিকে ফাতিমার সন্তান-সম্ভবা হইবার লক্ষণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার গর্ভের বয়স যখন অষ্টম মাসে উপনীত হইল, তখন একদা রাত্রে ফাতিমা একটি অভূতপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন ঃ ধবধবে শ্বেত বসনাবৃত সৌম্য প্রশান্ত এক

দরবেশ ব্যক্তি শিয়রে বসিয়া তাঁহার মাথার উপরে হস্ত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, মাগো! তুমি এক অতি ভাগ্যবতী নারী। কেননা অচিরেই তুমি এমন এক সৌভাগ্যবতী কন্যা সন্তান প্রসব করিবে যাহার তুল্য নছীব লইয়া এই জগতে কোন রমণীই আসে নাই, আর আসিবেও না। সর্বকালের সর্বশ্রেণীর নারীদের মাঝে তাঁহার আসন শীর্ষে। যথাসময়ে সে এক এমন পুরুষের পত্নীত্বের অধিকার লাভে ধন্য হইবে, যে মহান পুরুষ বিশ্ব মানব কুলের সম্রাট, যাঁহার সহিত দুনিয়ার কোন মানুষেরই তুলনা হইতে পারে না। যিনি এই ত্রিজগত সৃষ্টির একমাত্র উসিলা। এই পর্যন্ত বলিয়া দরবেশ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফাতিমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। জাগিয়া ফাতিমা মনে মনে এইরূপ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অন্তর মধ্যে যেন কেমন এক পবিত্র আনন্দের ধারা বহিয়া যাইতেছে।

অতি প্রত্যুষেই তিনি তাঁহার এই অপূর্ব স্বপ্নের বিবরণ স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। স্বামী শুনিয়া পুলকিত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন, ফাতিমা! তোমার উপাসনায় খুশী হইয়া হয়ত প্রভু সত্যই আমাদেরকে একটি ভাগ্যবতী সন্তান দান করিবেন। কিন্তু ফাতিমা মনে মনে বলিলেন, যদি স্বপ্নের ফল সত্যিই ফলে তবে তাহা তাহার নিজের কোন যোগ্যতার ফলে নহে, বরং অবশ্যই তাহা তাঁহার পুণ্যবান স্বামীরই একনিষ্ঠ প্রভোপাসনার কারণে হইতে পারে।

হযরত খাদীজার (রাঃ) জন্ম, শৈশব ও কৈশোর

পাঁচশত পঞ্চান্ন ঈসায়ী সনের কোন এক শুভ প্রত্যুষে আসন্ন সন্তান-সম্ভবা ফাতিমার প্রসব বেদনা শুরু হইল। খোয়াইলিদের গৃহে সকলেরই চোখে-মুখে আনন্দঘন ব্যতিব্যস্ততা ও ব্যগ্রতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। প্রতিবেশীগণ বুঝিতে পারিল যে, ফাতিমার সন্তান প্রসবকাল উপস্থিত হইয়াছে।

অধিক সময় অতিবাহিত হইল না। ইতোমধ্যে ফাতিমা এক কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন। গৃহ মধ্য হইতে একটি মহিলা বাহির হইয়া বহির্বাটিতে অবস্থানরত খোয়াইলিদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিল। ইহা শুনামাত্র তাহার দুইমাস পূর্বে দেখা ফাতিমার স্বপ্নটির কথা স্মরণে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্রষ্টার দরবারে আরাধনা জানাইয়া বলিলেন, ওহে প্রভু! তুমি ফাতিমার স্বপ্ন সফল করিয়া দিও।

সদ্য ভূমিষ্ঠা এ কন্যা রত্নটি সবদিক হইতেই যারপর নাই সুদর্শনা, সুলক্ষণা ও অনুপম সুশ্রী ছিল। দেখিয়া জনক-জননীর চক্ষু জুড়াইল এবং আনন্দে অন্তর শীতল হইল। পাড়া-প্রতিবেশীগণ দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া খোয়াইলিদের এই শিশু কন্যা দেখিয়া নানাভাবে তাহার প্রশংসা করিল এবং জনক-জননীকে ধন্যবাদ দিল। খুশী ও পুলকিত হইলেন সকলেই।

যথাসময়ে জনক-জননী অতি আদরের শিশুটির নাম রাখিলেন খাদীজা (রাঃ)। শিশু খাদীজা (রাঃ) পিতা ও মাতার একান্ত আদর ও যত্নে লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন এবং একটু একটু করিয়া দিন দিন বাড়িয়া চলিল। জন্মাবধিই তাঁহার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রন্দন করিতেন কম। তাঁহার

হাসির মধ্যে অপূর্ব মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিত। খাওয়ার জন্য অন্য শিশুদের ন্যায় মাতাকে বিরক্ত করিতেন না। বাহ্য-প্রস্রাবের বেগ হওয়া মাত্রই মাতৃক্রোড় হইতে নামিয়া পড়ার জন্য উদ্বেগ শুরু করিতেন। এইভাবে বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁহার মধ্যে অ-শিশুসুলভ কতকগুলি নিদর্শন দেখা যাইত।

শৈশব পার হইয়া যখন তিনি কৈশোরে পৌঁছিলেন, তখন তাহার ক্রিয়া-কলাপ এবং আচরণাদিতে স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নসমূহ আরও বেশীরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। খাদীজার (রাঃ) সমবয়সী বালিকারা সকলে মিলিয়া যখন খেলা-ধূলা আরম্ভ করিত, তখন তাহারা তাহাদের সাথে খেলায় শরীক হইতে তাহাকেও আহ্বান করিত। কিন্তু কখনও তিনি তাহাদের সাথে খেলায় শরীক হইতেন না। কখনও কখনও তাঁহার মাতা নিজে গিয়া তাঁহাকে ক্রীড়ারত বালিকাদের মাঝে দিয়া আসিতেন। কিন্তু তাঁহার মন তাহাদের সাথে একটি পলকও থাকিতে ভালবাসিত না। তাই একদিকে তাঁহার মাতা তাহাকে দিয়া আসিতেন ঠিকই কিন্তু অন্যদিকে তিনি প্রায় সাথে সাথেই মাতার নিকট ছুটিয়া আসিতেন।

কন্যার এইরূপ স্বভাব-চরিত্র ও গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া জননী ফাতিমার মনে স্বীয় গর্ভকালীন স্বপ্নটির কথা জাগিয়া উঠিত যে, এক দরবেশ তাঁহাকে স্বপ্নযোগে বলিয়াছিলেন, তোমার ভাবী কন্যা সন্তানটি জগদ্বরেণ্য মহিলারূপে গণ্য হইবে এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের সহধর্মিণীর আসন অলঙ্কৃত করিবে। ফাতিমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সম্ভবতঃ এইজন্যই আল্লাহ তাহাকে তদুপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। এইরূপ চিন্তায় মাতা ফাতিমার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিত।

এদিকে হযরত খাদীজা (রাঃ) বয়স যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাঁহার সৎগুণাবলী ও সুকুমার স্বভাব-চরিত্রগুলিও তাহার সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে পূর্ণতা লাভ করিয়া চলিয়াছিল। যখন তাঁহার বয়স কৈশোরও অতিক্রম করার পথে, দেখা যাইতে লাগিল, তাঁহার উল্লিখিত সৎস্বভাবগুলির সাথে সংযম, সুরুচি, পবিত্রতা, শালীনতা, নম্রতা, ভদ্রতা ও মায়া-মমতা প্রভৃতি গুণাবলীও যুক্ত হইয়াছে।

কিশোরী খাদীজার (রাঃ) এই চরিত্র এবং গুণাবলীর খবর প্রথমে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে, পরে দূর হইতে দূরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তখন তাঁহার গুণমুগ্ধ মক্কাবাসীরা তাঁহাকে নানাভাবে প্রশংসা করতঃ 'তাহেরা' (অর্থাৎ অম্লান এবং নির্মল চরিত্রের অধিকারিণী) উপাধিতে ভূষিত করিল।

টীকা ঃ হযরত খাদীজাতুল কোবরার (রাঃ) বংশ পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তাঁহার পিতা খোয়াইলিদের পূর্ব পুরুষ তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশীয় লোক। খোয়াইলিদের কয়েক ধাপ উপরে গিয়াই হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর বংশের সাথে উহা মিলিয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মাতা ফাতিমা বিনতে যায়িদার বংশও কয়েক সিঁড়ি গিয়া হুযুরে পাক (রাঃ)-এর বংশের সাথে মিলিত হইয়াছে।

হযরত খাদীজার (রাঃ) শিক্ষা-দীক্ষা

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় আরবের অবস্থা শোচনীয় হইলেও ব্যতিক্রমধর্মী গোত্র ও পরিবারগুলিতে শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলন ছিল। তবে শিক্ষার ধারা ও রীতি-নীতি এ যুগের মত ছিল না এবং থাকা সম্ভবও নয়। তবু শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা ছিল এবং যে রীতিতে সম্ভব, সেই রীতিতেই লোকেরা শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিত। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পিতা খোয়াইলিদ একজন উচ্চশিক্ষিত ও সুযোগ্য পুরুষ ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি পরম আদরের কন্যাটিকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে মনোযোগী হইলেন। তাহাকে শিক্ষা প্রদানের ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার পরিবারস্থ লোকেরা অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তাহারাও হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে শিক্ষা প্রদান করিতেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) যথেষ্ট মেধা বিশিষ্টা বালিকা ছিলেন। তাই অনায়াসে ও অল্পায়াসেই বেশ কিছু শিক্ষালাভ করিলেন।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পিতৃ পরিবারস্থ লোকেরা বংশগতভাবেই খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাই তাহাদের পরিবারে তৌরাত ও ইঞ্জীল এই কিতাব দুইখানির খুব বেশী চর্চা হইত। পরিবারে প্রায় সকলেই এই দুই গ্রন্থের জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিল। অতএব তাহাদের মাধ্যমে ও পিতার চেষ্টায় হযরত খাদীজা (রাঃ) উত্তমরূপে তৌরাত ও ইঞ্জীলের জ্ঞানও পুরাপুরিভাবে অর্জন করিলেন। যাহার ফলে হযরত খাদীজা (রাঃ) তখন আর শুধু তাহেরা খাদীজা (রাঃ) [পবিত্রা খাদীজা (রাঃ)]-ই রহিলেন না; বরং তখন হইতে আলিমা খাদীজা (রাঃ) [বিদূষী খাদীজা (রাঃ)]-তেও পরিণত হইলেন।

হযরত খাদীজার (রাঃ) দৈহিক সৌন্দর্য

"আল্লাহ যাহাকে দান করেন, সবদিক দিয়াই করেন" কথাটি অনেকেই বলিয়া থাকেন কিন্তু কথাটি তেমন অর্থবহ এবং জ্ঞানগর্ভ বলিয়া আমরা মনে করি না। কেননা যে ব্যক্তি সবদিক দিয়া দান পাওয়ার যোগ্য নয়, তাহাকেও আল্লাহ সবদিক দিয়া দান করিবেন, মুনসিফ (ন্যায়নিষ্ঠ) আল্লাহ তায়ালা তেমন অবিবেচক নন। তারতম্যানুসারে কাহাকেও আল্লাহ অল্প, কাহাকেও মধ্যম এবং কাহাকেও বা খুববেশী পরিমাণে দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি যে যাহাকে দিবেন সর্বদিক দিয়াই দিবেন এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। হাঁ, তবে ইচ্ছা করিলে তিনি কাহাকেও সবদিক দিয়া দিতে পারেন। এইরূপ একটি ঘটনা হয়ত হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল।

তাঁহাকে আল্লাহ উত্তম চরিত্র দিয়াছিলেন। জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিদ্যাশিক্ষা দান করিয়াছিলেন। সত্য-সততা, নম্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, মমতা, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণে বিভূষিতা করিয়াছিলেন। এইগুলি বাদে বাকী থাকিল কেবল দৈহিক রূপ ও সৌন্দর্য, কিন্তু আল্লাহ পাকের তাঁহার উপর কি অসীম মেহেরবানী, সেই জিনিসটিও আল্লাহ তাঁহাকে পুরাপুরি ভাবে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সোন্দর্য এবং দৈহিক রূপেরও কোন তুলনা ছিল না। সারা আরবে তখন তাঁহার তুল্য রূপসী রমণী দ্বিতীয়টি ছিল না। চন্দ্রে সামান্য ম্লান দাগ দেখা যায় কিন্তু হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পবিত্র রূপরাশির মধ্যে

কোন রকমের ত্রুটি ছিল না। এই কারণে অবশ্য বলিতে হয় যে, আল্লাহ হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে সবদিক দিয়াই দিয়াছিলেন

হযরত খাদীজা (রাঃ) যখন কৈশোর পার হইয়া যৌবনে পা রাখিলেন, তখন তাঁহার উল্লিখিত রূপ, গুণ ও চরিত্রসমূহ আরও বিকশিত হইয়া কানায় কানায় পূর্ণ হইল।

বিবাহের পয়গাম

একেতো হযরত খাদীজা (রাঃ) আরবের এক বিশিষ্ট খান্দানের কন্যা। তাঁহার পিতা-মাতা উভয়ই ছিলেন আরবের ঐতিহ্যবাহী ও মর্যদাশীল প্রাচীন কোরায়েশ বংশোদ্ভূত। তদুপরি হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর রূপ-গুণ, শিক্ষা-দীক্ষার সুনাম আরবের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। উপরন্তু খাদীজার (রাঃ) পিতা খোয়াইলিদ আরবের এক বিখ্যাত ধনবান ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্যের কথা আরবের কোনখানে অজানা ছিল না। এমনকি সিরিয়া ও ইয়েমেন প্রভৃতি এলাকায়ও তাঁহার ব্যবসা বিস্তৃত ছিল। সুতরাং তাঁহার মত এক বিরাট ধনবানের পরম রূপসী-বিদূষী ও গুণবতী কন্যার পাণিগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা সবার মনেই যে জাগরূক হইবে ইহা অতি স্বাভাবিক এবং হইলও তাহাই। মক্কা ও মক্কার বাহিরের বহু পাত্রই হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য তাঁহার অভিভাবকের কাছে পয়গাম পাঠাইতে শুরু করিল। দেশের রূপে-গুণে, বংশে, মর্যাদায়, ধন-সম্পদে সবদিক হইতে অদ্বিতীয়া রমণীকে বিবাহ করার জন্য কাহার না আগ্রহ হয়? সুতরাং যোগ্য-অযোগ্য যে কোন রকম পাত্রের পক্ষ হইতে অসংখ্য বিবাহ প্রস্তাব আসিয়া পৌঁছিল। মক্কায় তখন ইয়াহুদী, খৃষ্টান, এক খোদায় বিশ্বাসী, মূর্তিপূজক, পৌত্তলিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বসবাস করিত। ইহাদের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকদের পক্ষ হইতেই প্রস্তাব আসিল। হযরত খাদীজা (রাঃ) ব্যতীত এত বেশী বিবাহ প্রস্তাব আর কাহারও জন্য কোনদিন আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু প্রস্তাব আসিলেই তো আর তাহা কবুল করা যায় না। খাদীজার (রাঃ) পিতা খোয়াইলিদ এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা প্রায় সকলেই ছিলেন যথেষ্ট বিচক্ষণ এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানী-গুণী। দূরদর্শীতাও ছিল তাহাদের যথেষ্ট। তাই তাহারা কোনরূপ লোভ-লালসা কিংবা ক্ষুদ্র স্বার্থের শিকার না হইয়া যথাযথ ধৈর্য এবং মনোবলের পরিচয় দিলেন। পয়গাম প্রেরকদের নানাদিক অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই করিয়া দেখিয়া একে একে সবগুলি প্রস্তাবই অনুপযুক্ত মনে করিয়া নাকচ করিয়া দিলেন। ইহাতে হয়ত বা কেহ ক্ষুণ্ন এবং কেহবা নাখোশ হইল কিন্তু তাঁহারা তাহার তোয়াক্কা করিলেন না।

অবশেষে পর পর তিনটি বিবাহ

যাহারা বলেন, হযরত খাদীজা (রাঃ) পিতৃব্যপুত্র ধর্মপুরোহিত অতিশয় ধর্মভীরু ও জ্ঞান-তাপস ওয়ারাকা ইবনে নওফেল হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে হযরত খাদীজা (রাঃ) বিবাহ হইবার পূর্বেই পরলোকগমন করেন, তাহাদের মতে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বিবাহ প্রস্তাবগুলির সাথে উক্ত ওয়ারাকা

ইবনে নওফেলের পক্ষ হইতেও একটি প্রস্তাব আসিয়াছিল। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পিতা এই প্রস্তাবটিকে পছন্দ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং খাদীজা (রাঃ)-ও এই প্রস্তাবটিতে সম্মতি দিয়াছিলেন।

কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হইবার পূর্বেই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল মৃত্যুবরণ করিলেন।

প্রথম বিবাহ ঃ সে সময় মক্কায় তামীমী কবিলা নামে একটি মর্যাদাশালী সৎগোত্র বসবাস করিত। ঐ গোত্রের আবু হাওলা যিয়ারা নামক একটি যুবক শিক্ষা-দীক্ষা ও নানাবিধ গুণে খুবই সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। অবশেষে এই যুবকের পক্ষ হইতেও খাদীজার (রাঃ) জন্য প্রস্তাব আসিল। খোয়াইলিদের এই পাত্রটিকে খুবই পছন্দ হইল। খাদীজার (রাঃ) জননী ফাতিমাও ইহাতে সায় যোগাইলেন। অবশেষে খোয়াইলিদ স্বীয় পরিবারস্থ বিচক্ষণ লোকদেরকে ডাকিয়া এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে ডাকাইয়া লইয়া তাহাদের সাথেও বিষয়টির আলোচনা করিলেন। তাহাদেরও এই পাত্র সম্পর্কে ভালভাবে জানা ছিল। তাহারা কেহই এই প্রস্তাব না-পছন্দ করিলেন না। সকলেই সানন্দে এই প্রস্তাব কবুল করিতে পরামর্শ দিলেন।

অতএব একদিন মহাধুমধামে উক্ত আবু হাওলার সাথেই হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বিবাহ হইয়া গেল। আবু হাওলা হযরত খাদীজার মত নারী রত্ন স্ত্রীরূপে লাভ করিতে পারিয়া নিজেকে মহাভাগ্যবান মনে করিলেন। নব দম্পত্তির সুখী পারিবারিক জীবন আরম্ভ হইল। কিন্তু মানুষের আশা-ভরসার কোনই মূল্য নাই এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে। অদৃষ্টের পরিহাস! বিবাহের পরে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পরেই আবু হাওলা জীবনের অসংখ্য রঙ্গিন আশা বক্ষে চাপিয়া রাখিয়াই হঠাৎ পরপারে চলিয়া গেলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) অকাল বৈধব্যের শিকার হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বিভিন্ন বর্ণনামতে জানা যায় যে, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর এই ঘরে দুইজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বিবাহ ঃ হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মত শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্র, ধন-সম্পদ প্রভৃতি সর্বগুণসম্পন্না রমণী বিধবা হইলেও কিছু যায়-আসে না। এমন নারীর সহিত বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করিতে পারা সৌভাগ্যের কথা। কাজেই হযরত খাদীজা (রাঃ) বিধবা হইয়া পিতৃ-গৃহে ফিরিয়া আসার পরই আবার পিতার নিকট তাঁহার বিবাহ পয়গাম আসিতে লাগিল। বহু গণ্য-মান্য এবং যোগ্য পাত্রগণও প্রস্তাব পাঠাইতে শুরু করিল।

পিতা খোয়াইলিদ যথেষ্ট বিজ্ঞ এবং দূরদর্শী ব্যক্তি। তাই এবারও তিনি কোনরূপ তাড়াহুড়ার পথ অবলম্বন করিলেন না। বরং প্রস্তাবদাতাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে ভালভাবে জানিয়া-শুনিয়া ধীর-স্থিরভাবে পাত্র নির্বাচন করার নীতি গ্রহণ করিলেন এবং সেইভাবেই প্রস্তাব প্রেরকদেরকে যাচাই করিতে শুরু করিলেন। সমস্ত প্রস্তাব বাছাই করার পরে দেখা গেল, হযরত খাদীজার (রাঃ) সাথে বিবাহ হওয়ার মত পাত্র প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটিও নাই। তবে হঠাৎ একটি প্রস্তাব উপস্থিত হইল আরবের একটি বিশেষ সম্ভ্রান্ত গোত্র হইতে। এই প্রস্তাবদাতা পাত্রের নাম ছিল আতীক ইবনে

যায়েদ মাখদুমী। এই পাত্রটি বিভিন্ন গুণে গুণবান এবং চরিত্রবান হিসাবে সকলেরই প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

খোয়াইলিদ নিজে এই প্রস্তাবটিকে পছন্দ করিয়া স্বীয় স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পরামর্শ চাহিলেন। একবাক্যে তাহারাও সকলেই প্রস্তাবটিকে ভাল মনে করিলেন। তখন একটি তারিখ ধার্য করিয়া খোয়াইলিদ আতীক ইবনে যায়েদ মাখদুমীর সহিত কন্যা খাদীজার (রাঃ) বিবাহকার্য সম্পন্ন করিলেন।

দ্বিতীয় স্বামীর গৃহেও হযরত খাদীজার (রাঃ) বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর দিয়াই পারিবারিক জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু গভীর রহস্যময় আল্লাহ তায়ালা কি উদ্দেশ্যে যে কি কার্য ঘটান তাহা মানুষের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নহে। হযরত খাদীজা (রাঃ) দ্বিতীয়বারের সংসার যাত্রাও সহসা বাধাগ্রস্ত হইল। এই ঘরে খাদীজা (রাঃ) একটি কন্যা সন্তান প্রসব করার কিছুদিন পরই অপ্রত্যাশিতভাবে আতীক ইবনে যায়েদ মাখদুমী মৃত্যুবরণ করিলেন।

বিভিন্ন জীবনী লিখক ঐতিহাসিকগণের মতে, হযরত খাদীজার (রাঃ) দুই স্বামীর গৃহের পুত্র-কন্যাত্রয় শৈশবেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পরে এবারও হযরত খাদীজা (রাঃ) নব বৈধব্যের শিকার হইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসিলেন।

তৃতীয় বিবাহ ঃ হযরত খাদীজা (রাঃ) পর পর দুইবার বিধবা হইলেও তিনি কিন্তু তখনও যুবতী ছিলেন। কেননা বিবাহের পর কোন স্বামীর ঘরেই তাঁহার বেশীদিন কাটে নাই। গুণের দিক দিয়া তো তাঁহার কোন তুলনাই ছিল না। পিতা খোয়াইলিদ মক্কার বিশিষ্ট ধনী। উপরন্তু হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পর পর দুইজন ধনী স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির তিনি মোটা অংশ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং পার্থিব লোভ-লালসাপরায়ণ লোকদের নিকট হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইল। সুতরাং তিনি দ্বিতীয়বার বিধবা হইবার পরও তাঁহার সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া বহু স্থান হইতে বিবাহ প্রস্তাব পূর্বের মতই আসিতে লাগিল।

বিবাহ প্রস্তাব আসিতে থাকিল ঠিকই, কিন্তু হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পিতা খোয়াইলিদ কন্যার এইরূপ দুইবার বৈধব্য দশা প্রাপ্তিতে অত্যন্ত ম্রিয়মান এবং বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। দুঃখের আঘাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিল। আবার কন্যাকে নতুন করিয়া পাত্রস্থ করার মত মনোভাবই তখন আর তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আত্মীয়-স্বজনগণ, তাঁহাদের যথেষ্ট সান্ত্বনা ও প্রবোধ বাক্য দ্বারা বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, কন্যা খাদীজার (রাঃ) এখনও যৌবন পার হয় নাই। তাঁহাকে বিবাহ দেওয়া আপনার অবশ্য কর্তব্য। দুই জায়গার ফল শুভ হয় নাই বলিয়া সর্বস্থানেই যে কুফল ফলিবে ইহার তো কোন অর্থ নাই। আপনি নিজেই যথেষ্ট জ্ঞানী লোক, সব বুঝিতে পারেন, আমাদের বেশী বলা শোভা পায় না। তবে আপনার মনটি ভাঙ্গা এবং বেদনার্ত বলিয়া আমরা আপনাকে পরামর্শ দানে বাধ্য হইয়াছি। আল্লাহ পাক কোথায় কি উদ্দেশ্যে কি করিতেছেন, তাঁহার কোন কাজের মধ্যে কি গূঢ় রহস্য নিহিত, তাহা শুধু তিনি জানেন। তবে আমাদের তো সর্বক্ষেত্রে, সর্বব্যাপারে চেষ্টা-যত্ন অবশ্যই করিতে হইবে। যে কোন অবস্থায়ই আমাদের হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকা উচিত হইবে

না। বিশেষতঃ হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বয়স যৌবনের কোঠা পার হয় নাই। কাজেই তাঁহাকে আমরা আবারও বিবাহ দিতে চাই। তাহাতে আপনাকে সম্মতি দিতে হইবে।

একান্ত আপনজনের এইরূপ অনুরোধ এবং সুপরামর্শ খোয়াইলিদ কিছুতেই আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সুতরাং পুনরায় তাঁহাকে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বিবাহ স্থির করিতে হইল।

নূতন এক প্রস্তাবক ছিলেন খোয়াইলিদেরই এক ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার নাম ছিল উমাইয়া সাইফী। এই পাত্রটি গুণে-জ্ঞানে, শিক্ষায়-দীক্ষায় পূর্বোক্ত পাত্র দুইটি অপেক্ষাও উত্তম এবং সুযোগ্য ছিল। সুতরাং এ বিবাহও খোয়াইলিদ খুশী মনেই সম্পন্ন করিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বৈধব্য দশা আবার দূরীভূত হইল। তিনি যথারীতি তৃতীয় স্বামীগৃহে গমন করিয়া কুলবধূর আসন গ্রহণ করিলেন।

পথ পরিষ্কার

হযরত খাদীজা (রাঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তাঁহার মাতা যে একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই স্বপ্নের ফল আজ হউক, কাল হউক, বাস্তবায়িত হইতেই হইবে। যেহেতু তাঁহার সে স্বপ্ন অলীক স্বপ্ন নহে, বরং উহা ছিল স্বয়ং আল্লাহ পাকের তরফ হইতে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পরিণত জীবন ঘটনার প্রতি স্পষ্ট ইশারা। কিন্তু তাঁহার জীবনে উহার কোন দিকেরই সূচনা এখনও হয় নাই। ইহার কারণও ছিল অবশ্য। অপরপক্ষ তখনও যথাস্থানে উপনীত হয় নাই; কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিল। তাই এইদিকে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে আমরা সমূহ যাহাই দেখি না কেন নির্দিষ্ট স্থানে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা ও দায়িত্ব তো আল্লাহরই কাছে। তাই সেই ব্যাপারে আমাদের কিছু ভাবিবারও নাই, দ্বিধাগ্রস্ত হইবারও কিছু নাই। আল্লাহ তায়ালা নিজেইতো এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে করিবেন দুনিয়ার শেষ নবী হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সর্বপ্রথমা সহধর্মিনী। একাধারে তাঁহার মহান দায়িত্বপালন এবং কর্তব্য সাধনে উৎসাহ ও প্রেরণাদায়িণী। তিনি ইসলামের সেবায় বিলাইয়া দিবেন তাঁহার বিভব ও সম্পদ। তিনি করিবেন সারা মুসলিম জাহানের সর্বপ্রধানা মাতৃত্বের আসন গ্রহণ। আল্লাহ পাকের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কি করিয়া সেই খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ) বসিয়া থাকিতে পারেন এক সাধারণ গৃহের কুলবধূ সাজিয়া স্থায়ীভাবে? ইহাও কি সম্ভব? কখনই নয়। তবে এই যে আমরা দেখিতেছি হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বর্তমান অবস্থা, এইগুলি কি?

এইগুলি স্থায়ী কোন কিছুই নহে। পূর্বেই তো উল্লেখ করিয়াছি অন্যপক্ষের প্রস্তুতি পর্বটা এখনও শেষ হয় নাই। একটু বিলম্ব আছে। তাই এই পক্ষের সময় অতিবাহিত করার জন্যই শুধু ইহা আল্লাহ পাকের অপূর্ব লীলা-খেলা। এই সাময়িক ঘটনার অবসান ঘটাইয়া আল্লাহ তায়ালা হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন, তাই গন্তব্যে পৌঁছিবার পথ পরিষ্কার হওয়া চাই। সুতরাং সেই একই প্রয়োজনে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর তৃতীয় স্বামীও বিবাহের মাত্র কয়েকদিন পরেই ইন্তেকাল করিলেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। হযরত খাদীজা (রাঃ) কি আর করিবেন! অদৃষ্টের লিখা স্বীকার করিয়া লইয়া এইবারও তিনি নূতন বিধবা বেশে পিতার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর হুযুরে পাক (সঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্বেকার এই বিবাহগুলো সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন লেখকের মতে, হযরত খাদীজার (রাঃ) পূর্বে মাত্র দুইটি বিবাহ হইয়াছিল। উমাইয়া সাইফী নামক তাঁহার চাচাতো ভাইয়ের সহিত তাঁহার কখনও বিবাহ হয় নাই। কোন কোন ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রথম স্বামীর ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি শৈশবে মৃত্যুবরণ করেন নাই; বরং তিনি হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর নবুয়ত লাভ ও ইসলাম প্রচার শুরুর কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হারিস ইবনে হাওলা তাঁহার নাম ছিল। তিনি প্রাথমিক অবস্থায়ই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর একদা তিনি মুসলমানদের উপর মক্কার কোরায়েশদের হামলা প্রতিরোধ করিতে যাইয়া নিজেই শাহাদতবরণ করিয়াছিলেন মক্কায় কোরায়েশদের হাতে প্রথম শহীদই ছিলেন তিনি।

যাহা হউক উপরোক্ত দ্বিবিধ বর্ণনার মধ্যে কোনটি খাঁটি ও কোনটি অখাঁটি আমরা সেই বিতর্কে না গিয়া আমাদের মূল আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করিতেছি।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর যখন দ্বিতীয় বিবাহ হইয়াছিল, সেই সময় তাঁহার গর্ভধারিণী জননী মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর খাদীজা (রাঃ) তৃতীয় বিবাহের পর যখন আবার বিধবা হইলেন, তখন তাঁহার পিতা খোয়াইলিদ বার্দ্ধক্যের একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন। সেই বয়সে তাঁহার পক্ষে নিজের বিরাট ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। অথচ তহার কোন পুত্র সন্তানও ছিল না। তাই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আল্লাহ যাহা করেন সবকিছু ভালর জন্যই করেন। আর খাদীজার (রাঃ) জন্য কোথাও বিবাহের চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই। এখন সে কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকুক। খোয়াইলিদ তাঁহার হাতেই নিজের ব্যবসায়ের দায়িত্ব তুলিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। কন্যা খাদীজার (রাঃ) জ্ঞান-বুদ্ধি ও যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁহার যথেষ্ট আস্থা ছিল। তিনি মনে করিলেন, হযরত খাদীজা (রাঃ) যোগ্যতার সাথেই ব্যবসা চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

হযরত খাদীজার (রাঃ) ব্যবসার সূচনা

খোয়াইলিদের বার্দ্ধক্য এবং দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল। কন্যা খাদীজা (রাঃ) স্বামীহারা হইয়া আবার বিধবা হইলেন তখন আর সেই অসহনীয় দুঃখের আঘাত তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং শয্যাগত হইলেন। সত্যি বলিতে কি স্নেহশীল পিতার পক্ষে এতদপেক্ষা ভীষণ আঘাত আর কিছুই হইতে পারে না। নিজের চোখের উপরে এইভাবে পর পর তিনবার নিজ কন্যার স্বামীহারা হইয়া বৈধব্যলাভ পিতার মনের উপর যে কি কঠোর বেদনাস্বরূপ, তাহা শুধু ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারে। অন্য কাহারও পক্ষে ইহা বুঝা সম্ভব নয়।

ভগ্নহৃদয় খোয়াইলিদের জীবনী শক্তি প্রতি মুহূর্তে লয় হইয়া আসিতেছিল। ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়া আর বিলম্ব করা চলে না ভাবিয়া একদা কন্যা হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে নিজের একান্ত কাছে ডাকিয়া লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সব দায়িত্ব কন্যার হস্তে তুলিয়া দিলেন।

কন্যার প্রতি শেষ উপদেশ

বলিতে কি বৃদ্ধ খোয়াইলিদ তাঁহার দুঃখিনী কন্যা খাদীজার (রাঃ) মনের আঘাত স্বীয় হৃদয়ে অনুভব করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্তটি বড় অশান্তির মধ্যে কাটাইয়া গিয়াছেন। তবু পরম ধৈর্য ও সহ্যশক্তি বলে মনকে তিনি অবিচলই রাখিয়াছিলেন।

চরম মুহূর্তটি উপস্থিত হওয়ার আগে একদিন তিনি তাঁহার ব্যবসার সব দায়িত্ব কন্যা হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর হাতে তুলিয়া দিয়া ভগ্ন অথচ শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, মা খাদীজা! শুধু এই জগতে কেহই স্থায়ী হইয়া আসে নাই। সবারই এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। কেহ একদিন আগে, আর কেহ একদিন পরে। আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছি তাহা দেখিতেই পাইতেছ। তদুপরি রোগ-শোকে একেবারেই কমজোর হইয়া গিয়াছি। দৈহিক ও মানসিক যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আমার বাঁচিবার আশা নাই, স্পষ্টই বুঝিতেছি। হয়ত খুব অল্প সময়ই আর আছি।

মা খাদীজা! তোমার মনের দুঃখ ও প্রচণ্ড আঘাত আমি তোমার পিতা হইয়া না বুঝিলে আর কে বুঝিবে? আমি সবই বুঝিতেছি। পুরাপুরিভাবেই তোমার মনের বেদনা উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু সবকিছু বুঝিয়াও মানুষের কোন কিছুই করিবার নাই। আল্লাহর মর্জীর উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তোমার ব্যাপারে আমার মন কেবলই কি বলিতেছে জান? প্রভু আল্লাহ তায়ালা শীঘ্রই তোমাকে কোন বিশেষ মর্যাদা দান করিবেন এবং তজ্জন্যই এই সাময়িক ও সমূহ বিপরীত অবস্থাগুলি আল্লাহ তায়ালা ঘটাইতেছেন। তোমার পুণ্যময়ী জননী তোমার জন্মের পূর্বে তোমারই সম্পর্কে একটি অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আমার সে স্বপ্নটির কথা পরিষ্কার মনে পড়িতেছে। আর তাহার সাথে এইকথাও মনে হইতেছে যে, সেই স্বপ্নটি সম্ভবতঃ অনতিবিলম্বেই বাস্তবায়িত হইবে।

মা খাদীজা! তুমি এতটুকু বিমর্ষ বা ব্যথিত হইও না। মনকে সুদৃঢ় রাখিয়া আল্লাহ তায়ালার গূঢ় রহস্যের প্রতি নির্ভর করিয়া থাক। আর একটি কথা, আরবের লোকগণ তোমার নির্মল ও উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে তাহেরা উপাধি প্রদান করিয়াছে। তুমি ইহার মর্যাদা ও সার্থকতা আমরণ রক্ষা করিয়া চলিও। আমি আশীর্বাদ করিতেছি, আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করুন।

খাদীজা! আর একটি কথা বলিতেছি, আমাদের ঐতিহ্য ব্যবসা-বাণিজ্য। আমিও তাহা রক্ষা করিয়াছি। এখন আমি বিদায় গ্রহণ কালে তোমাকেও অসিয়ৎ করিয়া যাইতেছি, তুমিও এইক্ষেত্রে যোগ্যতার সাথে সেই ঐতিহ্য রক্ষা করিও। আমি এই বিশ্বাস করি, তুমি নারী হইলেও তাহা পারিবে।

আর তোমাকে একটি উপদেশ প্রদান করিতেছি, ব্যবসায় লব্ধ অর্থ দ্বারা দরিদ্র পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন এবং সাধারণ গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করিও।

এইভাবে হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে নানারূপ উপদেশ দিতে গিয়া খোয়াইলিদের খুবই কষ্ট হইতেছিল। তাই লক্ষ্য করিয়া হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁহাকে কোমল কণ্ঠে অনুরোধ করিলেন, আব্বা! আপনার খুবই কষ্ট হইতেছে। আপনি এখন একটু বিশ্রাম নিন। আপনার কোনই চিন্তার কারণ নাই। শুধু একবার আল্লাহ তায়ালার কাছে বলিয়া রাখুন আপনার খাদীজা যেন তাহার পিতার উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে পারে।

খোয়াইলিদের পরলোক যাত্রা

একটি ঘটনার সাথে আর একটি ঘটনার অন্তর্নিহিত যোগসূত্র রহিয়াছে বলিয়া অতি সংক্ষেপে দ্বিতীয় ঘটনার কিছু আলোচনা এখানেই করিতেছি।

তখনও পর্যন্ত হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর প্রথম বিবাহ হয় নাই। ঠিক এই সময় একটি খবর মক্কার চারিদিকে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, সেরা অভিজাত কোরায়েশ কবিলার সর্বশ্রেষ্ঠ হাশেমী শাখায় আবদুল মুত্তালেবের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহর স্ত্রী বিবি আমিনা এমন একটি সর্ব সুলক্ষণযুক্ত পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন, যাহার ভূমিষ্ঠ হইবারকালে ভিতরে ও বাহিরে নানারূপ আশ্চর্য নিদর্শনাবলী প্রকাশ পাইয়াছে। অতঃপর মক্কার এই কোরায়েশ-সন্তানকে ঘিরিয়া উক্ত কবিলা এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে নানারূপ আলোচনা ও গুণ-প্রশংসার কথা ব্যাপকভাবে শুরু হইয়াছিল।

এই সন্তানের পিতা আবদুল্লাহ সন্তান জন্মের কয়েক মাস পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন। বিধবা মাতা আমিনার দায়িত্বেই ইহার লালন-পালন চলিতেছিল। কিন্তু আল্লাহর কি অপূর্ব মর্জী। সন্তানের মাত্র ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মাতা আমিনাও তাহাকে পূর্ণ ইয়াতীম করিয়া পরপারে চলিয়া গেলেন। তখন তাহার লালন-পালনের ভার পড়িল দাদা আবদুল মুত্তালিবের স্কন্ধে। কিছুদিন যাইতে না যাইতে বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিবও মৃত্যুবরণ করিলেন। তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় পুত্র আবু তালিবের কাছে এই পিতা-মাতা হারা ইয়াতীম নাতিটিকে আল্লাহকে সাক্ষী করিয়া সোপর্দ করিয়া যান।

এই শিশু নাতিটির নামকরণ করা হইয়াছিল মুহাম্মদ (সঃ) নামে। আহমদ নামে তাঁহার আর একটি নাম রাখিয়াছিলেন তাঁহার মাতা বিবি আমেনা।

আবু তালিব ইয়াতীম ভাতিজাটিকে পুত্রাপেক্ষা অধিক স্নেহে প্রতিপালন করিতেছিলেন।

মুহাম্মদ (সঃ)-এর মধ্যে জন্ম ও বাল্যাবধি যে সকল নিদর্শন এবং চরিত্র ও গুণাবলী প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ এবং বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যত বৃদ্ধি পাইতেছিল, সাথে সাথে তাঁহার ভিতরকার স্বভাব-চরিত্র এবং আচরণাদিও অধিকতর সৌন্দর্যময় হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষ করিয়া তাঁহার সত্য-সততা ও বিশ্বস্ততা গুণে মুগ্ধ হইয়া আরবের লোকেরা তাঁহাকে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করিল।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর লালন-পালনের ভার আবু তালিব গ্রহণ করিয়াছিলেন ঠিকই, কিন্তু জনৈক প্রধান কোরায়েশ নেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সংসারে পূর্ণ সচ্ছলতা ছিল না। অভাব একরূপ লাগিয়াই থাকিত। এই কারণে ভাতিজা মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা কোনরূপে করিতে পারিলেও তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। বরং আবু তালিব ভাতিজাকে সেই বয়সেই মাঝে মাঝে স্বীয় ব্যবসায় সফরের সঙ্গী করিতে শুরু করিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এভাবে উম্মীই থাকিয়া গেলেন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! এখানে এই আলোচনা সমাপ্ত করিয়া আমরা মূল আলোচনায় ফিরিয়া আসিলাম।

আসন্ন মৃত্যুর ভাবনা মনে লইয়াই অতি বৃদ্ধ খোয়াইলিদ এখন অন্তিম শয্যায় শায়িত। হাঁটা-চলা করিবার মত শক্তি এখন আর তাঁহার নাই। মাঝে মাঝে উঠিয়া কিছু

সময়ের জন্য বসেন আর বেশীর ভাগ সময়ই শায়িত থাকেন এবং শায়িতাবস্থায় আল্লাহর নাম জপ করেন।

সেদিন তাঁহার ভাতিজা ওয়ারাকা ইবনে নওফেল তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া চাচার সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। পরস্পরের কথাবার্তার ভিতরে হঠাৎ খোয়াইলিদ ভাতিজাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা নওফেল! বল তো হাশেমী খান্দানের মৃত আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (সঃ) নামক ছেলেটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা হয়?

ওয়ারাকা জওয়াব দিলেন, চাচা! ধারণার কথা কি বলিব, তবে তাঁহার জন্মদিনের ঘটনাসমূহ, বিভিন্ন নিদর্শনাদি তাহা ছাড়া তাঁহার চাল-চলন, আচার-আচরণ এবং অন্যান্য লক্ষণাদি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি তাহা তো দস্তুর মত আমাদের কিতাবের বর্ণনার সাথে হুবুহু মিলিয়া যায়। তবে সে এখনও পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই। তাই সঠিক কোন মন্তব্য করা যাইতেছে না।

ভাতিজার কথার পরে খোয়াইলিদ বলিলেন, আমার কানেও তাঁহার সম্পর্কে যে সব কথা আসিয়াছে তারপর তুমি এখন যে কথা বলিলে, তাহাতে আমার কি মনে হয় জান? এই মুহাম্মদ নামক বালকটির মধ্যেই আখেরী পয়গম্বর লুক্কায়িত রহিয়াছেন।

এই সময় হযরত খাদীজা (রাঃ)-ও সেখানে আসিয়া পড়িলেন। খোয়াইলিদ তাহার কথা বলিয়াই যাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, ওয়ারাকা! মনে একটা দারুণ দুঃখ রহিয়া গেল। তাহা কি জান? শেষ যমানার নবীকে দেখিয়াও যাইতে পারিলাম না। আমার মনের দৃঢ় ধারণা, ঐ মুহাম্মদ (সঃ)-এর মধ্যে নিশ্চয়ই আল্লাহর নবুয়ত সুপ্ত। অচিরেই যথাসময়ে উহা আত্মপ্রকাশ করিবে। আমার তো সময় উপস্থিত। এখনই তোমাদের কাছ হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। তোমাদের কাছে বলিয়া গেলাম। তোমরা আখেরী নবীর কাছে আমার তরফ হইতে সালাম আরজ করিও । আর তোমাদের প্রতি আমার নসীহত এই যে, তিনি যাহা বলিবেন, বিনা দ্বিধায় তোমরা তাহা মানিয়া নিও। অতঃপর হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিলেন, খাদীজা! যাহা বলিলাম, শুনিলে তো।

এইকথা বলিয়াই তিনি নীরব হইলেন। মনে হইল, তিনি যেন ধীরে ধীরে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িতেছেন। একটু পরেই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল তাঁহার নাসিকাগ্রে হস্ত রাখিয়া দেখিলেন, শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, খাদীজা! চাচাজী বোধ হয় আমাদেরকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। হযরত খাদীজার (রাঃ) দুই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে খাদীজা (রাঃ)

হযরত খাদীজা (রাঃ) তৃতীয়বার বৈধব্যের শিকার হইয়া যখন পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলেন, বৃদ্ধ খোয়াইলিদ তখন নিজের বার্দ্ধক্য ও দুর্বলতাজনিত কারণে তাঁহার ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কন্যা খাদীজার (রাঃ) হস্তেই ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহার আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। তাহা এই যে, যদি হযরত খাদীজা (রাঃ) পিতার বিরাট ব্যবসায়ের ভার নিজ হাতে লইয়া দিবারাত্র ব্যস্ততার মধ্যে কাটাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার মনের বেদনা ও আঘাতরাশি তাহার তেমন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। যেহেতু ব্যবসায়িক ঝামেলায় অন্তরে শুধু ব্যবসায়িক চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা মনে উদয় হইবে না। খোয়াইলিদের ঐ উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ সফলই হইয়াছিল। তবে সে

যাহাই হউক না কেন, হযরত খাদীজা (রাঃ) ব্যবসার দায়িত্ব পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়া অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তাহা পরিচালনা শুরু করিলেন। পিতা খোয়াইলিদ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া পুরাপুরিভাবেই বুঝিয়া গেলেন যে, কন্যা হযরত খাদীজা (রাঃ) তাহার ব্যবসায়ের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখিতে সক্ষম হইবেন।

পিতার মৃত্যুর পরে হযরত খাদীজা (রাঃ) এখন নিজেই ব্যবসায়ের মালিক হইয়া পড়িলেন। এতদিন তিনি ব্যবসা চালাইতেছিলেন পিতা খোয়াইলিদের পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে। কিন্তু এইবার ব্যবসার মূল কর্তৃত্বই তাহার। তিনিই এখন ইহার পূর্ণ অধিকারিণী। এইবার খাদীজার (রাঃ) ব্যবসায় পিতা খোয়াইলিদের ব্যবসা অপেক্ষাও ব্যাপকতর হইল। কারণ পিতার সম্পদের সঙ্গে খাদীজা (রাঃ) মৃত দুই স্বামীর পরিত্যক্ত যে সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাও মিলিত করিয়া মূলধনের পরিমাণ অনেক বাড়াইয়া লইলেন।

ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে হযরত খাদীজার (রাঃ) অপূর্ব যোগ্যতা এবং সাফল্যের কতকগুলি বাস্তব কারণ ছিল ঃ যেমন—তাঁহার, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা ছিল অত্যন্ত প্রখর আর কর্মশক্তিরও বিচক্ষণতার প্রাচুর্য তাঁহার মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসুলভ অবস্থার মধ্য দিয়া। যেমন পিতা খোয়াইলিদের এতবড় ব্যবসায় কর্ম পরিচালনার রীতি-নীতি ও নৈপুণ্য তিনি বাল্যাবধি দেখিয়া পিতার যোগ্যতা, গুণাবলী, নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং পিতার ব্যবসা স্বহস্তে নিয়া তিনি পুরাপুরি পিতার রীতি-নীতিতেই তাহা চালাইতে লাগিলেন।

অবশ্য পিতার ব্যবসা দেশে-বিদেশে সর্বস্থানেই বিস্তৃত ছিল। শাম, সিরিয়া, ইয়েমেন, বসরা প্রভৃতি দেশে তাঁহার ব্যবসা চলিতেছিল অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। খোয়াইলিদের বেতনভোগী লোকদের দ্বারাই এই ব্যবসা চালানো হইতেছিল। মাঝে মাঝে খোয়াইলিদ নিজেও উল্লিখিত দেশসমূহে যাইয়া ব্যবসা তদারক করিয়া আসিতেন।

হযরত খাদীজা (রাঃ) জনৈক সম্ভ্রমশীলা মহিলা বিধায় একেবারে প্রত্যক্ষ তদারকতীতে বৈদেশিক বাণিজ্য চালাইয়া যাওয়ায় কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হইল। তবে খাদীজা (রাঃ) স্বীয় বুদ্ধিমত্তা বলে অচিরেই সেই সমস্যার সমাধান করিলেন। তিনি বেশ কয়েকজন বিশ্বস্ত ও কর্মঠ আত্মীয়কে স্বীয় ব্যবসায় নিযুক্ত করিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্য দেখা-শুনার দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পিত হইল। এইভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে ও অনাবিল গতিতে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ব্যবসায় চলিতে লাগিল।

খাদীজার (রাঃ) ব্যবসার বিস্তৃতি ক্রমশঃই প্রসারিত হওয়ার কারণে ব্যবসায় কর্মচারীর সংখ্যা আরও বাড়াইবার প্রয়োজন দেখা দিল। তখন তিনি গরীব প্রতিবেশীদের মধ্য হইতে অভিজ্ঞ ও কর্মঠ লোক বাছিয়া বাছিয়া কার্যে নিয়োগ করিলেন। এসব যোগ্য কর্মচারীবৃন্দের সততা ও কর্মদক্ষতার ফল হযরত খাদীজা (রাঃ) অচিরেই পাইতে শুরু করিলেন। আর এইরূপ শুধু ব্যবস্থাপনা এবং নিখুঁতভাবে ব্যবসা চলিতে থাকায় অল্প দিনেই শাম, সিরিয়া, ইয়েমেন প্রভৃতি দেশগুলিতে এক অতি বিচক্ষণা ব্যবসায়ী হিসাবে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল।

সকল ব্যবসায় কর্মচারীদের প্রতি খাদীজা (রাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশ ছিল, কোন ক্ষেত্রে কাহারও সহিত কোনরূপ প্রতারণা করিবে না। সকল সময়, সকল ক্ষেত্রে সততা রক্ষা করিবে। অতিলোভী ব্যবসায়িগণ এইসব পন্থায় অধিক লাভ অর্জন করিলেও

তাহাদের সুনাম হয় না; বরং অর্জিত সুনাম ক্ষুণ্ন হইয়া যায়। ব্যবসার ক্ষেত্রে হযরত খাদীজা (রাঃ) কতকগুলি নীতি রক্ষা করিয়া চলিতেন। যথা ঃ খুব বেশী লাভের লালসা না করা, অল্পলাভে পণ্য বিক্রয় করা, অধিক ক্রেতা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা, ক্রেতার কাছে মালের দোষত্রুটি গোপন না করা, ভাল মালের সহিত ভেজাল মাল মিশাইয়া না দেওয়া ক্রেতার সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং সর্বোপরি সততা রক্ষা করা।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ব্যবসায়ী কর্মচারিগণ তাহার এই মূল নীতিসমূহ যথাযথভাবে পালন করিতেন। যাহার ফলে ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। সুতরাং অচিরেই ব্যবসায়ী মহলে তাঁহার আসন সবার উপরে স্থাপিত হইল। ধনী হিসাবেও তাঁহার স্থান সবার উপরে নির্ধারিত হইল।

আরবে তখন সাধারণতঃ দুইটি নিয়মেই ব্যবসা প্রচলিত ছিল। একটি নিয়ম এই যে, মহাজনগণ বেতন ভোগী লোকদের দ্বারা ব্যবসা করিত। কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হইত এবং ব্যবসায় যাহা লাভ হইত, তাহা মহাজনই ভোগ করিত।

আর অন্য রকম নিয়ম ছিল এই যে, মহাজনগণ মূলধনহীন লোককে মূলধন বাবত নগদ অর্থ দিত। এই অর্থ দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে লাভের অংশ একটা নির্দিষ্ট হারে বন্টিত হইত। গ্রহীতা মহাজনের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া সে সম্পূর্ণ দায়িত্বে নিজে কিংবা কর্মচারী নিয়োগ করিয়া ব্যবসা চালাইত, ব্যবসার ব্যাপারে টাকা দাতা মহাজনের কোনরূপ হাত থাকিত না।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আশ্রয় দাতা ও লালন-পালনকারী চাচা আবু তালিব অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার পরিবারের লোকসংখ্যা বেশী ছিল কিন্তু উপার্জনকারী তিনি ছাড়া আর কেহ ছিল না। তাই, তাঁহার সংসারে অভাব লাগিয়াই ছিল। সে কারণে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করাও হইয়া উঠিল না। কিন্তু আবু তালিব তবু ভাতিজাকে লিখাপড়া শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) চাচার আর্থিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া নিজেই এই বিষয়ে অনাগ্রহ প্রকাশ করিলেন; বরং চাচাকে যাহাতে কিছুটা অর্থোপার্জনে সাহায্য করা যায় তিনি সেইদিকে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথম দিকে তিনি চাচার পশুপাল চরাইয়া তাঁহাকে কিছুটা সাহায্য করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার সাথে মাঝে মাঝে ব্যবসায়ী সফরে যাতায়াতও শুরু করিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আক্ষরিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় তিনি বাল্যাবধি আরবে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং যে কোন যোগ্যতা এবং কৃতকার্যতা প্রদর্শন করা তাঁহার স্বভাবসুলভ সততা, সদাচরণ ও কর্ম-দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া অচিরেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ব্যবসায়ী মহলে তাঁহার পরিচিতি ও সুখ্যাতি ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িল। প্রতিটি লোক তাঁহার আচরণ ও কার্য-কলাপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

তিনি একজন অতি সৎ, বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত এবং অনুপম চরিত্রের লোক, একথা তো লোকেরা আগেই জানিত। কিন্তু ব্যবসা ক্ষেত্রেও তিনি ঐসব গুণ প্রদর্শন করিয়া সবার

নিকট হইতে আরও বেশী প্রশংসা কুড়াইলেন। সকলের মনে তাঁহার প্রতি একটা পবিত্র শ্রদ্ধা এবং ভক্তির উদয় হইল। সবাই বলাবলি শুরু করিল যে, ব্যবসার ক্ষেত্রে এই চরিত্রের লোক কেহ কোনদিনই দেখে নাই।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর খাদীজার (রাঃ) ব্যবসায়ে নিযুক্তি

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ব্যবসায়ের পরিধি ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। তাঁহার বহির্বাণিজ্য পূর্বাপেক্ষা আরও ব্যাপকাকার ধারণ করিল। তাই তাঁহার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য একজন বিশেষ যোগ্য এবং সৎব্যক্তির প্রয়োজন দেখা দিল। এজন্য তিনি যোগ্য লোকের সন্ধান করিতেছিলেন। ঠিক এমনি সময় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ব্যবসায়িক সুনাম তাঁহার কানে গিয়া পৌঁছিল। তাঁহার সচ্চরিত্র এবং বিশ্বস্ততার জন্য তিনি যে ইতোপূর্বে আল আমীন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এই খবরও হযরত খাদীজা (রাঃ) জানিতেন। অতএব হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ই যে তাঁহার কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি, ইহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার আর বাকী থাকিল না। সুতরাং যদি সম্ভব হয়, যদি তিনি সম্মত হন তবে তাঁহার দ্বারা পূর্ণ করিতেই তিনি মনস্থ করিলেন। বিলম্ব করিয়া কোন লাভ নাই, তাই শীঘ্রই তিনি কোন একটি লোককে উপরোক্ত প্রস্তাব লইয়া মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এক বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত খাদীজা (রাঃ) স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী ফাতিমাকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট প্রস্তাব লইয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যদি হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্যভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এই জাতীয় কার্যে নিযুক্ত অন্যান্য লোক যে পারিশ্রমিক বা লভ্যাংশ পায় তাঁহাকে তিনি তদপেক্ষা দ্বিগুণ দিতেও প্রস্তুত আছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অভিভাবক ছিলেন আবু তালিব। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কাজই তিনি করিতেন না। তাই তিনি তাঁহার চাচাকে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর এই প্রস্তাবের কথা অবহিত করিলেন। আবু তালিব হযরত খাদীজা (রাঃ) এবং তাহার ব্যবসার অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন। সুতরাং তিনি অতি সন্তুষ্টচিত্তে ভাতিজা মুহাম্মদ (সঃ)-কে খাদীজার (রাঃ) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ঐ কাজ গ্রহণ করিতে সম্মতি দান করিলেন। চাচার অনুমতি লাভ করিয়া হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ও অবিলম্বে উক্ত কাজে যোগদান করিলেন।

বাণিজ্য সফরে বিদেশ যাত্রা

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বপ্রথম ব্যবসায়ী পণ্য লইয়া শাম-দেশ অভিমুখে রওয়ানা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সাহায্যকারী হিসাবে হযরত খাদীজা (রাঃ) আরও দুইটি লোক দিয়া দিলেন। তাহাদের একজন ছিল হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর নিকট আত্মীয় খুজাইমা। আর দ্বিতীয় লোকটি ছিল খাদীজার (রাঃ) প্রবীণ ও বিশ্বস্ত গোলাম মাইসারা। গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার সাথে সাথেই তাহাদের মাল বিক্রয় হইয়া গেল। এইবার খাদীজার (রাঃ) লাভ হইল ধারণাতীত বেশী।

এইবারকার বাণিজ্য যাত্রায় শামদেশে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে কেন্দ্র করিয়া কতিপয় ঘটনা ঘটিল। নিম্নে সে ঘটনাগুলি উল্লেখ করিতেছি।

শুকনা বৃক্ষের নবজীবন প্রাপ্তি

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ব্যবসায়ী কাফেলা শামে পৌঁছিয়া যে জায়গায় তাঁবু স্থাপন করিল, তাহার নিকটেই একটি খৃষ্টান ধর্ম মন্দির ছিল। নস্তুরা নামক একবিজ্ঞ খৃষ্টান ধর্মযাজক ঐ মন্দিরে অবস্থান করিতেন। এখানে তাঁবু স্থাপন করার পর এক সময় কাফেলার নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ঘটনাক্রমে নিকটস্থ একটি বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন। ঐ বৃক্ষটি বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পত্রপল্লবহীন অবস্থায় ছিল। উহার ডালপালাগুলিও শুকাইয়া গিয়াছিল। মোটকথা বৃক্ষটি মরিয়াই গিয়াছিল বলা যায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কুদরতের কি অপূর্ব মহিমা ! হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বৃক্ষটির মূলে বসামাত্রই উহার শাখা-প্রশাখাগুলি তাজা হইয়া উঠিল এবং উহাতে পত্র-পল্লব গজাইল।

ধর্মযাজক নস্তুরা মন্দিরে বসিয়া ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি পরম বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ ঘটনাতো এই লোকটিরই বোযর্গীর ফল। তাহা ছাড়া এমন ঘটনা আর কিসে হইতে পারে! তাহার মনে ঘটনাটা একটা বিরাট প্রশ্ন হইয়া দেখা দিল যে, তবে এই লোকটি কোন ব্যক্তি? মন্দির হইতে বাহির হইয়া তিনি বিদেশী কাফেলার তাঁবুর নিকট উপস্থিত হইয়া মাইসারার কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বলুন তো, ঐ বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আপনাদের ঐ লোকটির নাম কি?

মাইসারা তাহার নাম-পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। নস্তুরার মনে হইল যে, নবীর কারামত ব্যতীত এইরূপ ঘটনা কিছুতেই ঘটিতে পারে না। তিনি মনের উৎসাহ দমন করিতে না পারিয়া উঠিয়া হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে অপরিচিত ব্যক্তি ! শপথ অমুক দেবতার! আপনার নাম-পরিচয়টা প্রকাশ করুন তো শুনি।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জবাব দিলেন, সর্বনাশ হউক আপনার। মানুষের গড়া কোন দেবতার নামে শপথ করিতে শুনিলে আমার মনে যে অসহ্য আঘাত লাগে ততটা অন্য কিছুতেই নহে।

উল্লেখ্য যে, দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন একবার তিনি চাচা আবু তালিবের সাথে শামদেশে গিয়াছিলেন, তখন বহিরা রাহেব (খৃষ্টান পাদ্রী বহিরা)-ও তাঁহাকে দেখিয়া এইরূপ শপথ করিয়াছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তখনও এইরূপ জবাব দিয়াছিলেন।

নস্তুরা নিজের নিকট রক্ষিত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ খুলিয়া তাহাতে আখেরী নবীর আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নিদর্শনসমূহ ভালভাবে মিলাইয়া দেখিলেন। অতঃপর তিনি উৎফুল্লভাবে বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহর কি মহিমা! নবী যীশু খৃষ্টের উপর ইঞ্জীল নাযিলকারী মহাপ্রভুর শপথ করিয়া বলিতেছি, এই লোক অবশ্যই তিনি।

উপস্থিত লোকগণ নস্তুরার এই ধরনের মন্তব্যের কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিল, জনাব! আপনি এই কথাটি কি বলিলেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। খুলিয়া বলুন।

নস্তুরা বলিলেন, তোমাদের সঙ্গী এই লোকের মধ্যে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের ইঙ্গিত অনুযায়ী আখেরী নবীর নিদর্শনসমূহ দেখা যাইতেছে। অতএব আমার ধারণা এই যে, ইনিই শেষ যমানার ভাবী পয়গম্বর।

মাথার উপরে পাখির ছায়াদান

এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার বাণিজ্য কাফেলাসহ যে পথে শামযাত্রা করিয়াছিলেন সেই প্রচণ্ড রৌদ্রতপ্ত মরুপথে যাতায়াত করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। যাত্রীরা দুর্বিষহ রৌদ্রতাপে অত্যধিক শ্রান্ত এবং কাতর হইয়া পড়িত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অপূর্ব কুদরতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাণিজ্য কাফেলাটি চলিবার কালে দেখা গেল তাহাদের মাথার উপরে একটি বিরাট ছায়া বিরাজ করিয়া যেন তাহাদেরকে রৌদ্রের তাপ হইতে আড়াল করিয়া সাথে সাথে চলিতেছে। ইহাতে কাফেলার লোকগণ বিস্ময়ে অবাক হইয়া উর্ধপানে তাকাইয়া দেখিল, দুইটি বৃহৎ আকৃতির পাখি বিরাট পাখা বিস্তার করিয়া তাহাদের মাথার উপরে থাকিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের সাথে চলিতেছে। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া তাহাদের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, কাফেলার নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বোযর্গীতেই ইহা হইতেছে। তারপর যখন কাফেলা গন্তব্যস্থলে পৌছিয়া তাঁবু স্থাপন করিল, তখন পাখি দুইটি হঠাৎ কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল।

শামে পণ্য বিক্রয় কার্য শেষ করিয়া স্বদেশে বিক্রয়যোগ্য পণ্য শাম হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া আবার কাফেলা যখন স্বদেশাভিমুখে রওয়ানা হইল, তখনও পথে পূর্বের মত সেই একই অবস্থা সংঘটিত হইল। এই অভূতপূর্ব ঘটনায় কাফেলার লোকগণ সকলেই মনে করিল যে, তাহাদের ব্যবসায়ী কাফেলার নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিশ্চয় কোন সাধারণ লোক নন। অবশ্যই ইহার উপরে মহা প্রভু আল্লাহর খাস রহমত রহিয়াছে। সুতরাং কাফেলার লোকগণ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি অত্যন্ত ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়া পড়িল এবং তৎপ্রতি তাহাদের অন্তর শ্রদ্ধায় একবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

হযরত খাদীজার (রাঃ) খুশী ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন

শামদেশ হইতে প্রত্যাগত বাণিজ্য কাফেলা এবার যে পরিমাণ মুনাফা অর্জন করিয়া ফিরিয়াছে, হযরত খাদীজা (রাঃ) বৈদেশিক বাণিজ্য মাত্র একবারকার সফরে কোনদিনই এই পরিমাণ মুনাফার মুখ দেখেন নাই। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার স্বভাবসুলভ সততা রক্ষা করিয়া শুধু নিজের অতুলনীয় কর্মদক্ষতার ও যোগ্যতার বলেই এই কার্য সাধনে সক্ষম হইয়াছেন।

হযরত খাদীজা (রাঃ) খুযাইমা এবং মাইসারার নিকট এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন। বিশেষতঃ খুযাইমা এবং মাইসারার মুখে সফরের পথে ও শামে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কিত অলৌকিক ঘটনাগুলি শুনিয়া তাহার মন যেন অধিক পুলকিত হইয়া উঠিল। তাহার অন্তর জুড়িয়া যেন কেমন এক আনন্দের বাণ প্রবাহিত হইয়া চলিল। এমন সুযোগ্য লোক যে আল্লাহ তাহার ব্যবসায়ের মধ্যে মিলাইয়া দিয়াছেন, এজন্য তিনি আল্লাহর দরবারে বার বার শোকরিয়া জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এখন ব্যবসায় পণ্য লইয়া শাম, সিরিয়া, বসরা, ইয়েমেন প্রভৃতি দেশে কিছুদিন বাদে বাদেই সফর করিতেছেন এবং প্রতিবারই তিনি ধারণাতীত মুনাফা করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। তবে তিনি শুধু মুনাফা করিয়াই আসিতেছেন তাহা নহে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে খরিদ্দার ও বিক্রেতাদের সাথে বিশ্বস্ততা, সততা ও ন্যায়নীতি প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মনও জয় করিতেছেন। কেহ তাঁহার ব্যবহার ও আচরণে কোনরূপ প্রতারণা বা ছল-চাতুরীর কোন পরিচয় দেখেতেছে না, তাহা ছাড়া সকলের সঙ্গে তাঁহার অমায়িক ও মধুর ব্যবহার মানুষকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এই সকল কারণেই তাঁহার ব্যবসায়ে অনুকূল অবস্থা এবং অধিক মুনাফা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হইতেছে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উল্লিখিত গুণাবলীই যে হযরত খাদীজার (রাঃ) ব্যবসাকে দৈনন্দিন অধিকতর উন্নতির পথে নিয়া চলিয়াছে হযরত খাদীজা (রাঃ) তাহার পুরাপুরিই খবর রাখিতেছেন। ব্যবসার উন্নতিতে তাঁহার সম্পদের প্রাচুর্য এখন পূর্বাপেক্ষাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদীজা (রাঃ) খুশী ও তৃপ্তির আনন্দে বিশেষ উৎফুল্ল। গরীব-দুঃখীকে দান করার অভ্যাস তাঁহার পূর্ব হইতেই ছিল। কিন্তু মনের আনন্দে এখন তাহা আরও বাড়িয়াছে। দুঃখী-দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পাড়া-প্রতিবেশীকে এখন তিনি মুক্ত হস্তে দান করেন এবং প্রাণ খুলিয়া সৃষ্টিকর্তার গুণ কীর্তন ও নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এক কথায় বলিতে গেলে হযরত খাদীজা (রাঃ) এখন যেন কেমন একটা নূতন তৃপ্তির আনন্দে সর্বাপেক্ষা বেশী সুখী। তাঁহার মত সুখী আর কেহ নাই। একদিকে তিনি যেমন এখন মান, সম্মান, যশঃ-গৌরব ও ধন-সম্পদে আরবের বুকে অতুলনীয়া, অন্যদিকে মানসিক খুশী ও তৃপ্তি লাভের ক্ষেত্রেও সকলের শীর্ষে।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর জীবনযাত্রা বেশ কিছুদিন এই অবস্থার ভিতরেই অতিবাহিত হইতেছিল। কিন্তু স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি রহস্য একেবারেই দুর্জ্ঞেয়। তাহার কণামাত্র উপলব্ধি করার সাধ্য কোন মানুষের নাই। আল্লাহ মানুষকে হৃদয় বলিয়া যে বস্তুটি দান করিয়াছেন, তাহার রীতি-নীতি-ধারা বড়ই বিচিত্র। সহসা হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মনের একমুখী ধারা তাঁহার হৃদয় মধ্যে হঠাৎ একটা দারুণ ভাবান্তর সৃষ্টি হইয়া গেল।

এইবার হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বাণিজ্য কাফেলা নিয়া সিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই সিরিয়া যাত্রার পর হইতেই যেন হযরত খাদীজা (রাঃ) মনমরা, আনমনা, উদাসীন; হযরত খাদীজা (রাঃ) কিন্তু নিজেই ইহার হদিস খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তাঁহার মনের কেন এ অবস্থা ঘটিল, কিজন্য হঠাৎ তাঁহার এত সুখ-সম্পদ-ঐশ্বর্য-তৃপ্তি মূল্যহীন হইয়া তিনি এমন অতৃপ্তির শিকারে পরিণত হইলেন? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়াও তিনি ইহার কারণের সন্ধান পাইলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন মোটেই সুখী নহেন, তাঁহার হৃদয়ের শান্তি যেন কোন সুদূরে বিলীন হইয়াছে, তবে কি হইল তাঁহার? তিনি তো একেবারেই পুতঃ-পবিত্রা, পার্থিব কোন মোহ-মায়া, কোনরূপ ইন্দ্রিয় সেবার পাপ আকাঙ্ক্ষা লেশ মাত্রও তো কেনদিন তাঁহার হৃদয়ে ছিল না বা এখনও নাই। তবে? তবে কি হইল তাঁহার? কেহ এই তবের উত্তর দিতে পারিবে কি? না, তাহা পারিবে না। ইহা সৃষ্টিকর্তার এক অত্যদ্ভুত দুর্জ্ঞেয় লীলা। ইহা মানব বুদ্ধির আগোচর। আল্লাহ যেভাবে তাহার লীলা-খেলা চালাইয়া যান, অক্ষম

দুর্বল মানুষ সেভাবেই তাহাতে ঘুরপাক খাইতে থাকে। এই চিরন্তন রীতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহাতে মানব জ্ঞানের কোন দখল বা অধিকার নাই তবে আমাদের সাধারণ জ্ঞানে যতটুকু যাহা বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই যে, হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে আল্লাহ দান করিবেন সারা মুসলিম জাহানের মাতার মর্যাদা। উম্মুহাতুল মু'মিনীন তথা হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধানার আসন অলঙ্কৃত করিবেন যিনি, তাহাকে তো সেই পথে যেভাবেই হউক না কেন ঘুরিয়া-ফিরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সেই অগ্রগমনকে কেহ কোনদিনই খণ্ডন করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মানসিক অবস্থা তাহার, এইরূপ ধারণ করা একান্তই অনিবার্য। তিনি এখন বড়ই উৎকণ্ঠিতা, উতলা এবং অশান্তির মধ্যে আছেন। তাঁহার মনে শুধু এই কথাটিই বার বার জাগিতেছে—হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া হইতে এখনও কেন প্রত্যাবর্তন করিতেছে না? একেকটি দিন এখন তাঁহার নিকট অতিশয় দীর্ঘ মনে হইতেছে। প্রতিদিনই তিনি এই ধারণা পোষণ করেন যে, আজ হয়ত সিরিয়ার বাণিজ্য কাফেলা প্রত্যাবর্তন করিবে। হৃদয়ের এই উদ্বেগ দমন করিতে না পারিয়া তিনি পারিবারিক কাজের ফাঁকে বার বার মরুপথের দূর দিগন্তে অপলক নেত্রে তাকাইয়া থাকিতেন।

এইভাবে বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। অতঃপর একদা তিনি উক্তরূপ অভ্যাস অনুযায়ী সুদূর পথের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দুই চোখ বেদনার্ত করিয়া ফেলিলেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল, অনেক দূরে যেন একটি কাফেলার মত দেখা যাইতেছে। ক্রমেই তাহা আগাইয়া আসিতেছে। তিনি নিজের মনকেই প্রশ্ন করিলেন, এই কাফেলাটিই কি তাঁহার প্রেরিত সিরিয়া হইতে প্রত্যাগত কাফেলা? মনেই জবাব দেন, তাহাই যেন হয়। কাপড়ের আঁচলে চক্ষুদ্বয় মুছিয়া আবার তিনি ভালভাবে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, হাঁ তাই ত। এতক্ষণে কাফেলাটি বেশ কিছুদূর আগাইয়া আসিয়াছে। তিনি আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। একই দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমে কাফেলার লোকজন পরিষ্কারভাবে চিনা যাইতে লাগিল। খাদীজা এবার দেখিতে পাইলেন, কাফেলার মধ্যস্থলে উটের পৃষ্ঠে সুদর্শন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) উপবিষ্ট আছেন, এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর নেত্রদ্বয় শীতল হইয়া গেল ও সারা অন্তর জুড়িয়া যেন আনন্দের ঢেউ বহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার কাফেলাসহ হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর গৃহ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর উতলা হৃদয়ে যেন শত আনন্দের বাণ একসাথে প্রবাহিত হইল।

বলার অপেক্ষা রাখে না, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এইবারও ব্যবসায় ভাল লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁহাকে নিয়মিত অংশ প্রদান করিয়া পারিতোষিক হিসাবে আরও বেশ কিছু অতিরিক্ত দিলেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

প্রণয়ের উন্মেষ এবং বিবাহের প্রস্তাব দান

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অপূর্ব গুণাবলী ও মহৎ চরিত্রে পুরুষ-রমণী কেহই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। প্রথম প্রথম হযরত খাদীজা

(রাঃ)-এরও তেমনি অবস্থা ছিল। তিনি তাঁহার মহান চরিত্র এবং গুণ মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর অন্তর বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ পাকের অপার মহিমা এবং নিগূঢ় রহস্যজনিত কৌশল প্রভাবে ক্রমে সেই আকর্ষণ ও ভক্তি-শ্রদ্ধার রূপটি প্রণয়ের রূপ ধারণ করিল।

যে খাদীজা (রাঃ) তাঁহার তৃতীয় স্বামী মৃত্যুবরণ করিবার পর জীবনে আর কোনদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না বলিয়া একরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। একবার তাঁহারই কতিপয় পরম হিতৈষী ব্যক্তি এবং আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে অন্তত আর একটিবারের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য জোর অনুরোধ ও পরামর্শ পেশ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করতঃ দৃঢ়তার সাথে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, না, যতদিন তিনি জীবিত আছেন, আর কোনদিনই তিনি ঐ পথে যাইবেন না। যতদিন তিনি জীবিত আছেন, এই অবস্থায়ই দিন কাটাইয়া দিবেন। সেই খাদীজার (রাঃ) মনের অবস্থা হঠাৎ পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি মনের গভীর গহনে এই আকাঙ্খা পোষণ করিয়া ফেলিলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মত গুণবান পুরুষকে যে নারী স্বামীরূপে লাভ ও বরণ করিতে পারে তাহার জীবন সার্থক হয়। তবে তাঁহার মনের বাসনা যতই প্রবল হউক না কেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কি তাঁহার মত এক অধিক বয়স্কা প্রৌঢ়া নারীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন?

কিন্তু সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বলেন যে, হযরত খাদীজার (রাঃ) এই ব্যাপারে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যতই থাকুক না কেন, হৃদয়ের ব্যাকুলতা দমন করিতে না পারিয়া একদা তিনি নিজেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সামনে হাজির হইয়া তাঁহার কাছে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি এই ভাষায় তাঁহার মনের কথাটি ব্যক্ত করিয়াছিলেন ঃ "ইন্নী ক্বাদ রাগ্বিবতু ফীকা লিহুসনি খুলক্বিকা অ ছিদক্বি হাদীছিক" অর্থাৎ আমি আপনার মহৎ স্বভাব ও সত্যবাদিতার কারণেই আপনার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিতেছি।

অবশ্য অধিকাংশ জীবনীকার এবং ঐতিহাসিক হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর নিজেই এইরূপ খোলাখুলিভাবে মনের কথা ব্যক্ত করার ঘটনার সাথে একমত নন। তাঁহারা যাহা বলেন তাহা এই প্রকার ঃ

হযরত খাদীজা (রাঃ) অবশ্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে স্বামীত্বে বরণ করিবার আশায় অধীর আকুল এবং অতিশয় ব্যগ্র। কিন্তু হইলে কি হয়? তিনি এই ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ এবং নৈরাশ্যের দোলায়ও দুলিতেছিলেন। তিনি মনে মনে এ কথাও ভাবিতেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার মনের আকাঙ্খা পুরা করিবেন কি? সেই মহান পুরুষ যাঁহার মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে ভাবী পয়গাম্বরী। যিনি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁহার মত অতুলনীয় মানব কি কখনও খাদীজার (রাঃ) মত এক সাধারণ রমণীকে বিবাহ করিবেন? তদুপরি তিনি এক পঁচিশ বৎসর বয়স্ক সেরা রূপবান সুন্দর সুঠাম যুবক পুরুষ, পক্ষান্তরে, আমি এক চল্লিশ বৎসর বয়স্কা বিগত যৌবনা প্রৌঢ়া রমণী। অতএব আমাকে তিনি জীবনসঙ্গিনীরূপে বরণ করিবেন তাহা আশা করা যায় কোন সাহসে? এই ধরনের চিন্তা-ভাবনাও হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মনের মধ্যে উলট-পালট করিতেছিল। উপরন্তু তিনি গুণে মানে, যশে, সম্পদে ও সচ্চরিত্রতায় আরবের এক শ্রেষ্ঠ মহিলা ছিলেন। নিজের মুখে প্রস্তাব দিয়া যদি প্রত্যাখ্যাত হন, তবে একদিকে যেমন তিনি

নৈরাশ্য ও প্রত্যাখ্যানের বেদনায় মুষড়াইয়া পড়িবেন, অন্যদিকে তিনি লোক লজ্জায় মুখ ঢাকিবার জায়গা পাইবেন না।

সুতরাং প্রথমতঃ প্রকাশ্যেই বিষয়টি আলাপালোচনা না করিয়া একটু সঙ্গোপনে ও সুকৌশলে অগ্রসর হওয়া উত্তম মনে করিয়া তিনি এই পথ অবলম্বন করিলেন।

একদা খাদীজা (রাঃ) নাফিসা বিনতে উমাইয়া নাম্নী তাহার এক অতি বিশ্বস্তা ও অনুরক্তা বাঁদীকে (বর্ণনান্তরে নাফিসা বাঁদী নহে আত্মীয়া ছিলেন) নিভৃতে ডাকিয়া প্রয়োজনীয় কথা শিখাইয়া, বুঝাইয়া উপদেশ দিয়া প্রস্তাবটি দিয়া তাঁহাকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সমীপে প্রেরণ করিলেন।

যথাসময়ে নাফিসা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর নিকট হইতে তাঁহার এই আত্মীয়ার আগমনে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহাকে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করিলেন। অতঃপর তাহার আগমনের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। নাফিসা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও সুচতুরা মহিলা ছিলেন। তদুপরি হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁহাকে শিখাইয়া-বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতএব প্রথমেই তিনি আসল বিষয়টি উল্লেখ না করিয়া ব্যবসায় সম্পর্কিত কিছু কথাবার্তা বলিলেন, তারপর বিভিন্ন কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জনাব! আপনার তো পুরাপুরিভাবেই বিবাহের বয়স হইয়া গিয়াছে, তবু বিবাহ করিতেছেন না কেন?

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জবাব দিলেন, বিবাহ করার মত সংস্থান এখনও আমার হয় নাই। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও দেনমোহরাদির যোগাড় না করিয়া বিবাহের কথা চিন্তাও করা যায় না। নাফিসা বলিলেন, আপনার ওজরের যুক্তি আছে নিশ্চয়। আচ্ছা যদি এমন কোন মহিলা আপনার সাথে বিবাহে আবদ্ধ হইতে রাজী থাকে যে, খান্দানের দিক হইতে সে উত্তম হয়, রূপে-গুণে, চরিত্রেও শীর্ষস্থানীয়া, সততা, সুনাম এবং যশেমানে সম্মানে ও ধন-সম্পদেও অতুলনীয় হয়, উপরন্তু সে মহিলা যদি বিবাহোপলক্ষে আপনার যাবতীয় খরচাদি নিজে বহন করে, তাহা হইলে তো আপনার বিবাহে কোনরূপ আপত্তি নাই?

তাহার কথা শুনিয়া হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার, কে এমন মহিলা থাকিতে পারে, যে এত বোঝা ও দায়িত্ব নিজের মাথায় উঠাইয়া লয়? আর তাহা লইবেই বা কোন স্বার্থে?

নাফিসা বলিলেন, দেখুন জনাব! সে ভাবনা তো আপনার নয়। সে ভাবনা হইল সেই মহিলার। এইরূপ অবস্থা হইলে আপনি সেই মহিলাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা বলুন।

এবার হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এমন মহিলা খুলিয়া বলুন তো শুনি!

নাফিসা প্রকাশ করিলেন, হযরত খাদীজা (রাঃ) স্বয়ং এই মহিলা।

একথা শুনিয়া হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ভাবিলেন যে, অগাধ ধন-সম্পদ ও সুযশশালিনী মহিলা হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁহার মত এক নিঃস্ব ব্যক্তির সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে কোন স্বার্থে, ইহা যে তাঁহার ধারণারও অতীত। তাই প্রস্তাবে তিনি মনে মনে খুব খুশীই হইলেন এবং আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করিলেন।

প্রকাশ্যে অবশ্য কোন মন্তব্য করিলেন না, নীরব রহিলেন। নাফিসা সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়া লইয়া এই নীরবতা খাদীজার (রাঃ) কাছে গিয়া জানাইলেন।

এদিকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ খবর তাঁহার অভিভাবক ও পিতৃব্য আবু তালিব, হামজা এবং আব্বাস-এর কাছে ব্যক্ত করিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ধন-সম্পদ, সুনাম, সুযশ, বংশীয় আভিজাত্য সর্বোপরি চারিত্রিক পবিত্রতার কারণে তাহেরা অর্থাৎ পবিত্র আখ্যাপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণে প্রত্যেকেই এই প্রস্তাবের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সানন্দে ভাতিজাকে এই বিবাহে অনুমতি দান করিলেন।

আবু তালিব মনে করিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অভাবগ্রস্ত লোক। পক্ষান্তরে খাদীজা মক্কার সেরা সম্পদশালিনী। সুতরাং ইহার সহিত তাঁহার বিবাহ বন্ধন স্থাপিত হইলে ভাতিজা মুহাম্মদ (সঃ) অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করিতে পারিবে। এই কথা চিন্তা করিয়া তিনি খুশী হইলেন সর্বাপেক্ষা বেশী।

অতঃপর এ ব্যাপারে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে আবু তালিবের মুকাবিলা মতে খোলাখুলি আলাপ হইল এবং কথাবার্তা চূড়ান্ত হইয়া গেল।

আমাদের দেশের মত একটি রেওয়াজ তখন আরবেও ছিল, তাহা হইল বিবাহ স্থির করিতে পাত্রী পক্ষের কাছে পাত্রপক্ষ হইতে প্রথম অবশ্যই কোন লোক গিয়া প্রস্তাব দিতে হইত। পাত্রীপক্ষ তাহা কবুল করার পর দুই পক্ষের মধ্যে সবকিছু আলাপ-আলোচনা করা হইত। এই রীতি অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (রাঃ)-এর কাছে গিয়া প্রস্তাব পেশ করিলেন এবং হযরত খাদীজা (রাঃ) তাহা কবুল করিলেন। তাহার পরে আবু তালিব এবং হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মধ্যে মোকাবেলা মতে আলাপালোচনার পর বিবাহের তারিখ নির্ধারিত হইল।

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে, বিবাহের কথাবার্তা বলিবার কালে আবু তালিব কবিলায় বনু হাশিমের ও মুযার গোত্রের কতিপয় সরদারকে সঙ্গে করিয়া নিয়াছিলেন। এই সময় হযরত খাদীজার (রাঃ) পিতা জীবিত না থাকিলেও তাঁহার চাচা আমর ইবনে আসাদ অবশ্য জীবিত ছিলেন। আবু তালিবের সাথে বিবাহ সম্পর্কিত কথাবার্তা বলিবার কালে হযরত খাদীজা (রাঃ) চাচার উপরে নির্ভর না করিয়া প্রয়োজনীয় কথাবার্তা নিজেই বলিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আরবে সে যুগেও নারী স্বাধীনতা বলবৎ ছিল। বিশেষতঃ বৈবাহিক ব্যাপারে ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা, তাহারা নিজেদের খুশীমত বিবাহ করিতে এবং বিবাহ ছিন্ন করিতে পারিত।

বিবাহ সম্পন্ন

বিবাহ অনুষ্ঠানের স্থান নির্ধারিত হইয়াছিল হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বাড়ীতে। নির্দিষ্ট তারিখে আবু তালিব তাঁহার ভ্রাতা হামজাহ, আব্বাস প্রমুখ এবং কবিলায় বনু হাশিমের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণসহ ভাতিজা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে নিয়া হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বাড়ীতে গমন করিলেন।

বিবাহ মজলিস বসিয়া গেল। প্রথমতঃ উভয় পক্ষের লোকদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা চলিল। তৎপর পাত্র পক্ষের তরফ হইতে আবু তালিব দাড়ায়মান হইয়া এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে তিনি সর্বপ্রথম স্রষ্টার প্রশংসা করতঃ পরে তাহার বংশীয় মর্যাদা বিশেষতঃ হাশেমী বংশের ঐতিহ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতঃ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র তথা

বিবাহের পাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মহান গুণাবলী প্রকাশ করিলেন। তারপরে তিনি হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর জন্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর তরফ হইতে পাত্রীর অভিভাবকের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলেন।

ইহার পরে বসিয়া পড়িলেন এবং পাত্রী পক্ষ হইতে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর চাচা আমর ইবনে আসাদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনিও একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনিও প্রথমে স্রষ্টার গুণগান করিয়া তারপরে নিজেদের বংশের মর্যাদা বর্ণনা করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে পাত্র পক্ষের বংশীয় গৌরব ও মর্যাদা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিলেন, প্রভুর কৃপায় আমাদের বংশ মর্যাদাও কোনক্রমে ন্যূন নহে। আপনাদের বংশের সাথে আমাদের বংশও কয়েক পুরুষ পূর্বে যাইয়া পরস্পরে মিলিত হইয়া গিয়াছে। তদুপরি পাত্রী খাদীজার পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলই কোরায়েশ বংশোদ্ভুত। এইভাবে উভয় পক্ষে গৌরব গাথা প্রচার করিবার পর তিনি পাত্রী পক্ষের অভিভাবক হিসাবে ভাতিজী হযরত খাদীজার জন্য পাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষ হইতে আবু তালিব প্রদত্ত বিবাহ প্রস্তাব কবুল করিলেন। বলা বাহুল্য যে, বিবাহ কালে সে সময়ও আরবে মোহরানার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। হযরত খাদীজার (রাঃ) বিবাহে তাঁহার চাচা আমর ইবনে আসাদের প্রস্তাবে ৫০০ শত দিরহাম মোহরানা নির্ধারিত হইল।

উভয় পক্ষের অভিভাবকের ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বিবাহ বন্ধন এইভাবে সুসম্পন্ন হইল।

বিবাহের সময়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রকৃত বয়স ছিল ২৫ বৎসর ২ মাস ১০ দিন এবং হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বয়স ছিল পূর্ণ ৪০ বৎসর। অথচ আল্লাহ পাকের কৃপায় এই দম্পত্তির দাম্পত্য জীবন একাধারে পঁচিশ বৎসর ধরিয়া পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তির মধ্যে অতিবাহিত হইল।

তৎকালীন বিবাহরীতি

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সহিত হযরত খাদীজার (রাঃ) বিবাহ ঘটনা দেখিয়া আরবের তৎকালীন বিবাহ প্রথা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। প্রথমেই আলোচনা করিব দেন মোহর সম্পর্কে।

দেন মোহর প্রসঙ্গ ঃ হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সহিত হযরত খাদীজার (রাঃ) বিবাহে যে দেন মোহর বা মোহরানা ধার্য হইয়াছিল, তাহাতে সব ঐতিহাসিক একমত। কিন্তু তাহা কত ধার্য হইয়াছিল, সে ব্যাপারে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পিতৃব্য আবু তালিব বিবাহ সময়ে যে খুৎবাহ দান করিয়াছিলেন, তাহাতে পরিষ্কার দেখা যায় যে, তিনি মোহরানাস্বরূপ বিশটি উষ্ট্রের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং তাহাই ধার্য হইয়াছিল। অথচ কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, মোহরানা ধার্য হইয়াছিল বার আউকিয়া যাহা ৫০০ শত দেরহামের সমতুল্য।

পক্ষান্তরে অন্য কতিপয় ঐতিহাসিকের বর্ণনায় দেখা যায় যে, মোহরানা ৪০০ শত মেছকাল ধার্য হইয়াছিল। উহাতে ৬০০ দেরহাম হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য একজন খ্যাতনামা আলেম বলেন যে, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিবাহ কালে ৪০০ দেরহাম মোহরানা বাঁধা হইয়াছিল।

তবে এই ধরনের বিভিন্নতার কারণ সম্পর্কে আমাদের ধরণা এই যে, মোহরানার উষ্ট্রের মূল্যের ব্যবধানেই এইরূপ মতানৈক্যতা দেখা যাইতেছে। মূলতঃ মোহরানা বিশটি উটই ধার্য হইয়াছিল। তাহাতে আর সন্দেহের কোন কারণ নাই।

খুৎবাহর প্রচলন ঃ তৎকালীন বিবাহ প্রথার মধ্যে খুৎবাহ পাঠও একটি অপরিহার্য রীতি ছিল। খুৎবাহ পাঠ করার রীতি এ যুগেও রহিয়াছে। তবে এ যুগে বিবাহের খুৎবাহ পাঠ করিয়া থাকেন যিনি কাজী বা বিবাহ পড়াইয়া দেন। আর এই খুৎবাহর মধ্যে আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর প্রশংসা করিয়া পাত্র-পাত্রীর নসীহত এবং সমবেত লোকদিগকেও কিছু ধর্মীয় উপদেশাদি প্রদান করা হয়।

পক্ষান্তরে প্রাচীন কালের খুৎবাহর রীতি অন্য রকমের। যেমন আমরা দেখিতে পাই, পাত্র ও পাত্রীর উভয়ের গার্জিয়ানই পৃথক পৃথকভাবে ভাষণ প্রদান করেন এবং তাহারা প্রথমেই স্রষ্টার স্তুতিবাদ ঘোষণা করেন। তারপরে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং বংশ গৌরব ও মর্যাদার বিষয়টিকে খুব জোরে-শোরে প্রচার করেন। শেষভাগে পাত্র ও পাত্রীর কল্যাণ এবং মঙ্গল কামনা করিয়া ভাষণের ইতি টানা হয়। তবে খুৎবাহর প্রধান অংশই হইল আত্মগৌরব প্রচার করা এবং তাহার সাথে আত্মগরিমা ও অহঙ্কারকে কৌশলে ফুটাইয়া তোলা। ইহা যে কত বড় জঘন্য কাজ তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আরবের গোত্র প্রীতি ও স্বজন প্রীতির অত্যধিক প্রাবল্যের ফলেই বিবাহ কালে এইরূপে আত্মগৌরব প্রকাশের প্রচলন হইয়াছিল। উল্লেখ্য যে, নীতিগতভাবে বিবাহে খুৎবাহর প্রচলন উত্তম কাজ, তবে এই ধরনের খুৎবাহ কখনও উত্তম কাজ হইতে পারে না। উত্তম খুৎবাহ হইল যাহা বর্তমান সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানকালে পাঠ করা হয়।

অভিভাবকের মাধ্যমে বিবাহ ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বিবাহ অনুষ্ঠানে আর এক ব্যাপার দেখা গেল যে, বিবাহের ইজাব-কবুল হইল দুই পক্ষের দুইজন অভিভাবকের মাধ্যমে। এক পক্ষের অভিভাবক প্রস্তাব করিলেন এবং অন্যপক্ষের অভিভাবক তাহা কবুল করিলেন। এই ধরনের বিবাহ প্রথা বর্তমানেও প্রচলিত আছে। তবে তাহারা সাক্ষীর সম্মুখে পাত্র ও পাত্রীর নিকট হইতে অনুমতি নিয়া নেন। অথবা পাত্র ও পাত্রী পূর্বাহ্নেই তাহাদের পক্ষ হইতে অভিভাবকগণকে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিয়া দেয়। যতদূর মনে হয় এই ব্যবস্থা পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। তবে পাত্র ও পাত্রীর এইরূপ অনুমতি বা নিজেদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের পূর্বেই সম্পন্ন হইত। তাহা প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকদের পক্ষে দেখা সম্ভব হইত না। হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সহিত হযরত খাদীজার (রাঃ) বিবাহ ব্যাপার তদ্রূপ হইয়াছিল।

আর যদি পূর্বকালে পাত্র-পাত্রীর ইজাব-কবুল ব্যবস্থা নাই থাকে এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও খাদীজার (রাঃ) বিবাহ সেই পূর্বকালীন ব্যবস্থানুসারেই হইয়া থাকে, তবে তাহতেও দোষের কিছু নাই। কেননা হুযুরে পাকের (সঃ) ও হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বিবাহ হইয়াছিল, যখন নবুয়ত আসে নাই, ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে নাই। সুতরাং এ সময়ে পারিবারিক ও সামাজিক কাজ-কর্মের রীতি-নীতি তো প্রাচীন ব্যবস্থা মতই চলিবে। তাহাতে দোষের কিছু নাই। বিবাহের বালেগ পাত্র ও পাত্রীর ইজাব-কবুলের প্রয়োজন বা বাধ্য-বাধকতা ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে ইসলাম আসিবার পরে। ইসলামই এই নির্দেশ প্রদান করিয়াছে। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও হযরত খাদীজা

(রাঃ)-এর বিবাহকালে যদি বিধি অনুসারে ইজাব-কবুল ব্যবস্থা পালিত নাও হইয়া থাকে তবে তাহাতে দোষের কিছুই হয় নাই।

নৃত্যগীত প্রসঙ্গ ঃ হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত হযরত খাদীজার (রাঃ) বিবাহ অনুষ্ঠানকালে নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বিভিন্ন লোকের বর্ণনায় দেখা যায়। এক শ্রেণীর লোক সেই ঘটনাকে দলীলস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিবাহ কালেতো বটেই, তাহাছাড়া অন্যান্য উৎসব আনন্দসূচক অনুষ্ঠানাদিতেও নাচ-গান করা সিদ্ধ বলিয়া প্রচার করে। দুঃখের বিষয় এই যে, ঐসব অজ্ঞ লোকগণ একটিবারও একথা ভাবিয়া দেখে না যে, হুযুরে পাক (দঃ)-এর ঐ বিবাহটি ছিল ইসলাম আসিবার পূর্বে। অর্থাৎ নাচ-গান ইসলামে সিদ্ধ কি অসিদ্ধ, তাহা তখনও স্থিরিকৃত হয় নাই।

অতএব ঐ সময়ে কোন কিছু করা হইয়া থাকিলে তাহা পরবর্তী যুগেও সিদ্ধ হওয়ার দলীল হইতে পারে না।

ইসলাম আসিবার পরে যে ঐসব কাজ অন্যায় এবং অপছন্দনীয়রূপে পরিণত হইয়াছে, হাদীস শরীফে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে; যথা ঃ

হযরত রাসূলে করিম (সঃ)-এর সাথে হযরত আয়েশার (রাঃ) বিবাহ অনুষ্ঠানের পর বিবি আয়েশা (রাঃ) তাঁহার কতিপয় অল্প বয়স্কা সহচরীকে হুকুম দিলেন যে, তোমরা নাচ-গান কর। তদনুসারে তাহারা দফ বাজাইয়া নাচ-গানে রত হইল। ইতোমধ্যে সেখানে হযরত আয়েশার (রাঃ) পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ) আসিয়া পড়িলেন। তিনি হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে এভাবে নাচ-গান চলিতেছে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন এবং নিজের ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া কন্যা আয়েশা (রাঃ)-কে চপেটাঘাত করতঃ ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, ওহে ! তুমি না নবীর পত্নী। এ কি ব্যাপার চলিতেছে? এখনি এসব বন্ধ কর।

এই ঘটনার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, মুসলমানদের কোন উৎসব অনুষ্ঠানে নৃত্য ও গান-বাজনা সিদ্ধ কাজ নহে।

হযরত খাদীজার (রাঃ) প্রতি কোরায়েশদের আক্রোশ

হযরত খাদীজার (রাঃ) রূপ-গুণ, ধন-সম্পদ ও নানা গুণের কারণে তাঁহার সহিত পরিণয়াবদ্ধ হইতে কোরায়েশ কবিলার বহু লোকই লালায়িত ছিল এবং এজন্য বহু পাত্র প্রস্তাবও দিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর পাত্র ছিল নানা গুণে গুণবান; তথা জ্ঞানী, ভদ্র, রুচিবান, শান্তশিষ্ট প্রভৃতি। পক্ষান্তরে, ধনী, নির্গুণ, গর্বিত, দাম্ভিক এবং অজ্ঞান লোকও উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হইয়া ভাবিলেন যে, পাত্রী ও পাত্রীর অভিভাবকদিগের যখন মত নাই তখন আর ইহা নিয়া ভাবিয়া কি লাভ হইবে? এ বিষয়ে আর চিন্তা করাও বৃথা। এইরূপ মনে করিয়া তাহারা তাহাদের ব্যর্থতাকে ভুলিয়া গেলেন।

অথচ শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে যাহারা বিশেষ আত্মাভিমানী ও দাম্ভিক চরিত্রবিশিষ্ট ছিল, তাহারা হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহ করিতে না পারাটাকে নিজেদের জন্য একটা বিশেষ অপমান এবং পরাজয়তুল্য মনে করিল। তাহারা যখন দেখিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা তাহাদের মনের আক্রোশ মিটাইবার বাসনায় একটা কুট কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বাহ্যতঃ তাহারা কোরায়েশ গোত্রের শুভাকাঙ্খী সাজিয়া মক্কার যাবতীয়

কোরায়েশ গোত্র লইয়া একটি বৈঠকের আয়োজন করিল। বৈঠকে উহারা নিম্নোক্ত বক্তব্য তুলিয়া ধরিল ঃ

সমবেত অভিজাত কোরায়েশকুলের লোকগণ! আমরা মক্কার সেরা অভিজাত বংশীয় লোক। তদুপরি প্রভু আমাদেরকে যথেষ্ট ধন-সম্পদ দিয়াও আমাদের মর্যাদা আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। আমাদের অভাবানটন নাই। সকলেই আমরা সচ্ছল ও স্বাবলম্বী। আমরা সবাই পরম সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতেছি। ইহা আমাদের স্বাতন্ত্র্য এবং এক চিরন্তন ঐতিহ্য। পরনির্ভরশীল নিঃস্ব দরিদ্রের সাথে আমাদের ব্যবধান এইখানেই। তবে আমাদের গোত্রের মধ্যে যাহারা অভাবগ্রস্ত, তাহারা অযোগ্যতার কারণে দুর্দশালিপ্ত। তাহারাই আমাদের বংশীয় গৌরব বিনষ্টকারী ও আমাদের কাছে অন্য গোত্রের লোকদের তুল্য। সুতরাং যতদিন না তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন আসে, ততদিন তাহাদের সাথে আমাদের কোনরূপ সম্পর্ক না রাখাই উত্তম।

কিন্তু আপনারা দেখুন, কি পরিতাপের বিষয় খোয়াইলিদ-দুহিতা হযরত খাদীজা (রাঃ) আমাদের কোরায়েশ কুলের শ্রেষ্ঠ ধনবতী এবং বুদ্ধিমতীও বটে। অথচ তিনি কি একটি অঘটনই না ঘটাইয়া দিলেন। হাশেমী গোত্রের আবদুল্লাহ-তনয় মুহাম্মদ (সঃ) এক অতি দরিদ্র যুবক। খাদীজার (রাঃ)-ই ব্যবসায় ক্ষেত্রে সে বেতনভোগী কর্মচারীরূপে কর্মে নিয়োজিত। তাঁহারই সহিত হযরত খাদীজা (রাঃ) অবাধে পরিণয়াবদ্ধ হইলেন। তাঁহার জন্য সুযোগ্য পাত্রের কোন অভাব ছিল না। দেশের শ্রেষ্ঠধনী ও গুণী-মানী লোকগণ তাহাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব পাঠাইয়াছিল। কিন্তু খাদীজা (রাঃ) সে সব প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া যাহাকে আমরা নগণ্য মনে করি তাহাকেই নির্দ্বিধায় স্বামীরূপে বরণ করিয়া নিলেন।

শুনি মুহাম্মদ (সঃ)-এর স্বভাব-চরিত্র উত্তম, সে খুব সাধু পুরুষ। হইল বা তাহা কিন্তু তাহাতে লাভ হইবে কি ! অর্থহীন গরীব লোকের এই সাধুতা ও গুণাবলী কয়দিন থাকিবে? খাদীজা (রাঃ) কি এইসব কথা বুঝিতে পারে নাই? নিশ্চয় পারিয়াছে। আসলে কথা হইল এই যে, ইহা তাঁহার একটা অত্যন্ত একগুয়েমী ও সীমাহীন স্পর্দ্ধা। ইহা আমাদের সাথে একটা জেদ, অসহযোগিতা এবং চরম বাড়াবাড়ি। ইহা তাহার আপন লোককে অপর করিয়া অপর লোকের সাথে মিত্রতা সৃষ্টির অপপ্রয়াস মাত্র।

অতএব আমাদের বক্তব্য এই ঃ যদি আপনারা তাহার এই পদক্ষেপকে অন্যায় ও অসঙ্গত মনে করেন, তবে আসুন আমরা ইহার একটা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

উপস্থিত কোরায়েশগণ চিন্তা করিয়া দেখিল যে, ইহাদের কথার ভিতরে যুক্তি রহিয়াছে। অতএব তাহারা উহাদের প্রস্তাবও সমর্থন করিল। অতঃপর তাহারা সকলে পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, হযরত খাদীজার (রাঃ) উল্লিখিত কার্যের প্রতিবিধানে তাহারা তাঁহার সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিবে না, উঠা-বসা করিবে না অর্থাৎ তাঁহাকে একঘরে করিয়া রাখিবে। বাস্তবিক পক্ষে সেই অবস্থাই শুরু হইল। তাহারা তাঁহার সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্কই ছিন্ন করিয়া দিল এবং হযরত খাদীজার (রাঃ) স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে কুদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

কোরায়েশদের ব্যবস্থার প্রতিবিধান

হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁহার অতুলনীয় সৌভাগ্যের বলে যে দুর্লভ গুণবান স্বামী লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শুধু মক্কার কোরায়েশগণ কেন, সারা দুনিয়ার মানুষ যদি তাঁহাকে একঘরে করিয়া দেয়, তাহাতেও তাঁহার কিছু যায়-আসে না, তাহাও তিনি পরোয়া করেন না। কাজেই ইহার তিনি তেমন কোন গুরুত্বই দিলেন না। তবে কোরায়েশদের এই অন্যায় সিদ্ধান্তকে তাঁহার কিছুস্যখ্যক আপন আত্মীয়ও সমর্থন করিয়াছিল, এজন্য তিনি মনে খুব দুঃখ পাইলেন। আর এই কারণেই তিনি তাহাদের এই ভুল পদক্ষেপ শোধরাইয়া দিবার জন্যে একটি পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি আপাততঃ একটু নরম ভাব প্রদর্শন করতঃ সমাগত একটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিজের বাড়ীতে সমস্ত কোরায়েশকে দাওয়াত দিলেন। উহা এমন এক অনুষ্ঠান ছিল যে, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে কোরায়েশদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকিলেও এই উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে তাহারা উপস্থিত না হইয়া পারিল না।

হযরত খাদীজা (রাঃ) উপস্থিত মেহমানদেরকে যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন করতঃ পরিশেষে তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, উপস্থিত কোরায়েশ মণ্ডলী ! জানিতে পারিলাম আমি জনৈক গরীব ব্যক্তির সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি বলিয়া আপনারা আমাকে সমাজ হইতে পৃথক করিয়াছেন। আমার সহিত নাকি আর কোনরূপ সম্পর্কই রাখিবেন না।

আপনাদের এই সিদ্ধান্তটি খুবই দুঃখজনক। কেননা দেখিতেছি আপনারা মানুষের প্রকৃত সম্পদ জ্ঞান, গুণ, সততা, সত্যবাদিতা তথা মহৎ চরিত্রের তুলনায় অর্থ ও ধন-সম্পদকে বেশী মূল্যবান মনে করিতেছেন। আসলে কিন্তু উহা মানুষের মহত্ত্বের কাছে একেবারেই নগণ্য। এ কথাটা আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন। আর তাহা চিন্তা করার পরে বলুন, আমি কি অন্যায় করিয়াছি, না ন্যায় পথে আছি।

এই পর্যন্ত বলিয়া হযরত খাদীজা (রাঃ) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিল না। তখন তিনি পুনরায় বলিলেন, বুঝিয়াছি আপনাদের দৃষ্টিতে ধন-সম্পদই বড়, উহাই আপনাদের কাছে বেশী মূল্যবান যাহার কাছে উহার অভাব আছে সে আপনাদের কাছে তুচ্ছ ও নগণ্য। আর এই কারণেই সম্ভবতঃ আমার স্বামীকে আপনারা নগণ্য ভাবেন এবং তাঁহার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আমি চাহি না যে, আপনারা আমার ও আমার স্বামীর একই গোত্র হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি ও বিশেষতঃ আমার স্বামীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিবেন। ইহার প্রতিবিধান কল্পে আপনাদেরই সম্মুখে আজ আমি একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করিব। বিশেষতঃ তদুদ্দেশ্যেই আমি আজ আপনাদেরকে আমার এখানে আহ্বান করিয়াছি।

অতঃপর খাদীজা (রাঃ) সমবেত কোরায়েশদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনারা সকলে জানিয়া রাখুন, আমি সম্পূর্ণ সরল সুস্থমনে একেবারে স্বেচ্ছায় আমার স্থাবর-অস্থাবর অর্থ-সম্পদ যাহা কিছু আছে তাহা সমুদয় এই মুহূর্তে আমার নিঃস্ব স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ইবনে আবদুল্লাহকে দান করিলাম। অতএব এখন হইতে তিনি আমার সম্পূর্ণ সম্পদের অধিকারী হইলেন। অতঃপর তিনি যদি আমার মত রিক্ত, নিঃস্ব কাঙ্গালিণীকে পাক চরণে আশ্রয় দেন, তবে তাহাই আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিব।

খাদীজার (রাঃ) এই অভাবনীয় কার্য দেখিয়া এবং তাঁহার মুখের বাক্য শুনিয়া কোরায়েশগণ বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। তাহারা এই ধরনের ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত জীবনে কখনও দেখা তো দূরের কথা শ্রবণও করে নাই। কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। কাহারও মুখে কোনরূপ কথা সরিল না। অনেকেরই মনে ইচ্ছা জাগিল, খাদীজার (রাঃ) প্রশংসা করিবে। কিন্তু সেই ভাষাও কাহারও মুখে জানা ছিল না। তাই শুধু সকলেই "ধন্য খাদীজার (রাঃ) অন্তর ও ধন্য তাঁহার ত্যাগ" এই কথাটুকু বলিতে বলিতে সভাস্থল হইতে উঠিয়া বিদায় হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য যে, কোরায়েশদিগের হযরত খাদীজার (রাঃ) প্রতি আক্রোশ, ক্ষোভ এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতিহিংসা, ঈর্ষা এবং কুদৃষ্টিপাত করা ঐদিন হইতে দূর হইয়া গেল।

হযরত খাদীজার (রাঃ) দানের প্রতিদান

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) স্ত্রী খাদীজার (রাঃ) নিকট হইতে এত বড় এক বিরাট দান লাভ করিয়া যে একেবারে নির্বিকার থাকিলেন, তাহা নহে। যে বিরাট দানের দৃশ্য দেখিয়া মক্কার কোরায়েশকুল বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। যে অভূতপূর্ব দানের ঘটনা শুনিয়া সারা মুসলিম জাহান স্তম্ভিত হইয়া গেল। যাহা বিশ্বের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য উজ্জ্বল হইয়া গেল। সেই দান লাভ করিয়া যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শুধু আন্তরিক খুশী হইলেন এবং প্রিয়তমা ভার্যাকে ধন্যবাদই দিতে লাগিলেন তাহা নহে। তিনি হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর এই মহাদানের কি প্রতিদান দিতে পারেন, সেই ভাবনাই শুধু করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে শুধু এই এক কথাই অহরহ তোলপাড় করিয়া উঠিতে লাগিল যে, আত্মোৎসর্গকারিণী খাদীজা (রাঃ) তাঁহাকে দ্বিধাহীন চিত্তে যে দানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, একটি কপর্দক বা কানা-কড়ি পর্যন্ত হাতে রাখে নাই এই দানের সমতুল্য হইতে পারে এমন কি প্রতিদান তিনি হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে দিতে পারেন। এই চিন্তা হুযুরে পাক (সঃ)-কে খুবই ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

তবে একথা সত্য যে, তিনি হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর এই দানের বিপুল অর্থ হইতে একটি কপর্দকও তাঁহার নিজের বা পরিবারের কোন কাজে ব্যয় করিলেন না। তিনি উহা শুধু আরবের নিঃস্ব, দরিদ্র, অসহায় ইয়াতিমগণের সাহায্যে ব্যয় করিতে লাগিলেন। উল্লেখ থাকে, হযরত খাদীজার (রাঃ) এই অর্থ দ্বারা সূচনাকালীন ইসলামও নানাভাবে উপকৃত হইয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর ভাবনা এবং অস্বস্তির অন্ত ছিল না। এই কারণে যে, উল্লিখিত দান ও সাহায্য করার সুযোগ তো তিনি হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর দান গ্রহণের মধ্য দিয়াই লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই সুযোগ লাভের প্রতিদান হিসাবে তো নিশ্চয়ই হযরত খাদীজা (রাঃ)-এরও কিছু পাওনা আছে। তাঁহারও তো লাভ হওয়া দরকার। তাহা তিনি হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে দিতে পারিলেন কই?

এই ধরনের ভাবনা-চিন্তা ও অস্বস্তির মধ্যেই একদা তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তরফ হইতে বেলায়েত প্রাপ্ত হইলেন। তাহার কিছুদিন পরেই একদা ফেরেশতা জিব্রাঈল আসিয়া তাঁহাকে সালাম জানাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! মহাপ্রভু আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সালাম জানাইয়া আমার কাছে একটি খবর

পাঠাইয়াছেন তাহা এই যে, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর দানের ব্যাপার সম্পর্কে আপনার কিছু ভাবিতে হইবে না। কেননা তাঁহার সে দানের বিনিময় প্রদানের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এই ঘটনার কিছুদিন পরে হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর মে'রাজ সফরকালে যখন তিনি বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন দেখিলেন যে, বেহেশতের এক বিরাট কক্ষে অপূর্ব কারু-কার্যময় সুউচ্চ এমন এক বিরাট প্রাসাদ অবস্থিত, তেমন সুরম্য অট্টালিকা কাহারও ভাগ্যে কোনদিনই দর্শন লাভ ঘটে নাই। হুজুরে পাক (সঃ) উহার অনুপম সৌন্দর্য দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইলেন এবং ফেরেশতা জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভাই জিব্রাঈল ! এই অপূর্ব সুন্দর দালানটি কাহার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে?

ফেরেশতা জিব্রাঈল জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) ! এই অনুপম প্রাসাদটি আপনার প্রিয়তমা পত্নী হযরত খাদীজার (রাঃ) জন্য সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে। পরকালে তিনিই এখানে বসবাস করিবেন।

ফেরেশতা জিব্রাঈলের কথা শুনিয়া হযরত রাসূলে করীম (সঃ) আনন্দে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলিলেন, ভাই জিব্রাইল ! তবে তো খাদীজার (রাঃ) ধন-সম্পদ দানের বিনিময়ে উপযুক্ত প্রতিদানের ব্যবস্থাই করা হইয়াছে?

ইসলামের পূর্বাভাস এবং হযরত খাদীজা (রাঃ)

হুযুরে পাক (সঃ)-এর বয়স তখনও চল্লিশ পূর্ণ হয় নাই। তখনও তিনি নবুয়ত লাভ করেন নাই। তাঁহার বয়স তখন অবশ্য চল্লিশের কোঠায় পদার্পণ করিয়াছে। বেলায়েত লাভের আর কয়েক মাস মাত্র বাকি। কিন্তু এই সময় হইতেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নানারূপ বিচিত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। এ সময় তিনি রাত্রে যে সকল স্বপ্ন দেখিতেন, দিনে সেগুলি প্রায়ই পুরাপুরি ফলিয়া যাইত।

এই সময় তিনি জনপদ হইতে দূরে পাহাড়-পর্বত বা অরণ্য এলাকায় যখন একাকী চলিতে থাকিতেন, তখন তিনি হঠাৎ এইরূপ আওয়াজ শুনিতে পাইতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আসসালামু আলাইকা (অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হউক।) সহসা এইরূপ অদৃশ্য আওয়াজ শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিতেন এবং ভীতিবিহ্বল চিত্তে চারিদিকে তাকাইতে থাকিতেন। কিন্তু কোন দিকে কিছু না দেখিয়া আরও বেশী ভয় অনুভব করিতেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি এই সকল ঘটনা প্রিয়তমা পত্নী হযরত খাদীজার (রাঃ) কাছে বিবৃত করিতেন। বিস্ময়ের কথা বটে। এই সমস্ত ভীতিব্যঞ্জক ও বিস্ময়কর ঘটনা শ্রবণ করিয়া হযরত খাদীজার (রাঃ) রমণী-হৃদয় কিন্তু এতটুকু মাত্র বিচলিত বা কম্পিত হইত না। তিনি পরম শান্ত এবং ধীরস্থিরভাবে ইহা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার এইরূপ সাহসিকতা ও নির্ভীকতার কতগুলি বাস্তব কারণ ছিল। একে তো তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তাহা ছাড়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পরিস্থিতিতে নানাবিধ সমস্যা এবং ঘটনা প্রবাহে তাঁহার হৃদয়ে সাহস সঞ্চয়ের সুযোগ ও পরিবেশ আসিয়াছিল। তদুপরি তাঁহার স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তাঁহার একটা পরিষ্কার ধারণাও জন্মিয়া গিয়াছিল যে, ইনি কোন সাধারণ পর্যায়ের লোক নন। সুতরাং তাঁহার সহধর্মিণী হইবার মত মনোবল এবং বিশেষ

ক্ষেত্রে সাহসিকতা প্রদর্শনের যোগ্যতা তিনি অর্জন করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহা প্রদর্শনের জন্য সর্বদা পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন।

এই কারণেই তিনি স্বামীর মুখে ঐ সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বিস্মিত বা ভীতবিহ্বল না হইয়া বরং পুলকিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন এবং ভীতি-বিহ্বল স্বামীর মনে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিয়া সাহস যোগাইতেন।

হযরত খাদীজা (রাঃ) হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাধ্যমে স্বামীর যে নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সুযোগে তিনি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ভিতর-বাহির দুইটি দিকই তাঁহার নিকট অত্যন্ত নিখুঁতরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। সুতরাং তিনি দ্বিধাহীনভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যাঁহার চরিত্র এমন মহৎ ও নিষ্কলঙ্ক, যাঁহার জীবনে কোনদিন কোন একটি অন্যায় বা ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায় নাই, যাঁহার জীবন অতি পবিত্র কস্মিনকালে অপবিত্রতার লেশও যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রতি কোনরূপ বিপদ আসিতে পারে না, তাঁহার কোন প্রকারেই অকল্যাণ বা অমঙ্গল ঘটিতে পারে না। কাজেই হযরত খাদীজা (রাঃ) হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতি আগত বাহ্যতঃ বিপজ্জনক ও ভীতিসঙ্কুল ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াও তিনি সেইগুলিকে কোনরূপ অমঙ্গলকর বা বিপজ্জনক ঘটনা মনে না করিয়া বরং ইহা তাঁহার জন্য পরম কল্যাণকর পরিণতিরই নিদর্শন বলিয়া ভাবিয়া লইতে এতটুকুমাত্র সন্দেহ করিতেন না।

নবুয়ত একেবারে সমাগত হইবার কিছুদিন আগে ফেরেশতা জিব্রাঈল হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করিলেন। কিন্তু এই সময় হুযুরে পাক (সঃ) জিব্রাঈল সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট ধারণাও করিতে পারেন নাই। হেরা গুহায় তাঁহার যাতায়াত এবং তথায় যাইয়া ধ্যাননিবিষ্ট হওয়া তাঁহার কিন্তু একইভাবে চলিতেছিল।

একদা হুযুর (সঃ) হেরা গুহায় অবস্থানকালে ফেরেশতা জিব্রাঈল তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ঃ 'ইকরা' অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সঃ) ! আপনি পড়ুন। হুযুরে পাক (সঃ) বলিলেন, আমিতো পড়িতে জানি না। তখন জিব্রাঈল তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার বক্ষ নিজের বক্ষের সাথে মিলাইলেন। তারপর আবার বলিলেন, আপনি পড়ুন। কিন্তু হুযুরে পাক (সঃ) এবারও বলিলেন, আমি পড়িতে জানি না। তখন জিব্রাঈল আবার তাহার বক্ষের সাথে নিজের বক্ষ মিলাইয়া একটু জোরে চাপ দিয়া তারপর আবার বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সঃ) ! "ইক্বরা বিসমিরাব্বিকাল্লাযী খালাক্বা, খালাক্বাল ইনসানা মিন আলাক।" অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সঃ) ! আপনি পড়ুন আপনার সেই প্রতিপালকের নামে, যিনি এক টুকরা মাংসপিণ্ড দিয়া মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই কালামসমূহ পাঠ করাইয়া ফেরেশতা জিব্রাঈল তো চলিয়া গেলেন কিন্তু এ অভূতপূর্ব ঘটনার প্রভাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং কম্পিত কলেবরে কোন রকমে গৃহে পৌঁছিয়া সহধর্মিণী হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে বলিলেন, খাদীজা ! তুমি শীঘ্র আমাকে একটি কম্বল দ্বারা আবৃত করিয়া দাও। এইকথা বলিয়া তিনি শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁহার শরীর একটি কম্বল দ্বারা ঢাকিয়া দিয়া তাঁহার শিয়রে বসিয়া রহিলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর হুযুরে পাক (সঃ) একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সকল ঘটনা হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, খাদীজা !

আমি বড় ভয় পাইতেছি। শুনিয়া হযরত খাদীজা (রাঃ) বলিলেন, প্রিয়তম ! আপনার ভয়ের কোন কারণই নাই। নিশ্চয় আল্লাহ আপনার কোন ক্ষতি করিবেন না। কেননা আপনি তো কখনও কোন অন্যায় করেন নাই। আপনি সদা সত্য কথা বলেন, মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করেন। গরীব-দুঃখীর অভাব মোচনে চেষ্টিত থাকেন। আত্মীয়-স্বজনদেরকে আপ্যায়ন করেন। উপার্জনে অক্ষম লোকদেরকে সাহায্য করেন। বিপদাপন্ন লোকদের বিপদ দূরীকরণের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন। অসহায় ইয়াতীমদের মাথায় হস্ত বুলান। মানুষের সাথে সহৃদয়তা প্রদর্শন করেন। অতএব আল্লাহ আপনার ক্ষতি করিবেন কেন?

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর এই ধরনের সান্ত্বনা ও প্রবোধ বাক্যে হুযুরে পাক (সঃ) সত্যিই আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে শান্তি ফিরিয়া আসিল।

একদা আর একটি ঘটনা ঘটিল। ফেরেশতা জিব্রাঈল হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র হুযুরে পাক (সঃ) বলিলেন, খাদীজা ! এই যে, তিনি আসিয়াছেন। এ সময় ফেরেশতা জিব্রাঈল আগমন করিলে হুযুরে পাক (দঃ) শুধু একাই তাঁহাকে দেখিতেন। অন্য কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

হযরত খাদীজা (রাঃ) হযুরে পাক (সঃ)-এর কথা শুনিয়া আগন্তুককে পরীক্ষা করার জন্য হুযুরে (সঃ)-কে বলিলেন, আপনি আমার বাম উরুর উপর বসুন তো দেখি। হুযুরে পাক (সঃ) তাহাই করিলেন। তখন খাদীজা (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এখন কি তাঁহাকে দেখিতেছেন? হুযুর (সঃ) বলিলেন, হাঁ, দেখিতেছি। এইবার খাদীজা (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা এখন আপনি আমার ডান উরুর উপরে বসুন। হযুর (সঃ) তাহাই করিলে খাদীজা (রাঃ) বলিলেন, এখন কি তাঁহাকে দেখিতেছেন? হুযুর (সঃ) বলিলেন, হাঁ দেখিতেছি। তখন খাদীজা (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা এইবার আপনি আমার কোলের উপর বসুন তো দেখি। হুযুর (সঃ) তদ্রূপ করিলেন। খাদীজা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা এখনও কি তিনি আছেন? হুযুর (সঃ) জবাব দিলেন, হাঁ, এই যে আছেন।

এইবার খাদীজা (রাঃ) স্বীয় মুখের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, বলুন তো এখনও তিনি আছেন কি না? জবাবে হুযুর (সঃ) বলিলেন, না, এই মুহূর্তে তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর কথা শুনিয়া হযরত খাদীজা (রাঃ) বলিলেন, প্রিয় স্বামীন ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর ফেরেশতা, কিছুতেই শয়তান নহে।

হুযুরে পাকের (সঃ) হেরা গুহায় অবস্থানের মাত্রা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি মাঝে মাঝে একাধারে কয়েকদিন পর্যন্তই তথায় অবস্থান করিতেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন না। একদা তিনি ঐ গুহায় ধ্যানমগ্ন আছেন। এমন সময় ফেরেশতা জিব্রাঈল আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হুযুরে পাক (সঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সঃ) ! হযরত খাদীজা (রাঃ) আপনার জন্য খাবার লইয়া আসিতেছেন। তিনি আসিলে মহাপ্রভু আল্লাহর তরফ হইতে এবং আমার তরফ হইতে তাঁহাকে সালাম জানাইবেন ও তাঁহাকে এই সুসংবাদটি দিবেন যে, তাঁহার জন্য বেহেশত মধ্যে একটি সুরম্য বিরাট অট্টালিকা সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

অন্য একদিনের ঘটনা, হুযুরে পাক (সঃ) হেরা গুহা হইতে বাহির হইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন, সহসা ঊর্ধ্বাকাশ হইতে গুরু গম্ভীর স্বরে একটি আওয়াজ হইল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ) ! তিনি উক্ত আওয়াজ শুনিয়া ঊর্ধ্বাকাশ পানে চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, এক বিরাটকায় মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পদতল আকাশের পূর্ব সীমান্তে এবং মস্তকদেশ মধ্য আকাশে অবস্থিত।

ঐ মনুষ্যমূর্তি আবার গম্ভীর আওয়াজে বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সঃ) ! আমি আল্লাহর দূত ফেরেশতা জিব্রাঈল। আল্লাহর বাণী নবীদের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়াই আমার কাজ। আপনিও আল্লাহর নবী। অতএব আপনার নিকট আমি আল্লাহর বাণী পৌঁছাইয়া দিতে আগমন করিব। আপনার কোনরূপ ভয় পাইবার কারণ নাই।

জিব্রাঈল এভাবে হুযুরে পাক (সঃ)-কে আশ্বস্ত করা সত্ত্বেও জিব্রাঈলের বিরাট মূর্তি দেখিয়া এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া হুযুরে পাক (সঃ)-এর আতঙ্ক দূর হইল না। তিনি অপলক নেত্রে স্থির দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বদিকেই তাকাইয়া রহিলেন। মনে হইতেছিল যেন, তিনি বাহ্যিক অনুভূতিই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। হুযুরে পাক (সঃ) স্বয়ং বলেন, ঐ সময় আমি ঊর্ধ্বাভিমুখে যেদিকেই তাকাইতেছিলাম, সেদিকেই আমার চোখের সম্মুখে শুধু জিব্রাঈলের মূর্তি ভাসিয়া উঠিল।

ঐ সময় হুযুরে পাক (সঃ)-এর অচৈতন্য অবস্থায়ই অনেক সময় কাটিয়া গেল। পার্থিব কোন দিকেই তাঁহার কোন খেয়াল রহিল না।

এইভাবে অনেক সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও যখন হুযুরে পাক (সঃ) গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন না, তখন হযরত খাদীজা (রাঃ) ওদিকে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং হুযুর (সঃ)-এর অন্বেষণে লোক পাঠাইয়া দিলেন। প্রেরিত লোক হেরা পর্বতের নির্দিষ্ট গুহায় গিয়া হুযুরে পাক (সঃ)-কে তালাস করিল, তারপর পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। কিন্তু কোনখানে তাঁহার সন্ধান না পাইয়া অবশেষে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়া হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে খবর জানাইল যে, কোথাও তাঁহাকে পাওয়া যাইতেছে না। এ খবর শুনিয়া হযরত খাদীজা (রাঃ) উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় অধীর হইয়া পড়িলেন এবং তিনি নিজেই এবার তাঁহার তালাসে বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তাহার আর দরকার হইল না। ঠিক এই মুহূর্তে হুযুরে পাক (সঃ) তাশরীফ আনিলেন। এ সময় তিনি কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইলেও তাহার অবস্থা সম্পূর্ণ সুস্থির হয় নাই। তাই এবারও তিনি পূর্বের মত হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে বলিলেন, খাদীজা! তুমি আমাকে চাদর দ্বারা ঢাকিয়া দাও। খাদীজা (রাঃ) তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর হুযুরে পাক (সঃ) একটু সুস্থ হইলেন। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া পূর্বানুরূপ বলিলেন, খাদীজা! আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে। আমি হেরা গুহা হইতে বাহির হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

ঘটনা শুনিয়া হযরত খাদীজা (রাঃ) পূর্বের মতই স্বামীকে নানাভাবে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দান করিলেন।

অতঃপর তিনি অবিলম্বে স্বীয় পিতৃব্য পুত্র ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের নিকট চলিয়া গেলেন। এই ব্যক্তির পরিচয় ইতোপূর্বে আমরা কিছুটা উল্লেখ করিয়াছি। ইনি খৃষ্টধর্মের

একজন বিশিষ্ট ধর্মযাজক এবং যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল।

এই ব্যক্তির নিকটে খাদীজা (রাঃ) তাঁহার স্বামী সংক্রান্ত ঘটনাবলীর আদ্যপান্ত ব্যক্ত করিলেন।

শুনিয়া ওয়ারাকা ইবনে নওফেল সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, খাদীজা! তোমার বর্ণিত এই ঘটনা যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে তোমার স্বামী অবশ্যই পয়গাম্বর। আমি মহাপ্রভুর শপথ করিয়া বলিতেছি, হযরত মূসার নিকট এই নামুসে আকবর (বড় ফেরেশতা) আগমন করিতেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকটেও তিনিই আসিতেছেন।

হযরত খাদীজা (রাঃ) ওয়ারাকার নিকট যাহা শুনিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তাহা সবই স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট ব্যক্ত করিলেন।

ঐদিন হুযুরে পাক (সঃ) এতই ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন যে, যাহার ফলে তিনি বহুদিনকার অভ্যাস পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহা এই যে, তিনি কখনও মক্কার বাহিরে গমন করিলে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথমেই খানায়ে কাবা তাওয়াফ করিয়া লইতেন। তারপর গৃহে গমন করিতেন। এই অভ্যাস অনুযায়ী হেরা গুহা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিবারই প্রথমে খানায়ে কাবা তাওয়াফ করিয়া তারপর গৃহে ফিরিতেন। ঐদিন তাঁহার সে তাওয়াফ বাকী রহিল। প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর গৃহ হইতে বাহির হইয়া কাবাগৃহ তাওয়াফ করিতে গেলেন।

তাওয়াফ কার্য সমাধা করিয়া যখন তিনি গৃহে ফিরিবার উপক্রম করিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে কাবার প্রাঙ্গণে তাঁহার ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের সাথে সাক্ষাত হইয়া গেল।

হুযুরে পাক (সঃ)-কে দেখিয়াই ওয়ারাকা বলিলেন, আপনার সম্পর্কে কিছু ঘটনা আমি ভগ্নি খাদীজার (রাঃ) কাছে শুনিলাম, উহা আপনি নিজের মুখেই বলুন তো শুনি।

হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহার নিকট আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্লভাবে বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহর শপথ, হে মুহাম্মদ (সঃ) ! আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী। আপনার কাছে সেই নামুসে আকবার আসিতেছেন। যিনি হযরত মূসার (আঃ) নিকট আগমন করিতেন। আমি কসম করিয়া বলিতে পারি যে, নিশ্চয়ই আপনার দেশের লোকেরা আপনাকে অবিশ্বাস করিবে, আপনার প্রতি কঠিন অত্যাচার করিবে, আপনাকে জন্মভূমি হইতে তাড়াইয়া দিবে এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইবে।

হুযুরে পাক (সঃ) সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে তাহারা দেশ ত্যাগে বাধ্য করিবে? ওয়ারাকা বলিলেন, নিশ্চয়ই। ইহাতে কি আপনি আশ্চর্য বোধ করিতেছেন? দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল আসিয়াছেন, সকলেরই এইরূপ অসহ্য অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। আপনাকেও তেমনই অপমান ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইবে। যদি আমি সেইদিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি তবে ওয়াদা করিতেছি, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব।

এইকথা বলিয়া ওয়ারাকা হুযুরে পাক (সঃ)-এর দিকে অগ্রসর হইয়া পরম শ্রদ্ধার সাথে তাঁহার মস্তক চুম্বন করিলেন।

কিন্তু আল্লাহ পাকের মর্জী ছিল অন্যরূপ। আরবের এই মহাজ্ঞানী-গুণী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হুযুরে পাক (সঃ)-কে যদিও বা পূর্বাহ্নে চিনিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু

তিনি আর বেশীদিন এই পৃথিবীতে বসবাস করিতে পারিলেন না। কয়েকদিন পরেই তিনি পরপারে চলিয়া গেলেন।

হযরত খাদীজার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ

হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে আল্লাহ্ বহু দিক দিয়াই নারী জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছেন। কোন কোন দিক দিয়া তিনি জগতের নর-নারী উভয় শ্রেণীর মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর ইসলাম প্রচার শুরু করার পরে হযরত খাদীজা (রাঃ)-ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা এমন মর্যাদা, যাহার সহিত অন্য কিছুরই তুলনা হইতে পারে না। নিম্নে তাঁহার সেই ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটা উল্লেখ করিতেছি।

কিছুদিন পর্যন্ত ফেরেশতা জিব্রাঈল হুযুরে পাক (সঃ)-এর কাছে ঘন ঘন আসিবার পর মাঝে কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁহার আগমন বন্ধ থাকিল। এ সময় হুযুরে পাক (সঃ)-এর মন যারপর নাই ব্যগ্র এবং ব্যাকুল ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। হুযুর (সঃ) এ সময় গৃহে গমন না করিয়া অধিকাংশ সময় শুধু হেরা গুহায়ই কাটাইতে লাগিলেন। এমনি অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর হঠাৎ একদা জিব্রাঈল আসিয়া হুযুর (সঃ)-কে লইয়া সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে গমন করিলেন। এ সময় হুযুরে পাক (সঃ) জিব্রাঈলের গলায় একখানা পাথর ঝুলানো দেখিলেন। পাথরখানায় লিখা ছিল ঃ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" আর একদিন যখন হুযুর (সঃ) জিব্রাঈলের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভীতি বিহ্বল চিত্তে একখানা চাদরাবৃত অবস্থায় শায়িত ছিলেন ঠিক এমনি অবস্থায় ফেরেশতা জিব্রাঈল আসিয়া তাঁহার উপরে এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাচ্ছির ! কুম ফাআনযির। অরাব্বাকা ফাকাব্বির। অছিয়াবাকা ফাত্বাহহির। অররুজযা ফাহজুর।

অর্থাৎ হে চাদরাবৃত ব্যক্তি, উঠ এবং লোকদিগকে আল্লাহর ভয় দেখাও, তোমার প্রভুর মহত্ত্ব বর্ণনা কর, তোমার পোশাক পবিত্র কর। শিরক ও কুফর হইতে দূরে সরিয়া থাক।

এই নির্দেশের মাধ্যমেই হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রতি দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর চিরন্তন অভ্যাস ছিল, যখনই তাঁহার প্রতি কোন অহী নাযিল হইত, সাথে সাথে তিনি তাহা স্বীয় সহধর্মিণী হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কাছে প্রকাশ করিতেন। অতএব এই অভ্যাস অনুসারে দ্বীন প্রচারের হুকুম আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর নিকটই উহা প্রকাশ করিলেন। তিনি প্রথমে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, খাদীজা ! বলতো তুমি আমাকে কিরূপ মনে কর?

হযরত খাদীজা (রাঃ) বলিলেন, স্বামীন! আমি আপনাকে একজন অত্যন্ত সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, সুবিচারক, বিশ্বস্ত, ওয়াদা পালনকারী, আমানতদার এবং সত্যানুসারী পুরুষ বলিয়া মনে করি ও মনে-প্রাণে আপনাকে বিশ্বাস করি।

খাদীজার (রাঃ) কথা শ্রবণ করিয়া হুযুরে পাক (সঃ) বলিলেন, যদি তাই হয় খাদীজা ! তবে এই মুহূর্তে পাঠ কর ঃ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই। আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার প্রেরিত রাসূল। আর পৌত্তলিকতাকে অসার ও অন্যায় বলিয়া মনে কর এবং কুফর শিরককে মনে-প্রাণে ঘৃণা কর।

বস্তুতঃ হযরত খাদীজা (রাঃ) পৌত্তলিকতাকে কোনদিনই বিশ্বাস করিতেন না। কুফর ও শিরককেও তিনি কোনদিন প্রশ্রয় দেন নাই এবং হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর যে কোন বাক্য ও কার্যকে তিনি প্রথম হইতেই পছন্দ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার যে কোন উক্তিকে তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তদুপরি তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর এই সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দেখিয়া-শুনিয়া এবং স্বীয় পিতৃব্য-পুত্র ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট হইতে ঐ ধরনের বক্তব্য শুনার জন্য যেন পূর্ব হইতেই প্রতীক্ষারত ছিলেন। সুতরাং স্বামীর উক্তি শ্রবণ মাত্র এক মুহূর্ত দ্বিধা বা বিলম্ব না করিয়া সামান্য মাত্র ভাবনা-চিন্তা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, 'আমান্না অ সাল্লামনা ইয়া রাসূলাল্লাহ।' অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল ! আমি আপনার কথা সম্পূর্ণই বিশ্বাস করিলাম এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলাম। আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

ইসলামে তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হয় নাই। উহা ফরজ হইয়াছে আরও কিছুদিন পরে। কিন্তু হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ও হযরত খাদীজা (রাঃ) তখনও নফল নামায আদায় করিতেন।

ইবনে সাদ (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (সঃ) এবং হরযত খাদীজা (রাঃ) দীর্ঘ দিন ধরিয়া গোপনে নামায আদায় করিতেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আবুবকর (রাঃ)-ও তাঁহাদের সহিত নামায পড়িতে শুরু করেন।

হযরত খাদীজা (রাঃ) নিজে ইসলাম গ্রহণ করিয়া এখন কিভাবে ইহার প্রচার ও প্রসার করা যায়, সেই সম্পর্কে হুযুরে পাক (সঃ)-এর চেষ্টার সাথে হযরত খাদীজা (রাঃ) নিজেকেও মনে-প্রাণে শরীক করিয়া লইলেন।

আরবের লোকগণ প্রায় সকলেই মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। সুতরাং ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যাইত না। তদুপরি মূর্তিপূজার বদলে নামায আদায় করাও ছিল একটি বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ। তাই প্রকাশ্যে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলা এবং খোলাখুলিভাবে নামায আদায় করার বদলে হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহার মাত্র দুই-তিনজন সঙ্গী লইয়া গোপনে নামায আদায় করিতেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

একদা আফীফ কানছী নামক কোন এক কবিলার সরদার কিছু মাল-সামান খরিদ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিলেন। তথায় আসিয়া তিনি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তিনি বলেন ঃ

একদা ভোরবেলা আমি কা'বা গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। হযরত আব্বাস (রাঃ)-ও আমার নিকটে ছিলেন। আমি দেখিলাম, জনৈক যুবক কাবা ঘরের নিকট আসিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তারপর কা'বার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। একটু পরেই একটি বালক আসিয়া ঐ যুবকটির ডান পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেল। তারপর আর একজন স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পর তাহারা চলিয়া গেলে আমি হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে তাঁহাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, উহাদের মধ্যকার যুবকটি আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সঃ) ইবনে আবদুল্লাহ, বালকটি হইল আলী ইবনে আবু তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব আর স্ত্রীলোকটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ খাদীজা।

আফীফ যেন অনেকটা আশ্চর্যের ভাব প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন খাদীজা ? ইনি কি সেই ধনবতী মহিলা খাদীজা (রাঃ) ? যাহার ধন-সম্পদের কথা সকলের কাছে প্রচারিত এবং যাহার ব্যবসা-বাণিজ্য আরবের বিভিন্ন রাজ্যে প্রসারিত?

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হাঁ সেই খাদীজা (রাঃ)-ই।

আফীফ বলিলেন, ওখানে এতক্ষণ তাঁহারা কি করিলেন?

আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ওখানে তাহারা নামায পড়িতেছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিতেছে যে তাহার ধর্ম একমাত্র আল্লাহর ধর্ম। সে যাহা কিছু করে আল্লাহর নির্দেশানুসারেই করিয়া থাকে। তবে আমি যতদূর জানি, সম্ভবতঃ যমিনের উপর তাহারা এই তিনজনই মাত্র। উহারা ছাড়া আর কেহই তাহাদের পথের অনুসারী হয় নাই।

আব্বাস (রাঃ)-এর কথার পরে আফীফ বলিলেন, মনে হয় কি জানেন ? সম্ভবতঃ জগতে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটিতে যাইতেছে।

আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, মোটেই অসম্ভব নয়।

আফীফ বলিলেন, তাহাদের প্রার্থনার রীতিটি আমার কাছে এতই ভাল লাগিয়াছে যে, বলিতে কি আমার তাহাদের দলের চতুর্থ ব্যক্তি হইয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে।

দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ও হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর দাম্পত্য জীবন ছিল পরম সুখ-শান্তিময়। সারা দুনিয়ায় উহার নজীর পাওয়া দুস্কর। তাঁহাদের পারিবারিক জীবন এত মধুর ও সুখকর হওয়ার প্রধান কারণ হইল, ইহাদের একজন দুনিয়ার সেরা আদর্শ পুরুষ, অন্যজন দুনিয়ার সেরা রমণী। সুতরাং এমন যুগল দম্পতির জীবন সুখ-শান্তিময় না হইলে আর কোন স্বামী-স্ত্রীর পরিবারে সুখের আশা করা যায়?

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একে অপরের জন্য কতখানি সহযোগিতা এ সহানুভূতি ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করিতে পারে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে একে অপরের যে কিরূপ অংশভাগী হইতে পারে, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আমরা একমাত্র হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ও হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পারিবারিক জীবনের দৃশ্য হইতেই শিক্ষা লাভ করিতে পারি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে শুধু এতটুকু কথা বলা যায় যে, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের প্রকৃত আদর্শই হুযুরে পাক (সঃ) এবং হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পারিবারিক জীবন। দুনিয়ার কোন পারিবারিক জীবনই তাঁহাদের জীবনের সাথে তুলনীয় নহে।

হযরত খাদীজা (রাঃ) হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতি যে কিরূপ আত্মোৎসর্গকারিণী ও নির্ভরশালিনী ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বিপুল ধন-সম্পদরাশি নির্দ্বিধায় স্বামীর হস্তে তুলিয়া দেওয়ার মধ্য দিয়াই লাভ করা যায়।

পক্ষান্তরে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এই সম্পদ লাভ করিয়াও তাহা নিজেদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তির জন্য ব্যয় করিলেন না; বরং উহা নিঃস্ব, দরিদ্র বা অভাবগ্রস্ত জনের মধ্যে দুই হাতে বিলাইয়া দিলেন। ফলে হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর পরিবারে যে অভাব সে অভাবই আবার দেখা দিল। কিন্তু ধনীর দুহিতা হযরত খাদীজা (রাঃ) ধন-সম্পদে আরবের শ্রেষ্ঠ মহিলা, যিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিবাহের পূর্বে সম্রাজ্ঞীর হালে জীবন কাটাইতেছিলেন, তিনি স্বামীর সংসারের এই অভাব ও দারিদ্র্যকে খুশী মনে বরণ করিয়া লইলেন। অসংখ্য দাস-দাসী পরিবেষ্টিতা যে খাদীজা (রাঃ) সংসারের সামান্য একটি কাজও কখনও নিজের হাতে করেন নাই, তিনি স্বামীর অভাবী সংসারের যাবতীয় কার্য নিজের হাতে করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মনে হইত যে, ধনী গৃহের বিলাস জীবনাপেক্ষা এই অভাবগ্রস্ত সংসারে গরীবী জীবনযাপন করাকে খাদীজা (রাঃ) মনে-প্রাণেই ভালবাসেন। মনে হইত যেন হযরত খাদীজা (রাঃ) এই অনটনময় জীবনেই সচ্ছল জীবনযাপন অপেক্ষা খুশী। এই অবস্থার দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, তিনি হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতি কত বেশী আকৃষ্ট ও অনুরক্ত ছিলেন।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) মক্কার কাফির কোরায়েশ কুলের নির্যাতন ও হঠকারিতার ফলে যখন একবার স্বগোত্রীয় লোকজন লোক সমাজ ছাড়িয়া এক পার্বত্য এলাকায় গিয়া তিনটি বৎসর প্রায় বন্দী দশায় বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এই দীর্ঘ সময় বাহিরের কোন লোকজনের নিকট যাতায়াত, রুজী-রোজগার বা খাদ্যখাদক সংগ্রহের জন্য হাট-বাজার বা নগরে গমনাগমন পর্যন্ত বন্ধ ছিল, তখন এই চরম সঙ্কটকালে হযরত খাদীজা (রাঃ) সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টির সাথে হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সঙ্গে থাকিয়া একই মাত্র সঙ্গিনী ও খেদমতকারিণী হিসাবে কায়মনে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

সেই নির্বাসিত জীবনযাপনকালে আরবের সেরা ধনীর দুলালী খাদীজা (রাঃ) তাঁহার স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া কত যে কষ্ট ও ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন তাহা কল্পনাও করা যায় না। এ সময় একবার একাধারে তিনদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনাহারে কাটাইয়া দিতে হইল। তালাহ্ নামক এক প্রকার বৃক্ষপত্রের রস ছাড়া মুখে গুঁজিবার মত কিছুই ছিল না। উহা পান করিয়াই কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্যজনক ঘটনা। এমনি অবস্থার মধ্যেও কোনদিন হযরত খাদীজা (রাঃ) তাহার স্বামীর সেবায় বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। উপরন্তু স্বামীর মনোবল এবং চিত্তের দৃঢ়তা বজায় রাখিতে সর্বদা তাঁহাকে উৎসাহ এবং প্রেরণা দানে ব্যস্ত ছিলেন।

আজকাল তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে ও নারী জাগরণের ডামাডোলে বহু মহিলাই স্বামী সেবাকে দাসীপনা মনে করে ও উহাকে অমর্যাদাকর ঘৃণার কাজ বলিয়া ধারণা করে। সামান্য কোন অসুবিধা দেখা দিলেই স্বামীর প্রতি রুক্ষ ও কর্কশ বাক্যবাণ প্রয়োগেও এতটুকু কসুর করে না। নানারূপ কটুবাক্য বলিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। এই শ্রেণীর মহিলাদের অবশ্য হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কর্ম জীবন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। লক্ষ্য করা উচিত যে, তিনি কত বড় এক ধনবানের কন্যা এবং নিজেও আরবের শ্রেষ্ঠ ধনবতী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও একজন সম্পূর্ণ দাসীর ন্যায় কিভাবে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সেবাকে স্বীয় জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ নারী যদি বুদ্ধিমতী ও সতী-সাধ্বী হয় তাহা হইলে কিছুতেই সংসার সুখের না হইয়া পারে না এবং দাম্পত্য জীবনও মধুর না হইয়া যায় না। সতী ও সৎস্বভাবা নারীদের পারিবারিক জীবনকে স্বর্গীয় জীবনে পরিণত করিতে কতক্ষণ লাগে? উহা শুধু তাহাদের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে।

হযরত খাদীজা (রাঃ) সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যেও কোন একটি দিন তিনি স্বামীর সহিত কোনরূপ মান-অভিমান করিয়াছেন বলিয়া কেহ বলিতে পারিবে না।

বস্তুতঃ হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-কে যেমন আল্লাহ দুনিয়াতে মানব জাতির মুক্তির লক্ষ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে তেমনি আবার তাঁহার সুযোগ্য সঙ্গিনী, সাহায্যকারিণী, সুখে-দুঃখে সম অংশভাগিনী, বিপদে-আপদে হৃদয়ে প্রেরণা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, সান্ত্বনা ও প্রবোধদায়িনী এবং অন্তরে শক্তি সঞ্চারকারিণীরূপে তাঁহার সঙ্গে জোড় বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

একটি বিষয় চিন্তা করিলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হইয়া উঠে যে, আমাদের প্রিয় রাসূল (সঃ) মাত্র পঁচিশ বৎসরের যুবক হইয়া চল্লিশ বৎসর বয়স্কা প্রৌঢ়া খাদীজার (রাঃ) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পিছনে আল্লাহ তায়ালাই একটা সুস্পষ্ট কারণ রাখিয়াছিলেন। তাহা এই যে, হযরত খাদীজার (রাঃ) মাধ্যমে হুযুরে পাক (সঃ)-এর কেবল মাত্র দাম্পত্য সুখ ভোগই উদ্দেশ্য ছিল না। উহা তো থাকিবেই, কিন্তু উহার সহিত আরও অনেক উদ্দেশ্যই নিহিত ছিল এবং সে উদ্দেশ্যসমূহ কেবল জনৈকা প্রাপ্ত বয়স্কা বুদ্ধিমতী সতী-সাধ্বী ও আদর্শ স্থানীয় নারীর দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। হযরত খাদীজার (রাঃ) মাধ্যমে তাহাই হইয়াছে।

হযরত খাদীজা (রাঃ) একদিকে যেমন এক আদর্শ স্থানীয়া স্ত্রীসুলভ ব্যবহার দ্বারা হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর মনোরঞ্জন সাধন করিতেন, অন্যদিকে আবার তেমন এক পরম বুদ্ধিমতী ও সুযোগ্য জননীর মত জননীর আসনে বসিয়া মাতৃ-পিতৃহীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সন্তানের ন্যায় তদারক ও প্রতিপালন করিয়াছিলেন। শুধু প্রাক-ইসলামিক কালে নয়, রিসালত লাভের পর হুযুরে পাক (সঃ) যখন দ্বীন প্রচার শুরু করেন ও তাহাতে কাফির-কোরায়েশকুল রুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত চরম শত্রুতা আরম্ভ করে, প্রতি পদক্ষেপে তাঁহাকে বাধা দিতে থাকে, তখন সেই মহা দুর্যোগ মুহূর্তে হযরত খাদীজা (রাঃ) সত্যিই এক পরম বিচক্ষণা সাহসিকতা ও তেজস্বিনী মাতার ভূমিকা পালন করিয়া স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর লক্ষ্যে অটল থাকিয়া কর্তব্য পালনে প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন এবং নানাভাবে তাঁহাকে মনোবল সুদৃঢ় রাখিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁহার ধনরাশি সম্পূর্ণ স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। এই দান গ্রহণ করার কারণে যেন স্বামীর হৃদয় সঙ্কুচিত না হয় এবং কোন রকমের দুর্বলতা সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য তিনি স্বামীকে প্রায়ই এইরূপ বলিতেন, হে আমার স্বামী-আল্লাহর নবী (সঃ) ! আমি তো আপনার এক নগণ্য খাদেমা মাত্র। আমি কিছু অর্থ আপনার হাতে তুলিয়া দিয়াছি, তাহাতে যেন এরূপ মনে না করেন যে, ঐ ধন আমার ছিল। আমি

আপনাকে দান করিয়াছি। মূলতঃ ঐ ধনের প্রকৃত মালিক তো আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহর মর্জীতেই উহা আপনার হাতে আসিয়াছে। সুতরাং সে ব্যাপারে আপনার কোন কিছু চিন্তা করার নাই।

হযরত খাদীজা (রাঃ) হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে এই ধরনের ভালবাসা, স্নেহ ও সুসম্পর্ক রক্ষা করিয়া জীবন কাটাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-ও স্ত্রী খাদীজার (রাঃ) সাথে কেমন আচরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে কত অধিক ভালবাসিতেন, কি গভীর আর্কষণ, নির্ভরশীলতা এবং প্রাণের টান ছিল, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর স্ত্রী খাদীজার (রাঃ) প্রতি, এইবার তাহার কিছু নমুনা উল্লেখ করিতেছি।

ইহা এক অতি সত্যি কথা যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন প্রকৃতি ও বাস্তবতার ধর্ম ইসলামের মহান নবী। একদিকে তাঁহার চরিত্রে ছিল অলৌকিক বিভিন্ন গুণাবলীর সমাবেশ। অন্যদিকে ছিলেন তিনি সম্পূর্ণরূপে মানবীয় গুণ ও চরিত্রের অধিকারী। তাঁহার আদর্শ ও নীতি ছিল পারিবারিক জীবনযাপন। তাহা তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবেই পালন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার উম্মতকে শুনাইয়াছিলেন— ইসলামে বৈরাগ্যের কোন স্থান নাই। মানুষে মানুষে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, দয়া-মায়া, স্নেহ-সৌহার্দ্য এগুলি তাঁহার মধ্যে বিরাজ করিত শ্রেষ্ঠ মানবোচিতভাবেই। বিবাহকে তিনি মানব জীবনে বাধ্যতামূলক কার্য হিসাবে নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক এবং যৌনাকর্ষণকে তিনি উপেক্ষা তো করেনই নাই; বরং পরিপূর্ণরূপে স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। শুধু স্বীকৃতিই নয়, ইহাকে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া নির্দেশও করিয়াছেন। মোটকথা, স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-ভালবাসা সুসম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সেরা আদর্শ পুরুষ। তিনি স্বীয় স্ত্রী হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে গভীরভাবে ভালবাসিতেন ও তাঁহার সহিত মধুর আচরণ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার নিজেরই একটি উক্তি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়। একবার তিনি স্বীয় সাহাবাদের এক সমাবেশে বলিয়াছিলেন, সেই পুরুষ লোকই অত্যুত্তম, যে স্বীয় আচরণের মাধ্যমে তাঁহার স্ত্রীর কাছে উত্তমরূপে বিবেচিত হয়। আমি নিজেও তদ্রূপ বৈকি। হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিজের এই উক্তি দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি তাঁহার সহধর্মিণীর সাথে কিরূপ উত্তম ব্যবহার করিতেন এবং ইহার কত বেশী গুরুত্ব প্রদান করিতেন।

তিনি যে স্ত্রী খাদীজা (রাঃ)-কে শুধু ভালই বাসিতেন তাহা নহে। বিভিন্ন ব্যাপারে তিনি হযরত খাদীজা (রাঃ)-ই ছিলেন হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর শক্তি, সামর্থ, শান্তির আবাস এবং নিরাপত্তা লাভের একমাত্র নির্ভরস্থল। যখনই হুযুরে পাক (সঃ) বাহির হইতে কোন সঙ্কট বা সমস্যালিপ্ত হইয়া চিন্তাক্লিষ্ট বদনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখনই হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁহার স্বভাবসুলভ মিষ্টালাপ এবং সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা হুযুরে পাক (সঃ)-এর মনে নূতন শক্তি ও উদ্যম সৃষ্টি করিয়া তাঁহার চিন্তা-ভাবনা নিরসন করিতেন। এমন অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, হুযুরে পাক (সঃ) হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেন, প্রিয়তমা খাদীজা ! তুমি আমার

সঙ্গে কথা বল, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। অবস্থা দেখিয়া মনে হইতে হুযুরে পাক (সঃ) হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মুখের সান্ত্বনা বাক্য এবং প্রেরণামূলক উক্তিসমূহ শুনার জন্য খুবই আগ্রহান্বিত।

কখনও কখনও হুযুরে পাক (সঃ) গৃহে আগমন করিয়া হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কাছে নৈরাশ্যব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিতেন, খাদীজা ! আল্লাহ আমার উপরে যে মহাদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাহা আমি বহন করিতে সক্ষম হইব কি? মহা নবীর (সঃ) বাক্য শুনিয়া মনে হইত, যেন দুনিয়ায় তিনি সর্বাপেক্ষা আপন প্রিয়জন এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে স্বীয় হৃদয়ের কথা প্রকাশ করতঃ তাঁহার নিকট হইতে আশ্বাস এবং উৎসাহব্যঞ্জক জবাব শুনার জন্য অতিশয় ব্যগ্র ও উৎসুক।

হযরত খাদীজা (রাঃ) তখন প্রিয়স্বামীর মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেন প্রিয়তম ! আপনাকে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সাধন করিতে তিনিই আপনাকে সহায়তা করিবেন। আপনার নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। তিনিই আপনার সর্বপ্রধান সহায়।

হযরত খাদীজার (রাঃ) এই ধরনের প্রবোধবাক্য মুহূর্তে হুযুরে পাক (সঃ)-এর হৃদয় মধ্যে নূতন আশার আলোক বিকশিত হইয়া উঠিত। অমিত সাহস এবং নব উদ্যম সৃষ্টি হইত।

হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁহার এই ধরনের আচরণ দ্বারা নবীর (সঃ) হৃদয়ে যে কি পরিমাণ স্থান দখল করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবিতকালেই হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিভিন্ন উক্তি ও কার্য দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর উহা অনুভব করা গিয়াছে আরও পরিষ্কারভাবে।

হযরত খাদীজার (রাঃ) পরলোক গমনের পর হযরত রাসূলে করীম (সঃ) কথায় কথায় তাঁহার স্মরণ, নামোচ্চারণ এবং গুণ কীর্তন করিতেন। কোন কোন সময় তিনি উহা এত বেশী করিতেন যে, উহা লইয়া তাঁহার পরবর্তী পত্নীগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ বাক্যবাণও প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ) হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর স্মৃতি উল্লেখ করিতে গিয়া প্রায়ই বলিতেন, বিবি খাদীজার (রাঃ) স্মৃতি দ্বারা আমার ও ইসলামের যে উপকার হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। তিনি কোনও কোনও সময় এইরূপও বলিতেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে দুইজন লোকের ধন-দৌলতে বহু উপকার সাধিত হইয়াছে। তাহাদের একজন হযরত আবুবকর এবং অন্যজন হযরত খাদীজা।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে হুযুরে পাক (সঃ)-এর দাম্পত্য জীবনের গভীরতার একটি প্রধান প্রমাণ এই যে, তিনি হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে নিয়া দীর্ঘ পঁচিশটি বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ইহার বেশীর ভাগ সময়েই তিনি পূর্ণ যুবক ছিলেন। অথচ এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন নাই ; বরং তুলনায় যথেষ্ট বেশী বয়সের স্ত্রী হযরত খাদীজাকে (রাঃ) নিয়াই তিনি জীবন কাটাইয়াছেন। জীবনে তিনি বিবাহ অনেকগুলিই করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সবই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল হযরত খাদীজা (রাঃ) ইহধাম পরিত্যাগ করার পরে।

হযরত খাদীজার (রাঃ) মর্যাদা

হযরত খাদীজার (রাঃ) মর্যাদার আসন যে কত উচ্চে তাহা কাহারও পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব নহে। তিনি হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রথমা পত্নী, সারা জাহানের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদিকে স্বীয় বুদ্ধি-জ্ঞান-বিচক্ষণতা দ্বারা হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রধান পরামর্শদাতা ও মনে উৎসাহ, উদ্যম, প্রেরণাদাতার কাজ আঞ্জাম দিতেন। অন্যদিকে তাঁহারই বিপুল ধন-সম্পদ দ্বারা ইসলামের প্রথমাবস্থায় ইসলাম ও মুসলমানের নানাবিধ উপকার সাধিত হইয়াছিল। একদিকে যিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহধর্মিণী হিসাবে তাঁহার মনোরঞ্জনের দায়িত্ব পালন করিতেন, অন্যদিকে তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রতি মাতৃসুলভ স্নেহ-আদর-যত্ন এবং সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার অসহায় এবং সঙ্গীহীন জীবনের অভাব মিটাইতেন। সত্যি বলিতে কি, কেহ কোন মহিলার দ্বারা একাধারে এতগুলি উপকার লাভ করিতে পারে না। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর দ্বারা যাহা লাভ করিয়াছিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে অনেকগুলি বিবাহই করিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁহার যে সকল কাজে আসিয়াছিলেন অন্য কাহারও দ্বারাই তাহা সম্ভব হয় নাই। তাঁহাকে যেন আল্লাহ দুনিয়ায় মহানবীর যোগ্য সহচরী, সহধর্মিণী ও অর্ধাঙ্গিণী হইবার পূর্ণ যোগ্যতা দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আর ইহাই হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর প্রধান মর্যাদা। ইহারই মাধ্যমে হযরত খাদীজা (রাঃ) মর্যাদায় সব মহিলাদের উর্ধ্বে। ইহাই তাঁহার মূল এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাঁহার বৈশিষ্ট্যের অভাব নাই। বহু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মধ্যে নিহিত। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাঁহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই আলোচনা করিব। ঐগুলির ভিতর দিয়াই তাঁহার মর্যাদার প্রকৃতরূপ ফুটিয়া উঠিবে। এখানে তাঁহার মর্যাদা সম্পর্কিত হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর দুইটি হাদীসের মর্ম উল্লেখ করতঃ প্রসঙ্গটি সমাপ্ত করিতেছি।

একদা হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এরশাদ করিলেন যে, আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী রমণীকুলের মধ্যে বিবি মরিয়ম ও বিবি খাদীজা (রাঃ)-ই সেরা মর্যাদাশালিনী। এই হাদীসের তাৎপর্য বিশ্লেষণে মাজাহারে হক রচয়িতা এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, হুযুরে পাক (সঃ) পূর্ববর্তী যমানায় হযরত মরিয়ম শ্রেষ্ঠ মহিলা ছিলেন সন্দেহ নাই। তারপর আবার হুযুরে পাক (সঃ)-এর যমানায় নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজার (রাঃ) আসন সকলের উপরে, ইহাও সন্দেহাতীত। অতএব এই অবস্থার উপরে ভিত্তি করিয়া বলা চলে যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর যুগের নর-নারীগণ যেহেতু তৎপূর্ব যুগের নর-নারীদের তুলনায় উত্তম, সেহেতু হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সহধর্মিণী হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মর্যাদা হযরত মরিয়ম অপেক্ষা বেশী।

অন্য একটি হাদীস দ্বারাও হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করা যায়। উক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, হুযুরে পাক (সঃ)-এর অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) যিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর দুহিতা ছিলেন। তিনি মনে মনে এইরূপ বাসনা পোষণ করিতেন যে, আহা ! আমি যদি হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মত ভাগ্য লইয়া জন্মলাভ করিতাম, তবে আমার জীবন ধন্য হইত।

হযরত খাদীজার (রাঃ) আর একটি ভাগ্য তাঁহাকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। তাহা হইল, হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতিমা জোহরা (রাঃ) যাঁহার সম্পর্কে হুযুরে পাক (রাঃ)-এর নিজের উক্তি এই যে, তিনি হইবেন বেহেশতবাসিনী নারীকুলের সম্রাজ্ঞী। তাঁহার মত রমণীকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন হযতর খাদীজা (রাঃ)।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলী

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্যের অভাব নাই। উহার সংখ্যা নিরূপণ করা সহজসাধ্য নহে। তবে আমরা এখানে তাঁহার কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিতেছি। ইহা দ্বারাই তাঁহার মর্যাদার আসন উপলব্ধি করা যায়।

হযরত খাদীজা (রাঃ) ছিলেন মানব জাহানের সেরা মানবের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধানা সহধর্মিণী। তাঁহার মত মহান ব্যক্তির পত্নী হওয়ার মত মহাগৌরব লাভ যেমন তেমন কথা নহে। তদুপরি তাঁহার প্রথম এবং প্রধানা স্ত্রী হওয়াতো আরও বড় কথা।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বেশ কয়েকজন রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং একই সঙ্গে তাঁহারা একই সময়ে অনেকজনই ছিলেন। কিন্তু তাহা হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন হুযুরে পাক (সঃ) আর একটি বিবাহও করেন নাই।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর ঔরসে যতজন সন্তান জন্মলাভ করিয়াছিলেন তাহারা সব কয়জনই হযরত খাদীজার (রাঃ) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (বর্ণিত আছে যে, হযরত খাদীজার গর্ভের সন্তানদের ছাড়া একমাত্র মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে হুযুরে পাক (সঃ)-এর একজন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, যাহার নাম ছিল ইব্রাহীম। তবে শৈশবেই তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন।)

হুযুরে পাক (সঃ)-এর বংশ রক্ষাও হইয়াছে হযরত খাদীজার (রাঃ) মাধ্যমে। খাদীজার (রাঃ) কন্যা হযরত ফাতিমার (রাঃ) সন্তান-সন্ততির দ্বারাই দুনিয়াতে হুযুরে পাক (সঃ)-এর বংশ বিস্তার ঘটিয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাহা স্থায়ী থাকিবে।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর বেশ কয়েকজন স্ত্রীই হুযুর (সঃ)-এর রেহলত পাওয়ার পরেও জীবিত ছিলেন। ভাগ্যবতী হযরত খাদীজা (রাঃ) স্বামী হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর জীবদ্দশায়ই তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) জীবনে বহু শোক-তাপ পোহাইয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে তাঁহার বহু আত্মীয়-স্বজন এমনকি পরমপ্রিয় সন্তান-সন্ততি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর সনটি তাঁহার শোকের বৎসর হিসাবে আখ্যায়িত হইয়াছে।

ইসলাম অতি নূতন এবং একান্ত দুর্বল অবস্থায় যে দুইজন লোকের আনুকূল্যে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে একজন হযরত খাদীজা (রাঃ) ছিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রচারিত ইসলাম সমগ্র নর ও নারীর মধ্যে বিনা দ্বিধায় সর্বপ্রথম যিনি স্বীকার করিয়া তাহাতে দীক্ষিত হন তিনি ছিলেন হযরত খাদীজা (রাঃ)।

নেক কাজের প্রতিদানরূপে বেহেশত দানের প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ আল্লাহ নারীদের মধ্যে হযরত ফাতিমা ব্যতীত একমাত্র হযরত খাদীজা (রাঃ)-কেই প্রদান করিয়াছেন।

হেরা গুহায় বসিয়া হযরত জিব্রাঈল হুযুরে পাক (সঃ)-এর মাধ্যমে খাদীজা (রাঃ)-কে নিজের ও আল্লাহর পক্ষ হইতে সালাম জানাইয়াছিলেন, যাহা অন্য কোন মহিলারই নছীব হয় নাই।

উল্লিখিত অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি যে হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে সর্বকালের যে কোন মহিলার উপরে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছে, তাহাতে আর কোনরূপ সন্দেহ বা বিতর্কের অবকাশ নাই।

হযরত খাদীজার (রাঃ) তীক্ষ্ণধী এবং জ্ঞানের তুলনাও বুঝি নারী জগতের মধ্যে বিরল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁহাকে সবদিক হইতেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতা করিয়াছিলেন। এখানে একটি নমুনা উল্লেখ করিতেছি।

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, একটি হাদীস মারফত জানা যায়, জিব্রাঈল মারফত নির্দেশিত হইয়া হুযুরে পাক (সঃ) হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে আল্লাহর ও ফেরেশতা জিব্রাঈলের সালাম পৌঁছাইয়া দিলেন।

হযরত খাদীজার (রাঃ) এ বিষয় অজানা ছিল না যে, কেহ সালাম করিলে তাহাকে সালামের জবাব দিতে হয়। অতএব সঙ্গে সঙ্গে সালামের জবাব দিলেন। কিন্তু তিনি এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, মানুষের মত এক ক্ষুদ্র ও নগণ্য জীব আল্লাহ পাকের মত মহান সত্তা ও শানের অধিকারীকে কোন স্পর্ধায় সালাম করিতে পারে? ইহা কিছুতেই সম্ভব নয়, উচিতও নয়। মানুষের পক্ষে এ কাজ পরম ধৃষ্টতারই নামান্তর। মানুষ পারে শুধু আল্লাহর গুণ কীর্তন করিতে, আল্লাহর প্রতি সালাম বা শান্তি বর্ষণের কথা বলা যায় কোন অধিকারে। ইহা তো আল্লাহর শানেরও বিপরীতধর্মী কথা।

হযরত খাদীজা (রাঃ) তৎপ্রতি আগত আল্লাহর ও জিব্রাঈলের সালামের জবাব দিতে গিয়া বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা গুণে এই কথাগুলি চিন্তা করিয়া তিনি এক অতি বিচক্ষণতাসুলভ সালামের জবাব দিলেন, তিনি জবাব দিলেন এইভাবে। যথাঃ

ইন্নাল্লাহা হুওয়াস সালামু অ আলা জিব্রাঈলাস সালামু ও আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহিস সালামু।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা (স্বয়ং হইলেন) শান্তি। আমার সালাম পৌঁছুক জিব্রাঈলের উপরে এবং আপনার উপরে ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ! চিন্তা করুন, জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা কত বেশী থাকিলে এই ধরনের চিন্তা আসিতে পারে।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) তাঁহাকে এত বেশী ভালবাসিতেন যে, মৃত্যুর পরেও তাঁহার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর একদা তাঁহার ভগ্নি হালাহ হুযুরে পাকের (সঃ) সহিত সাক্ষাত করিতে আসেন। হালাহ ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে তাঁহার কণ্ঠস্বর হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কণ্ঠস্বরের সহিত হুবহু মিল ছিল। হুযুরে পাক (সঃ) হালার কণ্ঠের আওয়াজ শুনিয়া যেন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, হালাহ না কি? সাথে সাথে তিনি হযরত খাদীজার (রাঃ) কথাও স্মরণ করিলেন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মনে এ জিনিসটা ভাল লাগিল না। তিনি বলিয়া ফেলিলেন, আপনি এক মৃতা বৃদ্ধার কথা বার বার স্মরণ করেন। আল্লাহ তায়ালা কি আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান করেন নাই?

হযরত আয়েশার (রাঃ) কথায় হুযুরে পাক (সঃ) অত্যন্ত উষ্ণতার সাথে বলিলেন, খোদার কসম, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর চাইতে উত্তম স্ত্রী আমি লাভ করি নাই।

যখন দুনিয়ার লোক কাফির-মুশরিক ছিল, তখন খাদীজা (রাঃ)-ই আমার কথায় ঈমান আনিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। যখন সব লোক আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছিল, তখন একমাত্র সে-ই আমার কথায় বিশ্বাস আনিয়াছিল। সে তাহার সমস্ত ধন-সম্পদ পরম খুশীতে আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, আমি সেইদিন হইতে বুঝিতে পারিলাম, হুযুরে পাক (সঃ) হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে কখনই ভুলিতে পারেন না এবং ভুলিতে পারার কথাও নয়।

হযরত খাদীজার (রাঃ) পরপার যাত্রা

হযরত খাদীজা (রাঃ) সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রিয় সঙ্গিনী, সহধর্মিণী এবং সর্বাপেক্ষা হিতাকাঙ্খিনীরূপে কাল কাটাইয়া আল্লাহ পাকেরই ইচ্ছানুসারে মর্ত্য ধামের মায়া পরিত্যাগ করতঃ অমর ধামে যাত্রা করিলেন। হুযুরে পাক (সঃ)-এর নবুয়তের দশম বৎসরে হুযুর (সঃ)-এর জন্য সর্বাধিক শোকাবহ এই ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল। এই বৎসর হুযুরে পাক (সঃ)-এর জন্য আরও একটি মর্মন্তুদ বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহা হুযুর (সঃ)-এর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর ঘটনা। আবু তালিব ছিলেন হুযুরে পাক (সঃ)-এর আবাল্য প্রতিপালক, আশ্রয়দাতা, বিপদাপদে উদ্ধারকারী ও শত্রুকুলের মোকাবেলায় হুযুর (সঃ)-এর জন্য সুদৃঢ় ঢাল বা বর্ম স্বরূপ ব্যক্তি।

আবু তালিব যদিও প্রায় আশি বৎসর বায়ঃক্রম কাল চরম বার্দ্ধক্যে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, তবু তাঁহার এই চির বিদায় গ্রহণে স্বাভাবিকভাবেই তিনি শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অপার মহিমা বুঝা ভার। হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর এই অসহনীয় শোক-যাতনা দূর না হইতে তাঁহার উপর নামিয়া আসিল এ শোক অপেক্ষাও মারাত্মক শোকাবহ ঘটনা।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রিয়তমা হৃদয়সহচরী, একান্ত সেবিকা, সার্থক অভিভাবিকা স্বামী পদে মন-প্রাণ উৎসর্গকারিণী সঙ্গিনী সহধর্মিণী খাদীজা (রাঃ) আবু তালিবের মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পরেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। একেতো বয়ঃপ্রাপ্তা বৃদ্ধা তদুপরি রোগাক্রান্ত দুর্বল দেহে স্বামী সেবায় অক্ষমতা ও অপারগতা হেতু এ সময়ে তিনি কত যে মানসিক অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ সময় তিনি শুধু কাঁদিতেন আর আল্লাহর দরবারে এইরূপ ফরিয়াদ করিতেন, ওহে পরম করুণাময় প্রভু! তুমি আমাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার স্বামী তোমার প্রিয় নবীর (সঃ) সেবা করিবার সুযোগ দিলে না। হায় প্রভু ! আমি যে কিরূপ হতভাগিনী, আমার মত ভাগ্যহীনা নারী দ্বিতীয়টি কি কেহ দুনিয়ায় আছে?

হযরত খাদীজার (রাঃ) দুহিতা ফাতিমা (রাঃ) তখন বয়সে কচি হইলেও তাঁহার দুঃখিনী মাতার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিতেন। তাই তিনি সেই কচি বয়সেই মনে-প্রাণে পিতার সেবায় নিযুক্ত হইয়া ও রোগিনী মাতাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার মনের দুঃখ ও বেদনারাশিকে লাঘব করার চেষ্টা করিতেন। মৃত্যুপথের যাত্রী জননী

হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁহার কচি কন্যাটির এই অপূর্ব প্রয়াস দেখিয়া ভাব-বিহ্বল হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করিয়া আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিতেন। এ সময় তাঁহার দুই চোখের অশ্রুতে গণ্ডদ্বয় সিক্ত হইয়া যাইত।

হযরত খাদীজার (রাঃ) রোগের অবস্থা দিন দিনই অবনতির দিকে যাইতেছিল। তিনি তখন নিজের অবস্থা অনুভব করিয়া স্বামী হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট সারা জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাকে ক্ষমা প্রদান করতঃ তাঁহার জীবনের সৎকার্যাবলী ও তাঁহার নিজের এবং ইসলামের প্রতি অতুলনীয় খেদমত এবং দান-উৎসর্গের কথা উল্লেখ করতঃ সান্ত্বনা দিয়া পরলোকে তাঁহার সৌভাগ্যের শুভ সংবাদ শুনাইয়া দিলেন।

এক সময়ে হযরত খাদীজার (রাঃ) অবস্থা খুবই নাজুক হইয়া পড়িল। এ সময় হুযুর (সঃ) তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অত্যন্ত শান্ত মধুর কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন, প্রিয়তমা খাদীজা ! তোমার কি খুব কষ্ট হইতেছে? আল্লাহকে স্মরণ কর, আর তুমি নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ, তোমার এই কষ্টের প্রতিদানে আল্লাহর দরবারে তোমার জন্য অফুরন্ত কল্যাণ এবং মঙ্গল রহিয়াছে। জানিয়া রাখ, আখেরাতে তোমার সাক্ষাত এবং স্থান হইবে হযরত মরিয়ম, হযরত আসিয়া এবং হযরত হাজেরা ও হযরত সাহেরার সাথে। তুমি আমার পক্ষ হইতে তাহাদের কাছে সালাম পৌঁছাইয়া দিও।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর এইরূপ স্নিগ্ধ মধুর সান্ত্বনা বাণী শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহারই একখানা পবিত্র হাতের উপর মস্তক রাখিয়া দুনিয়ার সেরা ভাগ্যবতী মহিলা হযরত খাদীজা (রাঃ) অত্যন্ত শান্তির সাথে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ইহধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর সন্তান-সন্ততি

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্বে হযরত খাদীজা (রাঃ) পর পর তিনটি স্থানেই পরিণয়াবদ্ধ হইয়াছিলেন। ঐসব স্থানে তাঁহার যে সন্তান-সন্ততি হইয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) গৃহে হযরত খাদীজ (রাঃ) দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবাহের পরে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কোন সন্তানাদি হয় নাই। তারপর তাঁহাদের সর্বমোট দুইটি পুত্র এবং চারিটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে ঃ কাসেম ও আবদুল্লাহ এবং কন্যাদের নাম ছিল যথাক্রমে ঃ জয়নব, রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা জোহরা।

পুত্রদের মধ্যে আবদুল্লাহর তৈয়েব ও তাহের এই নাম দুইটিও রাখা হইয়াছিল।

জয়নব ছিলেন সব সন্তানের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠা। পরিণত বয়সে খালাত ভাই আবুল আসের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের বিবাহ হইয়াছিল তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সাথে।

হযরত ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন হুযুরে পাক (সঃ)-এর সর্বকনিষ্ঠা দুহিতা। গুণে, পুণ্যে ও মর্যাদায় তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠা। হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন। তিনি স্বীয় কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া

নিজেই বলিয়াছেন যে, আমার কন্যা ফাতিমা নারী জগতের মাথার মুকুট এবং বেহেশতী নারীদের সরদার হইবে।

হযরত ফাতিমার অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদার অভাব নাই। হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে দুনিয়ার সমগ্র নর-নারীদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয় ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

একদা কথায় কথায় হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং রাসূল-কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, মা ফাতিমা! আমি এ-জগতে আপনার একগাছি চুল হইয়াও যদি জন্ম লাভ করিতাম, তবে আমার জীবন সার্থক হইত।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সর্বাধিক প্রিয় পুরুষ ব্যক্তি ও তাঁহার স্নেহধন্য শেরে খোদা হযরত আলীর (রাঃ) সহিত হযরত ফাতিমার (রাঃ) বিবাহ হইয়াছিল।

মুসলিম জাহানের প্রাতঃস্মরণীয় দুই জগদ্বিখ্যাত ইমাম হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হোসাইন (রাঃ) হযরত আলী-ফাতিমার (রাঃ) সন্তান। হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর বংশ রক্ষা পাইয়াছে এই দুই ইমামেরই মাধ্যমে।

হযরত খাদীজার (রাঃ) পুত্রদ্বয় কাসেম ও আবদুল্লাহ অতি অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

হযরত সাওদা (রাঃ)

বংশ ও মাতৃ-পিতৃ পরিচয়

হযরত খাদীজাতুল কোবরার (রাঃ) ইন্তেকালের পরে হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রথম বিবাহ হযরত সাওদার (রাঃ) সাথে হয়, না হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে, এ ব্যাপারে কিছুটা দ্বিমত দেখা যায়। তবে বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক ও জীবনী লেখকের মতে হযরত সাওদা (রাঃ)-ই হুযুরে পাক (সঃ)-এর দ্বিতীয় সহধর্মিণী। হযরত আয়েশার (রাঃ) বিবাহ হইয়াছিল হযরত সাওদার (রাঃ) পরে। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকও এইকথা বলিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত সাওদা (রাঃ) এই দুইজনের মধ্যে হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত কাহার বিবাহ আগে হইয়াছিল, তাহা লইয়া দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মতভেদের কারণ হইল, এই দুইজনের বিবাহ এত অল্প সময়ের ব্যবধানে হইয়াছিল যে, কাহার বিবাহ আগে ও কাহারটা পরে হইয়াছে তাহাতে ভুল-ভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল এবং মূলে হইয়াছেও তাহাই। আবদুল্লাহ ইবনে আকীল বলেন যে, হযরত আয়েশার (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত শুভ পরিণয় হযরত সাওদার (রাঃ) আগে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশ্য একথা সত্য যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন উল্লেখযোগ্য জীবনীকার বা ইতিহাস রচয়িতা এই অভিমত ব্যক্ত করেন নাই। বরং উল্লেখযোগ্য প্রায়

সব লিখকেরই অভিমত এই যে, হযরত সাওদা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর দ্বিতীয়া পত্নী এবং আয়েশা (রাঃ) তৃতীয় স্থানীয়া।

হযরত সাওদা (রাঃ) পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলের দিক দিয়াই আরবের উচ্চ বংশজাত মহিলা ছিলেন। তাঁহার পিতৃ বংশধারা ছিল এইরূপ ঃ পিতার নাম ছিল জামআ কারশিয়া। তিনি একজন উচ্চ বংশীয় ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল কায়েস। কায়েসের পিতার নাম ছিল আবদে শামস। আবদে শামসের পিতার নাম ছিল আবদুদ। আবদুদের পিতার নাম ছিল নসর। নসরের পিতার নাম ছিল মালেক। মালেকের পিতার নাম ছিল হসল। হসল-এর পিতার নাম ছিল আমের এবং আমেরের পিতার নাম ছিল লবিদ।

হযরত সাওদার (রাঃ) জননীও উচ্চ বংশোদ্ভূত মহিলা ছিলেন। ঐ বংশের নাম কোরায়েশ বংশের এক বিশিষ্ট শাখা বনী নাজ্জার। জননীর নাম ছিল সামুস বা সুসুম। তাহার পিতার নাম কায়েস। কায়েসের পিতার নাম ছিল সায়েদ। সায়েদের পিতার নাম আমর। আমরের পিতার নাম লবিদ। লবিদের পিতার নাম ফরাশ। ফরাশের পিতার নাম আমের। আমেরের পিতার নাম গানাম। গানামের পিতার নাম আদ এবং আদের পিতার নাম ছিল নাজ্জার।

প্রথম বিবাহ

সুযোগ্য ও অভিজাত বংশীয় পিতা-মাতার কন্যা হযরত সাওদা (রাঃ) বাল্যাবধি রূপে-গুণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যৌবনে সে রূপ-গুণ আরও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং একান্ত স্বাভাবিক কারণেই বহু স্থান হইতে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। কিন্তু হযরত সাওদার (রাঃ) জনক-জননী উভয়েই বংশগত গৌরবের কারণে যথেষ্ট আত্মাভিমানী ছিলেন। তাই বিবাহ প্রস্তাবগুলি তাহাদের আভিজাত্যের মাপ-কাঠিতে একে একে নাকচ হইয়া গেল। বংশীয় মর্যাদার অহমিকা সে যুগে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত সাওদার (রাঃ) বিবাহ অন্য কোথাও আর অনুষ্ঠিত হইল না। বরং তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র সাকরান ইবনে ইমরানের সহিত সংঘটিত হইল। পাত্রটি যোগ্যতায়, গুণে ও মর্যাদায় সবদিক দিয়াই সাওদার (রাঃ) জন্য উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। বংশের দিক দিয়া তো কোন অসুবিধাই ছিল না। যেহেতু পাত্র ও পাত্রী উভয়েই এক বংশজাত ছিলেন। [কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, পাত্র সাকরান হযরত সাওদার (রাঃ) পিতৃব্য-পুত্র ছিলেন না বরং তাঁহার পিতা জামআ কারশিয়ার পিতৃব্য-পুত্র ছিলেন।]

নব দম্পতির দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন বেশ সুখে-শান্তিতেই অতিবাহিত হইতে থাকে। কিছুদিন পরে তাহাদের একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তাঁহার নাম রাখা হইল আবদুর রহমান।

ইতোমধ্যে মক্কার সেরা বংশ কোরায়েশ সন্তান হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপরে আল্লাহ প্রদত্ত মহা নিয়ামত অর্পিত হয় এবং তিনি দ্বীনি তাওহীদ প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন। সে মতে তিনি আল্লাহর এই আদেশ পালনে মনোনিবেশ করেন। ইহাতে সাওদা (রাঃ) দম্পতি প্রথম দিকেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর দ্বীনি দাওয়াত কবুল করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

অতঃপর অচিরেই নও-মুসলিমদিগের উপরে মক্কার কোরায়েশদের অত্যাচার-অবিচার শুরু হইয়া যায়। তখন বাধ্য হইয়া কিছুসংখ্যক মুসলিম আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া চলিয়া যান। সাওদা (রাঃ) দম্পতি কিন্তু মক্কায়ই থাকিয়া যান। কোরায়েশদের জুলুম-অত্যাচার যখন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন নিরাপত্তার প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া হযরত সাওদা (রাঃ)-ও পুত্র আবদুর রহমানসহ আবিসিনিয়ায় গমন করেন। সেখানে তাঁহারা একাধারে কয়েক বৎসর কাটাইয়া দেন। তারপর তাঁহারা আবার জন্মভূমি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত সাওদার (রাঃ) পুত্র আবদুর রহমানও পিতা-মাতার সহিত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইয়াছিলেন। যুবা বয়সে তিনি জালুলার যুদ্ধে শরীক হইয়া শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন।

স্বপ্নে সৌভাগ্যের আভাস

হযরত সাওদার (রাঃ) পুত্র আবদুর রহমান ধর্মযুদ্ধে শাহাদত বরণ করার কিছুদিন পূর্বে হযরত সাওদা (রাঃ) একটি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নযোগে তাঁহাকে হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে শুভ পরিণয়াবদ্ধ হইবার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। এই সম্পর্কে ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, হযরত সাওদা (রাঃ) তাঁহার প্রথম স্বামী সাকরানের জীবিতাবস্থায় এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নটি ছিল এইরূপ ঃ

হুযুরে পাক (সঃ) হযরত সাওদার (রাঃ) নিকটবর্তী হইয়া স্বীয় পা দুইখানা তাঁহার স্কন্ধে উঠাইয়া দিলেন। প্রত্যুষে সাওদা (রাঃ) এই স্বপ্নটি স্বীয় স্বামীর নিকট বর্ণনা করিলেন। স্বামী সাকরান (রাঃ) স্বপ্ন বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, যদি তুমি সত্যিই এই স্বপ্ন দেখিয়া থাক, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই আমার মৃত্যু হইবে এবং হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে তোমার বিবাহ ঘটিবে।

ইহার কয়েকদিন পরে হযরত সাওদা (রাঃ) আরও একটি স্বপ্ন দেখিলেন। তাহা এইরূপ ঃ হযরত সাওদা (রাঃ) বালিশে মস্তক রাখিয়া শায়িত আছেন। আকাশে নবচন্দ্রের উদয় ঘটিতেছে। এমন সময় হঠাৎ চন্দ্রটি স্থানচ্যুত হইয়া তাহারই উপর আসিয়া পড়িল। ভোরে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। স্বামী শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, তোমার এই স্বপ্নেও বুঝা যাইতেছে, সত্যই আমি অতি শীঘ্র পরলোক গমন করিব এবং আমার পরে তোমার আবার বিবাহ হইবে। সাকরানের এই স্বপ্ন তাবীর পুরাপুরিভাবেই সফল হইয়াছিল।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর সাথে হযরত সাওদার (রাঃ) শুভ পরিণয়

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত খাদীজার (রাঃ) পরলোক গমনে একদিকে যেমন শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অন্যদিকে হযরত খাদীজার (রাঃ) সন্তান-সন্ততি ও ঘর-সংসারের দায়িত্ব তাঁহার নিজের স্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন দ্বীনে তাওহীদ প্রচারের বিরাট ও মহান দায়িত্ব স্কন্ধে চাপাইয়া। তাঁহার সে কাজ কতই ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। সংসার ও

পরিবার-পরিজনের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে তিনি দুনিয়ায় আসেন নাই। সুতরাং তিনি বর্তমান অবস্থায় একেবারে অস্থির হইয়া গেলেন।

খাওলাহ বিনতে হাকীম নাম্নী হুযুরে পাক (সঃ)-এর এক অতিশয় বুদ্ধিমতী খালা ছিলেন। তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর বর্তমান অবস্থা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছিলেন এবং তাঁহার সমস্যাসঙ্কুল অবস্থার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীলাও ছিলেন।

পক্ষান্তরে, হযরত সাওদা (রাঃ) নাম্নী মহিলাটির কিছুদিন পূর্বে স্বামীহারা হইবার ঘটনাটিও তিনি জানিতেন। সাওদার (রাঃ) সাথে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও ছিল। সাওদার (রাঃ) পারিবারিক অবস্থা এবং অসহায়ত্বের খবরও তাঁহার অজানা ছিল না। তিনি তখন মনে মনে কোন একটি বিষয় চিন্তা করিয়া একদা ভাগিনেয় হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি, আপনার যারপর নাই ক্লেশ হইতেছে। এই মুহূর্তে আপনার একটি অত্যন্ত আপন লোকের প্রয়োজন, যে আপনার সন্তান-সন্ততি ও সংসারের দায়িত্ব স্কন্ধে তুলিয়া লইতে পারে। তাহা হইলে আপনি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেন। তাবলীগে দ্বীনের কাজে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মনে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন।

হুযুরে পাক (সঃ) বলিলেন খালা ! আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন। আগেতো গৃহের যাবতীয় কাজ-কর্ম, সন্তানদের দেখাশুনা করা সবই খাদীজার (রাঃ) দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু এখন তো আর সে নাই। তাই সত্যিই সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর কথা শুনিয়া বিবি খাওলাহ (রাঃ) এবার তাঁহার আগমনের আসল উদ্দেশ্য খোলাখুলিভাবেই ব্যক্ত করিলেন।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-ও তাহাতে অমত করিলেন না। অতঃপর খাওলাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ)-ই ইঙ্গিতক্রমে সাওদার (রাঃ) পিতার নিকট হাজির হইলেন এবং তৎকালীন প্রথা অনুসারে তাহাকে সালাম জানাইয়া হুযুরে পাক (সঃ)-এর তরফ হইতে হযরত সাওদার (রাঃ) বিবাহ প্রস্তাব পেশ করিলেন।

হযরত সাওদার (রাঃ) পিতা জামআ কিন্তু তখনও মুসলমান হন নাই। সুতরাং এই প্রস্তাবে তিনি রাজী না হওয়ারই কথা। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নৈতিক চরিত্রে তখন সমগ্র আরববাসীই মুগ্ধ ছিল। তাঁহার ধর্ম তাহারা কবুল করুক, তাঁহার সহিত আত্মীয়তায় আবদ্ধ হইবার আকাঙ্খা ছিল সকলের মনে। তবে তিনি স্বীয় মনের সে কথা প্রকাশ না করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর চরিত্র, বংশমর্যাদা তো আমাদের সবার চাইতে উন্নত। তবু সাওদার কাছে বিষয়টি একটু আলোচনা করিয়া দেখা দরকার মনে করি।

হযরত সাওদা (রাঃ) ছিলেন মুসলিম রমণী। তিনি নিজেকে হুযুরে পাক (সঃ)-এর পবিত্র চরণে সমর্পণ করিতে পারিলে জীবন সার্থক হইবে। কিন্তু এমন সৌভাগ্য যে তাঁহার কখনও হইবে তাহাতো তিনি কোনদিন ধারণাও করিতে পারেন নাই। আকাশে চাঁদ হাতের মুঠায় পাওয়া সাতজনমের পুণ্যেওতো সম্ভব হয় না। সুতরাং স্বীয় জনকের মুখে এইরূপ প্রস্তাবের কথা শুনিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। আকাশের চাঁদ সত্যিই যেন তিনি হাতের মুঠায় লাভ করিলেন। সেই মুহূর্তে হঠাৎ তাঁহার পূর্বেকার সেই স্বপ্ন দর্শন এবং মৃত স্বামী সাকরান কর্তৃক তাবীর বর্ণনার কথা স্মরণে আসিয়া গেল।

তিনি সানন্দে এই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার পিতাও ইহাতে খুবই খুশী হইলেন।

বিবাহের তারিখ নির্ধারিত হইল এবং নির্দিষ্ট তারিখে হুযুরে পাক (সঃ) সাওদার (রাঃ) গৃহে উপস্থিত হইলেন। সাওদার পিতা নিজেই চারিশত টাকা দেন মোহরের বিনিময়ে স্বীয় কন্যার সাথে হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিবাহ পড়াইয়া দিলেন।

কোন এক বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত সাওদার ভ্রাতা অমুসলিম ছিলেন। তিনি ভগ্নির বিবাহকালে দেশের বাহিরে ছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করতঃ খবর শুনিয়া ভীষণ তোলপাড় শুরু করেন। পরে অবশ্য এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন নিজের এই ব্যবহারের জন্য খুবই লজ্জা অনুভব করেন এবং নিজেকে ধিক্কার প্রদান করেন।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে হযরত সাওদার (রাঃ) বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল হিজরী-পূর্ব তৃতীয় সনে। ইহার মাত্র পনের দিন পরে হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিবি হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিবাহকালে হযরত সাওদার (রাঃ) বয়স ছিল পঞ্চান্ন বৎসর। যেমন বৃদ্ধা, তেমন তিনি রুগ্নাও ছিলেন। তাঁহার বিবাহের প্রায় সাথে সাথে যদিও হযরত আয়েশার (রাঃ) সহিত হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন তখন একান্ত অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিশোরী। সুতরাং বিবাহের পরেও প্রায় পাঁচ বৎসর বর্ণনান্তরে তিন বৎসর হযরত আয়েশা (রাঃ) পিতৃগৃহে কাটাইয়াছিলেন।

হযরত সাওদা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াই তাঁহার পারিবারিক যাবতীয় দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর গৃহে আগমন না করা পর্যন্ত একমাত্র হযরত সাওদা (রাঃ)-ই হুযুরে পাক (সঃ)-এর সঙ্গিনী এবং গৃহিণী ছিলেন।

সতিনী আয়েশার (রাঃ) সাথে সাওদার (রাঃ) আচরণ

সপত্নীদের পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক খুব বড় একটা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেহেতু সপত্নীদের প্রত্যেকেই মনে করে যে, অন্য সপত্নী তাহার স্বামীর উপর একচ্ছত্র অধিকারে ভাগ বসাইয়াছে, আর মূলে ঘটনাও তো তাহাই। নারীগণ অনেক কিছু সহ্য করিতে পারে, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে কিন্তু কোন নারীই সরল প্রাণে স্বামীত্বের দাবীতে অন্য নারীর ভাগ বসানোটাকে স্বীকার করিয়া নিতে বা সহ্য করিতে পারে না।

কিন্তু হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর গৃহিণীদের তথা উম্মাহাতুল মুমিনীনদের অবস্থা আমরা উহার বিপরীত দেখিতে পাই। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক কি মধুর ছিল, হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে হযরত সাওদার (রাঃ) আচরণ ও সম্পর্কের আলোচনা করিলেই তাহা জানা যাইবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর গৃহে তাঁহার সহধর্মিণীরূপে আগমন করিলেন, তখন তিনি একেবারেই কাজ-কর্মে অনভিজ্ঞা বালিকাটি মাত্র ছিলেন। তখন হযরত সাওদা (রাঃ) ইচ্ছা করিলেই তাঁহার অনভিজ্ঞতা ও দোষত্রুটির অজুহাতে তাঁহাকে অপদস্থ ও স্বামী রাসূলুল্লাহর (সঃ) অপ্রিয় করিয়া তোলার জন্য চেষ্টা চালাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করাতো দূরের কথা, বরং তিনি হযরত

আয়েশার (রাঃ) জ্যেষ্ঠভগ্নী কিংবা জননীর মত পরম স্নেহ ও যত্নের সাথে পারিবারিক যাবতীয় কাজ-কর্ম অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে শিখাইয়া-বুঝাইয়া তাঁহাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পক্ষান্তরে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও যারপর নাই তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেই বলেন যে, সত্যি বলিতে কি, আমার মন সদা-সর্বদা হযরত সাওদার (রাঃ) ভিতরেই যেন পড়িয়া থাকিত।

দুইজন সপত্নীর মধ্যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল ঠিকই। কিন্তু সাথে সাথে দুইজনের মধ্যে বয়সের বহু ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও সম্পর্কের মমতার কারণে হাস্যরসও যথেষ্ট হইত।

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর জন্য হারিয়া পাকাইয়া আনিলেন। অতঃপর দুইজনেই এক বরতনে উহা খাইতে বসিলেন। এমন সময় হযরত সাওদা (রাঃ) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে তাঁহাদের সাথে খাইতে বসিতে বলিলেন। কিন্তু সাওদা (রাঃ) রাজী হইলেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) পুনরায় বলিলেন। সাওদা (রাঃ) তবুও রাজী হইলেন না। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) কৃত্রিম রোষে বলিলেন, না বসিলে আপনার মুখে কিন্তু হারিয়া মাখাইয়া দিব। এইকথা বলিয়া সত্যিই তিনি তাঁহার মুখে উহা মাখাইয়া দিলেন। জবাবে সাওদা (রাঃ)-ও তাঁহার মুখে হারিয়া মাখাইয়া দিলেন। তখন পুনরায় তাঁহার মুখে হারিয়া মাখাইয়া দিতে উদ্যোগী হইলে হুযুরে পাক (সঃ) বলিলেন, আয়েশা ! সাওদা বয়স্কা কমজোর মহিলা, সে তোমার সহিত পারিয়া উঠিবে কেন? তুমি বিরত হও।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর কথার জবাবে সাওদা (রাঃ) বলিলেন, না, থাক হয় নাই তো কিছুই। আয়েশা (রাঃ) বালিকা মাত্র, উহার কিছুটা জ্বালা-যন্ত্রণাতো আমাকে সহিতেই হইবে।

স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর মত অতুলনীয় স্বামী রত্ন যে মহিলাগণ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা সেই রত্নের পরশ ও সাহচর্য প্রত্যেকেই সপত্নীদের অপেক্ষা একটু বেশী লাভ করার জন্য মনে মনে আকাঙ্খা পোষণ করা খুবই স্বাভাবিক। মূলতঃ করিতেনও তাহা। কিন্তু ন্যায় নিষ্ঠার আদর্শ পুরুষ মহানবী (সঃ) তাঁহার আদর্শকে সর্বোতভাবে অম্লান রাখিতেন। তিনি স্বীয় পত্নীদের মধ্যে কাহারও উপর সামান্য মাত্র অবিচার করিতেন না। তবে হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি যে তাঁহার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল তাহা অন্য পত্নীগণ সকলেই জানিতেন এবং বুঝিতেন। তাহার কতগুলি বাস্তব কারণও ছিল। অবশ্য উহার দ্বারা কাহারও কোনরূপ স্বার্থহানীজনক কিছু ঘটিত না। তাই কেহ এই ব্যাপারে নবীর (সঃ) উপর অসন্তুষ্টও ছিলেন না।

হযরত সাওদা (রাঃ) নবী-পত্নীগণের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠা এবং প্রৌঢ়া রমণী ছিলেন আর তিনি নিজের অবস্থার প্রতি সজাগও ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, তাঁহার মত প্রায় বৃদ্ধা, রুগ্না ও অযোগ্য রমণীকে যে নবী (সঃ) স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই তো তাঁহার জন্য যেন কত জনমের পুণ্যের ফল। অতএব ইহা অপেক্ষা তাহার

আর বেশী কি দরকার? উপরন্তু হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ এত বেশী ছিল যে, তিনি স্বামীর নিকট হইতে স্বীয় প্রাপ্য স্বেচ্ছায় হযরত আয়েশাকে অত্যন্ত খুশী মনে প্রদান করিলেন। সবাই একথা জানে যে, নারীদের মধ্যে ত্যাগের আদর্শ যতই থাকুক, এক্ষেত্রে তাহাদের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না। কিন্তু হযরত সাওদা (রাঃ) সেই দৃষ্টান্তই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

স্বামীর অনুবর্তিতায় নিষ্ঠার পরিচয়

হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রত্যেক পত্নীই স্বামী রাসূলুল্লাহর (সঃ) অনুবর্তিতায় একনিষ্ঠ ছিলেন ইহা চরম সত্য। কিন্তু হযরত সাওদা (রাঃ) যেভাবে আমরণ হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রতিটি উপদেশের প্রতি দৃঢ় অবিচল ছিলেন, তাহার নজীর সম্ভবতঃ দুনিয়ার অন্য কোথাও নাই। হযরত সাওদার (রাঃ) চারিত্রিক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই দিকটিতে ফুটিয়াছে সর্বাধিকরূপে।

বিদায় হজ্জের ভাষণ দানকালে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) স্বীয় পত্নীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, আমার অবর্তমানে তোমরা গৃহে অবস্থান করিও। হযরত সাওদা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর এই আদেশটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। হুযুরে পাক (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরে আর কোনও দিন তিনি হজ্জ উপলক্ষেও গৃহের বাহির হন নাই। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি জবাব দিতেন, হজ্জ ও ওমরা দুইটিই তো আদায় করিয়াছি, এখন আল্লাহর মর্জিতে আমি গৃহেই অবস্থান করিব।

হাল যমানার মহিলাগণ একটু ভাবিয়া দেখুন, স্বামীর নির্দেশ তাঁহার মৃত্যুর পরেও পালন করার কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন হযরত সাওদা (রাঃ)। আর এই যুগে কি চলিতেছে? স্বামীর মৃত্যুর পরের কথাটা না হয় তুলিয়াই রাখিলাম। স্বামী বর্তমান থাকিতে তাহার সম্মুখেই তাহার নির্দেশ অমান্য করিয়া স্ত্রী বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী, আত্মীয়-অনাত্মীয়দের বাড়ী, তাহাছাড়া মার্কেট, পার্ক, ছবি-সিনেমার হল প্রভৃতিতে অবাধে চলিয়া যায়। ইহা কত বড় অন্যায়, কত বড় স্পর্দ্ধা তাহা একটু ভাবিয়া দেখুন। এই জাতীয় স্বাধীনতার ফল সমাজে কতটা মঙ্গল এবং কতটা অমঙ্গল ডাকিয়া আনিতেছে, তাহাও একটু ধীরস্থিরভাবে বিচার করুন।

হযরত সাওদার (রাঃ) বৈশিষ্ট্য

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী সহধর্মিণীদের মধ্যে হযরত সাওদার (রাঃ) এমন কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা অন্য কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই। তাঁহার দৈহিক আকৃতিও ছিল অনন্য। তিনি দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট ও স্থূলাঙ্গী ছিলেন। অন্য কেহই তেমন ছিলেন না। তাঁহার চেহারায় এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, একবার দেখিলে তাহা আর ভুলা যাইত না। তাঁহার চরিত্র ছিল আয়নার মত নির্মল। হৃদয় ও প্রকৃতি ছিল একদিকে ননীর মত স্নিগ্ধ কোমল অন্যদিকে বজ্রের মত কঠোর। তাঁহার কোমল ব্যবহারে সকলেই তাঁহার প্রতি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট ছিল। আবার যদি কোন কারণবশতঃ তিনি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইতেন তবে সবাই তাঁহাকে ভয় করিত। সারল্য ও

পরদুঃখকাতরতায় তাঁহার মত রমণী বিরল। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এই উক্তির সত্যতা ও বাস্তবতা হযরত সাওদার (রাঃ) চরিত্রে ও আচরণে এখানে পুরাপুরিভাবে প্রমাণিত হইল।

তাঁহার চরিত্রের কঠোরতা ও কোমলতার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ

ইসলামের একান্ত প্রাথমিক পর্যায়। তাই আরবের নও-মুসলিমদের ভিতরে প্রাক-ইসলামিক যুগের কিছু কিছু রীতি-নীতি ও চালন-চলন তখনও প্রচলিত। ঠিক এমনি অবস্থায় একদা রাত্রে হযরত সাওদা (রাঃ) প্রকৃতিগত প্রয়োজনের তাগীদে একাকী নির্জন প্রান্তর অভিমুখে চলিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হইলে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে সাওদা (রাঃ) ! কোথায় চলিয়াছেন ? আমি যে আপনাকে দেখিয়া ফেলিলাম।

হযরত সাওদা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই অবান্তর প্রশ্নে হঠাৎ চটিয়া গেলেন। তাঁহার মোম সদৃশ হৃদয় মধ্যে যেন সহসা অগ্নি সংযোগ ঘটিল। তিনি হইলেন নবী সহধর্মিণী, তাঁহার যে কোন ব্যাপারে ওমর প্রশ্ন করিতে কে ? তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি কড়া বাক্য প্রয়োগ করিলেন। ওমর (রাঃ)-ও ছিলেন কঠোর প্রকৃতির লোক। বিশেষতঃ তিনি নবী-পত্নীদিগের বাহিরে যাতায়াত পছন্দ করিতেন না। তাই তিনিও নিরুত্তর থাকিলেন না। দুই একটি কড়া কথা তিনিও বলিলেন। ফলে হযরত সাওদার (রাঃ) ক্রোধের মাত্রা আরও বাড়িল। তিনি সেই রাত্রেই গৃহে ফিরিয়া হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে কঠোর অভিযোগ পেশ করিলেন।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত সাওদার (রাঃ) দ্বিমুখী প্রকৃতির কথা ভাল করিয়াই জানিতেন। অতএব তিনি তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া-শুনাইয়া শান্ত করিলেন। পরদিন হুযুরে পাক (সঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ) ! মাননীয় উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের এভাবে বাহিরে যাতায়াত করা আমার নিকট ভারী বেমানান লাগিতেছে। তাঁহাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করা অতি আবশ্যক।

হুযুরে পাক (সঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথা শুনিয়া বলিলেন, তোমার কথা অবশ্য খুবই যুক্তিপূর্ণ কিন্তু যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করিতে হয়।

সরলমনা হযরত সাওদা (রাঃ)

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, হযরত সাওদা (রাঃ) একদিকে ছিলেন কঠোর মনের অধিকারিণী, অন্যদিকে আবার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—অত্যন্ত সরল এবং ননীর মত কোমল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট। এখানে তাঁহার অত্যধিক সরলতার একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

হযরত সাওদার (রাঃ) দাজ্জাল ভীতি ছিল অত্যন্ত প্রবল। দাজ্জালের ফেতনায় পতিত হইলে ঈমান রক্ষা করা সম্ভব হইবে কিনা ইহাই ছিল ভীতির কারণ। তাঁহার মনের এই অবস্থার কথা সকলেই জানিতেন। সপত্নীগণ জানিতেন আরও বেশী করিয়া। একদা হুযুরে পাক (সঃ)-এর দুই বিবি হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ) পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এমন সময় হযরত সাওদা (রাঃ) তাহাদের কাছে তাশরীফ আনিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন ঃ

খবর কি শুনিয়াছেন বুজি ! খবর তো মারাত্মক।

সাওদা (রাঃ) বলিলেন, কি খবর বল তো। আমি তো শুনি নাই কোন কিছু। তাঁহারা বলিলেন, হায়, হায় বলেন কি আপনি? দাজ্জালের আগমন ঘটিয়াছে।

সারল্যের মহিমায় প্রোজ্জ্বল হযরত সাওদা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসার (রাঃ) পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া তিনি তাঁহাদের কথা সত্য ভাবিয়া ভয়ে এত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, সেখানে অবস্থান করা নিরাপদ নয় মনে করতঃ দ্রুতপদে একটি গোপন কক্ষে ঢুকিয়া পড়িলেন। একটু পরেই হযরত রাসূলে করীম (সঃ) আগমন করিলে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) হাসিতে হাসিতে হযরত সাওদা (রাঃ)-কে নিয়া তাঁহাদের এই পরিহাসের কথা তাঁহার নিকট বলিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) এ ঘটনা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কক্ষটির দরজায় গিয়া হযরত সাওদা (রাঃ)-কে ডাকিয়া বলিলেন, সাওদা ! তুমি বাহির হইয়া আস, কোন ভয় নাই। দাজ্জাল এখনও আগমন করে নাই।

[উল্লখিত ঘটনাটি অনেকেরই মতে একটি দুর্বল বর্ণনার মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছে। তাই ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে।]

হযরত সাওদা (রাঃ) নিজে এভাবে পরিহাসের শিকার হইলেও নিজেও কিন্তু হাসি-কৌতুক কম জানিতেন না। কখনও কখনও তাঁহার কৌতুকবাক্য শুনিয়া খোদ হযরত রাসূলে করীম (সঃ) পর্যন্ত হাসিয়া উঠিতেন।

একদিন তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-কে বলিলেন, গতকাল আপনার সাথে আমি নামাযে শরীক হইয়াছিলাম। কিন্তু আপনি রুকুতে গিয়া এমনভাবেই নুইয়া রহিলেন যে, আর মাথা তুলিবার কোন লক্ষণই নাই। এদিকে ঝুঁকিয়া থাকিতে থাকিতে আমার কিন্তু জান শেষ; এমনকি নাসিকা হইতে রক্তপ্রবাহিত হওয়ার উপক্রম হইল। তখন আর কি করিব, নাসিকা চাপিয়া ধরিয়া কোনক্রমে থাকিয়া গেলাম। হযরত সাওদার (রাঃ) বর্ণনার ভঙ্গি এবং মিষ্টি রসিকতায় হুযুরে পাক (সঃ) মুচকি হাসিয়া দিলেন।

দানশীলতা

হযরত সাওদার (রাঃ) বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে দানশীলতাও ছিল অন্যতম। এইদিক দিয়া হযরত আয়েশা ও হযরত জয়নব (রাঃ)-এর তুলনায় কোন অংশে কম ছিলেন না। মানুষের অভাবজনিত কষ্ট দেখিলে তাঁহার কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। তাঁহার দুয়ারে কোনদিন কোন ভিক্ষুক-মুসাফির আসিয়া খালি হাতে ফিরে নাই। জনশ্রুতি এইরূপ যে, তাঁহার একটি নিজস্ব তহবিল ছিল। সেই তহবিল হইতে দান-দক্ষিণা করতঃ তিনি দীন-দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতেন। এইভাবে অনবরত দান করিবার ফলে এক সময় তাঁহার সে তহবিল শূন্য হইয়া গেল। সে সময় হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের আমল।

খলীফা ওমর (রাঃ) জানিতে পারিলেন যে, হযরত সাওদা (রাঃ) আর্থিক অনটনের মধ্যে কাল যাপন করিতেছেন। তখন তিনি তাঁহার সাহায্যস্বরূপ জনৈক বাহক মারফত এক থলি দেরহাম তাহার সমীপে পাঠাইয়া দিলেন। থলিটি পাইয়া তিনি উহা খুলিলেন এবং উহার ভিতরে দেরহামগুলি দেখিয়া বলিলেন, দেখিতেছি, খেজুরের থলিতে ভরিয়া দেরহামও প্রেরণ করা যায়। এই বলিয়া তিনি দেরহামগুলি থলি হইতে বাহির করিয়া সাথে সাথে উহা সবই গরীব-দুঃখীদের মাঝে বিলাইয়া দিলেন। নিজের জন্য একটি মাত্র দেরহামও রাখিলেন না।

হযরত সাওদার (রাঃ) মদীনায় হিজরত

মক্কা শরীফ হইতে মুসলিম নর-নারীগণ কাফির-কোরায়েশদের অত্যাচারে সকলেই মদীনা শরীফ হিজরত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ কিছু কিছু করিয়া সাহাবীগণ মদীনায় পৌঁছার পর হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-সহ মদীনা হিজরত করেন। তখন পুরুষদের মধ্যে কেবল হযরত আলী (রাঃ) ও নারীদের মধ্যে হুযুরে পাক (সঃ)-এর গৃহের মহিলাগণ এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পরিবার-পরিজনগণ মক্কায় থাকিয়া যান। হুযুরে পাক (সঃ)-এর গৃহের মহিলাদের মধ্যে তখন হযরত সাওদা (রাঃ) এবং হযরত ফাতিমা (রাঃ) প্রমুখই ছিলেন।

হুযুরে পাক মদীনায় গিয়া স্বীয় পরিজনদের বাসোপযোগী গৃহের ব্যবস্থা করার পর তাহাদিগকে মদীনায় নিয়া যাওয়ার জন্য যায়েদ ইবনে হারেসা এবং অপর এক ব্যক্তিকে মক্কা প্রেরণ করেন। হযরত সাওদা (রাঃ) ও হযরত ফাতিমা (রাঃ) প্রমুখ সম্মানিতা মহিলাবৃন্দ এ সময়ই মদীনা হিজরত করেন।

হজ্জের সফরে হুযুর (সঃ)-এর সঙ্গিনী

দশম হিজরী সনে হুযুরে পাক (সঃ) যখন হজ্জ আদায় করার জন্য মক্কা যাত্রা করেন, তখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রাঃ)-কে তাঁহার সঙ্গিনী করিয়াছিলেন। তবে তিনি অত্যন্ত স্থূলাঙ্গিনী ও রুগ্না হওয়ায় সফরে চলাফিরা করিতে তাঁহার খুবই কষ্ট হইতেছিল। হুযুরে পাক (সঃ) তাহা লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য লোকদের মুজদালেফা ত্যাগের পূর্বেই হযরত সাওদা (রাঃ)-কে গৃহে রওয়ানা করার অনুমতি দিয়াছিলেন।

হাদীস রাওয়ায়েত

হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ)-ই অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ অন্যান্য বিবিগণ প্রত্যেকেই খুব কম সংখ্যক হাদীস রাওয়ায়েত করিয়াছেন। হুযুর (সঃ)-এর প্রথম সহধর্মিণী হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ)-তো হাদীস মোটেই বর্ণনা করেন নাই। যেহেতু তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর জীবদ্দশাতে ইন্তেকাল করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার হাদীস বর্ণনা করার কোন প্রশ্নই আসে না। হযরত সাওদা (রাঃ) মাত্র পাঁচখানা হাদীস রাওয়ায়েত করিয়াছেন।

তাঁহার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে একটি হাদীস বোখারী শরীফে স্থান লাভ করিয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) হযরত ইয়াহইয়া (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ তাঁহার রাওয়ায়েতসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত সাওদার (রাঃ) রুচি-বৈশিষ্ট্য

হযরত সাওদার (রাঃ) চরিত্রের একটি বিশেষ দিক ছিল রুচির সৌখিনতা। তিনি সুন্দর ফুল অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এমনকি তিনি নিজে একটি ফুলের বাগান পর্যন্ত করিয়াছিলেন। দেশ-বিদেশ হইতে নানাবিধ ফুলের বীজ ও চারা আনাইয়া তিনি ফুল গাছের সংখ্যা বাড়াইতেন। ইহাতে তাঁহার দুই রকমের লাভ হইত। একদিকে তাঁহার সখের তৃপ্তি হইত। অন্যদিকে ফুল ও ফুলের চারা বিক্রয় করিয়া তিনি বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করিতেন। অবশ্য এই অর্থ তিনি ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় না করিয়া দীন-দুঃখীকে দান করিতেন।

পরলোক গমন

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর ওফাতের পরেও হযরত সাওদা (রাঃ) বেশ কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। এমনকি হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কাল পর্যন্ত তাঁহার জীবিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত সাওদার (রাঃ) মৃত্যু খুব সকালেই হইবে বলিয়া উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের ধরণা ছিল। কেননা একদা তাঁহারা সকলে মিলিয়া হুযুরে পাক (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ) ! বলুন, আমাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করিবে? হুযুর (সঃ) জবাব দিলেন, যাহার হস্ত সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সে-ই সকলের আগে ইহধাম ত্যাগ করিবে। ইহা শুনিয়া তাঁহারা সবাই একে অপরের হাত মাপিয়া দেখিতে লাগিলেন। হযরত সাওদা (রাঃ) যেহেতু সর্বাপেক্ষা দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন, তাই তাঁহার হাতও দীর্ঘ ছিল।

হাত মাপিয়া দেখার পর সকলেই মনে করিলেন, হযরত সাওদা (রাঃ)-ই সকলের আগে প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, হযরত জয়নব (রাঃ) সকলের আগে ইন্তেকাল করিলেন, তখন তাঁহারা অনুধাবন করিতে পারিলেন যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) দীর্ঘহাত দ্বারা উদারতা ও অধিক দানশীলতার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দৈহিক ও দীর্ঘতার কথা বলেন নাই।

হযরত সাওদার (রাঃ) ইন্তেকাল কখন হইয়াছিল, সে বিষয়ে বর্ণনাকারীদের মধ্যে কিছুটা দ্বিমত দেখা যায়। ওয়াকিদী বলেন, ৫৪ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে হিজরী বাইশ সনের শাওয়াল মাসে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য। এমনকি ইমাম বোখারী (রহঃ), জাহরী, খাজরাজী প্রমুখ মনীষীগণের অভিমতও ইহাই।

হযরত আয়েশা (রাঃ)

বংশ ও জনক-জননী

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর তৃতীয় স্থানীয়া সহধর্মিণী ছিলেন হযরত আয়েশা (রাঃ)। যাহারা তাঁহাকে দ্বিতীয় স্থানীয়া বলেন, তাহাদের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নহে। প্রকৃত ঘটনা হইল, হযরত সাওদা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন এবং তাঁহার পরে হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে হুযুর (সঃ)-এর-পরিণয় হইয়াছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) মক্কার খ্যাতনামা কোরায়েশ বংশীয় এক প্রসিদ্ধ শাখা তাইমিয়া খান্দানের বংশোদ্ভূতা মহিলা ছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পিতা ছিলেন উল্লিখিত কোরায়েশ খান্দানের এক বিশিষ্ট নেতা। তিনি প্রাক-ইসলামিক অন্ধকার যুগের লোক হইলেও নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার চরিত্র ছিল আয়নার মত নির্মল। আরবের কদাচার ও কুকর্মসমূহ হইতে তিনি সেই যুগেও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মূর্তিপূজা ও প্রতিমার উপাসনার বদলে তিনি এক খোদার উপাসক ছিলেন। আর আরবের তৎকালীন সর্বগ্রাসী নেশার আসক্তি ও শরাব পান করা হইতে নিজেকে তিনি বিরত রাখিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

হযরত আবুবকর (রাঃ) শিক্ষা-দীক্ষায়ও সে সময় সেরা ব্যক্তি ছিলেন। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য সাহিত্য এবং ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা ছিল। আরবের বিভিন্ন বংশগুলির নছবনামা (বংশীয় ধারাবাহিক সূত্র ও পরিচয়) সম্পর্কিত জ্ঞানে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার এইসব গুণ, যোগ্যতা এবং চারিত্রিক বলিষ্ঠতার কারণে তিনি তৎকালে সবার নিকট যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদার পাত্র ছিলেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পিতার নাম ছিল আবু কোহাফা। তিনিও ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং সুযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে আরবের সম্মানিত পুরুষ ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) পিতার বিশিষ্ট গুণসমূহ মিরাসী অধিকার সূত্রে যেন সব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বয়স্ক পুরুষ হিসাবে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ)-ই সর্বপ্রথম ইসমলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সততা-সত্যবাদিতা এবং রাসূলের বাক্য নির্দ্বিধায় সত্য বলিয়া স্বীকার করার কারণে তাঁহাকে ছিদ্দীক আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। প্রাক-ইসলামিক যুগে তিনি যেমন সম্মানের অধিকারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামী জীবনেও তিনি অবিকল একইভাবে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছিলেন। হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর রেহলতের পরে প্রথম খলীফা পদে বরিত হইয়াছিলেন তিনিই।

হযরত আয়েশার (রাঃ) মাতার নাম ছিল উম্মে রাওমান। তিনিও উচ্চবংশজাত মহিলা ছিলেন। মক্কার বিখ্যাত অভিজাত কেনানা গোত্রে জন্মলাভ করিয়াছিলেন তিনি। স্বভাবে-চরিত্রে, জ্ঞানে-গুণে সবদিক দিয়াই তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সুযোগ্য পত্নী ছিলেন।

এই মহিলার প্রথম স্বামী লোকান্তরিত হইবার পর হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

উম্মে রাওমানের গর্ভে দুইজন সন্তান জন্মলাভ করিয়াছিলেন। পুত্রের নাম ছিল আবদুর রহমান (রাঃ) এবং কন্যার নাম হযরত আয়েশা (রাঃ)।

হযরত আয়েশার (রাঃ) জন্মগ্রহণ

হুযুরে পাক (সঃ) নবুয়ত লাভের প্রথম বৎসরের শেষভাগে অর্থাৎ হিজরী-পূর্ব দশম সাল মোতাবেক ছয়শত বার ঈসায়ী সনের জুলাই মাসের কোন এক তারিখে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পত্নী উম্মে রাওমানের গর্ভে হযরত আয়েশা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

নাম সম্পর্কিত কিছু আলোচনা

হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রকৃত নাম, ডাক নাম, কুনিয়াত প্রভৃতি মিলিয়া বেশ কয়েকটি নাম ছিল। বিভিন্ন নামকরণের পিছনে বিভিন্ন কারণ আছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তা কিছুটা আলোচনা করিতেছি। হযরত আয়েশার (রাঃ) বিভিন্ন নামগুলি ছিল এই ঃ

(১) আয়েশা (২) ছিদ্দীকা (৩) হোমায়রা (৪) উম্মুল মু'মিনীন।

আয়েশা ঃ এই নামটি ছিল তাঁহার মাতৃ-পিতৃ প্রদত্ত নাম। তাঁহার প্রকৃত নামও ইহা এবং ডাক নামও ছিল ইহা।

সিদ্দীকা ঃ অত্র নামকরণের পিছনে নিম্নোক্ত কারণ ছিল।

একটি অবাঞ্ছিত মিথ্যা রটনা হযরত আয়েশার (রাঃ) পবিত্র জীবনে একটি দুর্যোগ ঘটাইয়াছিল। কপট মুনাফিকরা তাঁহার নির্মল চরিত্রে একটি দাগ বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহাতে রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে এবং লজ্জায় এতদূর বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, দেহ-মন একেবারে অবসন্ন হইয়া আসিল। তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া গেলেন। এ সময় হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আয়েশা! আল্লাহকে স্মরণ করিয়া তুমি সত্য কথা বল। সত্য বলিলে যদি তুমি অন্যায় করিয়াও থাক, তবে আল্লাহ পাক তাহা ক্ষমা করিবেন।

জবাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী আল্লাহ আমার সাক্ষী। নিশ্চয় আমি সত্য কথা বলিব। কিন্তু নিন্দুকগণ কি আমার সত্য কথাকে সত্য বলিয়া লইবে? তেমন তো মনে হইতেছে না। তাই স্থির করিয়াছি নবী হযরত ইয়াকুবের মতই আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়া থাকিব। আল্লাহর পক্ষ হইতেই আমার ব্যাপারে সত্য প্রকাশিত হইয়া যাইবে।

হযরত আয়েশার (রাঃ) এইরূপ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতা জিব্রাঈল হযরত আয়েশার (রাঃ) পবিত্রতার অনুকূলে অহী নিয়া নাযিল হইলেন।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ইহাতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, প্রিয়তমা! তোমার মহান পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ) সিদ্দীক (সত্যবাদী)। আজ দেখিলাম, তাঁহার কন্যা আয়েশাও সিদ্দীকা (অর্থাৎ সত্যভাষিণী)। হযরত রাসূলে

করীম (সঃ) এইরূপ মন্তব্য করার পর হইতেই হযরত আয়েশার (রাঃ) সিদ্দীকা নামটি মশহুর হইয়া উঠিতে লাগিল।

হোমায়রা ঃ হযরত আয়েশার (রাঃ) হোমায়রা নামকরণের কারণটি ছিল এই ঃ তাঁহার দেহের বর্ণ ছিল লালিমাযুক্ত গৌর। এই কারণে হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাকে অনেক সময়ই আয়েশা (রাঃ) না ডাকিয়া হোমায়রা নামে সম্বোধন করিতেন। উল্লেখ্য যে, হোমায়রা একটি আরবী শব্দ। ইহার অর্থ লাল বর্ণ রমণী।

উম্মুল মু'মিনীন ঃ অত্র নামটি মশহুর হওয়ার ঘটনাটি ছিল এইরূপ। ইসলামের একান্ত প্রাথমিক অবস্থায় যখন পর্দার আয়াত নাযিল হয় নাই, তখনকার কোন একদিন হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এমন সময় সাহাবী দাহিয়া কালবী আসিয়া হুযুর (সঃ)-এর কাছে বসিয়া পড়িলেন এবং নবী দম্পত্তির আলাপ-আলোচনা শুনিতে লাগিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আপনার পরলোক গমনের পর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে এই মহিলাকে [হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে] আমি সহ্য করিতে পারিব না। বরং আমি ইহাকে বিবাহ করিয়া বিধবার বেশ ধারণ করিতে বিরত রাখিব।

দাহিয়া কালবীর (রাঃ) কথা শ্রবণ করিয়া আল্লাহর নবী (সঃ) মৃদু হাসিয়া কি কথা যেন বলিতে যাইতেছিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে আল্লাহর তরফ হইতে ফেরেশতা জিব্রাঈল আসিয়া আল্লাহর নবী (সঃ)-কে শুনাইয়া দিলেন ঃ "আল্লাহর নবী মুমিনদের কাছে তাহাদের নিজেদের জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং নবীর (সঃ) সহধর্মিণীগণ তাহাদের কাছে উম্মুহাতুল মু'মিনীন" (অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া) (অতএব) তোমাদের জন্য সিদ্ধ নয় যে, নবীর (সঃ) অবর্তমানে তোমরা তাঁহাদেরকে বিবাহ করিবে।

সেইদিন হইতে নবী-সহধর্মিণীগণকে সকলে উম্মুহাতুল মু'মিনীন নামে সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

শৈশব

সে যুগে আরবের রীতি ছিল, অভিজাত এবং সঙ্গতিপন্ন কবিলার শিশু সন্তানদিগকে স্তন্যদান এবং লালন-পালন করার জন্য পল্লীবাসিনী ধাত্রীদের কাছে সোপর্দ করা হইত।

এই রীতি অনুসারে শিশু হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে মক্কার বাহিরের এক পল্লীবাসী ওয়ায়েলের স্ত্রীর কাছে সমর্পণ করা হইল। উক্ত ধাত্রী দম্পতি খুবই সদ্বংশজাত এবং চরিত্রবান লোক ছিলেন। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই শিশু আয়েশা (রাঃ)-কে নিজেদের সন্তানতুল্য স্নেহ করিতেন এবং পরম যত্নে লালন-পালন করিতেন। বিশেষতঃ ধাত্রীপতি ওয়ায়েল হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি এতই স্নেহপ্রবণ ছিলেন যে, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, মাঝে মাঝে প্রায়ই আসিয়া হযরত আয়েশার (রাঃ) খোঁজ-খবর লইতেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। এমনকি ওয়ায়েলের ভ্রাতা ও পুত্র-কন্যাগণও হযরত আয়েশার (রাঃ) সহিত সাক্ষাত করিতে মাঝে মাঝে মদীনায় আসিতেন। পক্ষান্তরে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও ইহাদেরকে আপন আত্মীয়ের মত আদর-আপ্যায়ন করিতেন।

এভাবে তিন বৎসর ধাত্রীগৃহে লালিত-পালিত হইবার পর হযরত আয়েশা (রাঃ) মাতাপিতৃ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর মাতা-পিতার হাতে তিনি গড়িয়া উঠিতে লাগিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) শৈশবে প্রকৃতিগতই কিছুটা চপলা এবং চঞ্চলা বালিকা ছিলেন। তাহাছাড়া খেলাধূলাও তিনি একটু বেশী পছন্দ করিতেন। প্রায় প্রতিদিনই তিনি চড়ুই ভাতি, পুতুল খেলা, দোলনা দোলা, দৌড়ঝাঁপ, বাজী প্রভৃতির কোন না কোন একটা খেলা নিয়া থাকিতেন। আরবে সে সময় প্রায় প্রতিটি ঘরের ছেলেমেয়েরাই দোলনায় দোল খেলাটিকে বেশী পছন্দ করিত। তাহারা দোলনায় দুলিত আর সুন্দর সুন্দর ছড়া গাহিত। ছড়াগুলি গাহিত তাহারা দোলনা দোলার তালে তালে। হযরত আয়েশা (রাঃ) কিন্তু তাহাদের মত ঐসব ছড়া পছন্দ করিতেন না। বরং উহার বদলে তিনি তাহার পিতার নিকট শ্রুত অর্থবোধক কবিতা আবৃত্তি করিতেন।

হযরত আয়েশার (রাঃ) স্মৃতিশক্তি বাল্যাবধিই অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার যাহা কানে শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। কাজেই পিতার পঠিত যখন যাহা শুনিতেন তখনই তাঁহার স্মরণ থাকিত। একদা তিনি পিতার কণ্ঠে শ্রুত তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবি লাবিদ রচিত কবিতার দুইটি পংক্তি পড়িতেছিলেন আর দোলনায় দুলিতেছিলেন। ঠিক সেই সময় তাঁহার পিতা কোন কার্যোপলক্ষে মেয়ের নিকট দিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। তিনি তখন কন্যার মুখে ঐ কবিতা শুনিয়া অবাক হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, আল্লাহর রহমতে হয়ত তাঁহার এ স্নেহের কন্যাটি শিক্ষা-দীক্ষায় খ্যাতিলাভ করিবে। আল্লাহ তাঁহাকে যথেষ্ট স্মৃতিশক্তি দান করিয়াছেন।

দোলনায় দোলা, চড়ুইভাতি তথা কৃত্রিম বনভোজনও ছিল শিশু আয়েশার (রাঃ) একটি প্রিয়তম খেলা। প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েদেরকে লইয়া প্রায়ই তিনি এই কৃত্রিম বনভোজনের খেলায় লিপ্ত হইতেন।

বাল্যকালেই হযরত আয়েশার (রাঃ) অন্তঃকরণে অত্যধিক দয়া-মায়া ও পরদুঃখকাতরতার সূচনা হইয়াছিল। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগ্নি বিবি আসমা (রাঃ) বলেন, একদা আয়েশা (রাঃ) কৃত্রিম বনভোজনের রান্নাবান্না শেষ করিয়া সঙ্গী-সাথীদেরকে লইয়া খাইতে বসিয়া গিয়াছে। ঠিক এমনি সময় একটি ক্ষুধার্ত ফকীর আসিয়া গৃহ দরজায় দাঁড়াইয়া কিছু খাবার প্রার্থনা করিয়া কাকুতি-মিনতি শুরু করিয়া দিল। তখন দয়ালু আয়েশা নিজের সম্মুখের সেই বনভোজনের কৃত্রিম খাবারসমূহ উক্ত ফকীরকে দিয়া দিল। (আসমা বলেন) আমি তখন আয়েশার (রাঃ) এ অবাক কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া বলিলাম, আয়েশা (রাঃ) ! এই বনভোজনের খাবার দ্বারা কি মেহমানদারী করা চলে? এইকথা বলিয়া গৃহ হইতে খাবার আনিয়া মুসাফির লোকটিকে খাওয়াইয়া দিলাম। (আসমা বলেন) আয়েশার (রাঃ) কার্য দেখিয়া আমি সেইদিনই ধারণা করিয়াছিলাম যে, আমার এই কচি ভগ্নিটি মনে হয় পরিণামে, আমাদের পিতার মতই দয়া-মায়া ও পরদুঃখকাতরতায় সুখ্যাতি লাভ করিবে।

শিশু আয়েশা (রাঃ) পুতুল খেলায়ও খুবই আনন্দ অনুভব করিতেন। অনেকগুলি পুতুলের মধ্যে তাঁহার একটি ডানাওয়ালা পুতুল ঘোড়াও ছিল। এই ঘোড়াটি তাঁহার খুবই প্রিয় ছিল। একদা তিনি ঐ পুতুল ঘোড়াটি লইয়া খেলায় লিপ্ত হইলেন। ঐ সময় হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) পিতার সহিত কথাবার্তা বলিয়া নিজ

গৃহে রওয়ানা হইলেন। যাইবারকালে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে তাঁহাদের গৃহ প্রাঙ্গণে পুতুল খেলায় মগ্ন দেখিয়া মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আয়েশা ! ঘোড়ার তো ডানা থাকে না, কিন্তু তোমার ঘোড়ার যে ডানা রহিয়াছে ব্যাপার কি বলতো?

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আয়েশার (রাঃ) পিতা-মাতা যে সম্মান করেন, তাহা তিনি চোখের উপরেই দেখিতেন। তাই তাঁহার আওয়াজ পাইয়াই তিনি দাঁড়াইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর এই উক্তিটির জবাব প্রদান করিতে তাঁহার মুহূর্তকালও ভাবিতে হইল না। তিনি চট করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, আহা এ বলেন কি ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ) ! হযরত সোলাইমান (আঃ)-এর ঘোড়ার যে ডানা ছিল, তাহা কি আপনার জানা নাই?

এতটুকু কচি বালিকার মুখে এই ধরনের উপস্থিত বুদ্ধির কথা শুনিয়া হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং আল্লাহর কাছে মুনাজাত করিলেন, আয় মাবুদ! তুমি এই বালিকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসত্তাকে তোমার কাজেই লাগাইয়া দিও। হুযুরে পাক (সঃ)-এর সেই দিনকার দোয়া আল্লাহ তায়ালা পুরাপুরিভাবেই সফল করিয়াছিলেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) পরবর্তী জীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত আয়েশার (রাঃ) বাল্যজীবনে কেবল যে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পূর্ব লক্ষণই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে, তেজ, বিক্রম ও অভূতপূর্ব সাহসিকতার বীজও তাঁহার হৃদয়ে শৈশবেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

হযরত আয়েশার (রাঃ) জননী উম্মে রাওমান কন্যা আয়েশার (রাঃ) খেলাধুলার প্রতি সীমাতিরিক্ত ঝোঁক দেখিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে শাসন এবং ভর্ৎসনা করিতেন। এমনকি কখনও কখনও তাঁহাকে মারধরও করিতেন। মেয়েদেরকে রান্না-বান্না ও গৃহের অন্যান্য কাজকর্মগুলি বালিকা বয়স অবধি শিক্ষা করা দরকার, একথাটি তাঁহার ভালভাবেই জানা ছিল। একদা এই উদ্দেশ্যেই তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে পাক করিবার কালে রান্নাঘরে নিজের নিকট বসাইয়া দিলেন। কিন্তু বালিকা আয়েশার (রাঃ) সেখানে বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। তিনি একটু এই আসি বলিয়া রান্নঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া খেলায় লিপ্ত হইলেন। মাতা ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া কয়েকটি চপেটাঘাত করিলেন।

বালিকা আয়েশা (রাঃ) ইহাতে ঘরের দরজার কাছে বসিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দাদা আবু কোহাফা বাহির হইতে আসিয়া নাতিনী আয়েশা (রাঃ)-কে এভাবে কাঁদিতে দেখিয়া তাহাকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তিনি কোন জবাব না দিয়া আরও জোরে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে শুরু করিলেন। আবু কোহাফা তখন পুত্রবধূ উম্মে রাওমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মা! তুমি বোধ হয় আমার স্নেহের নাতিনীটিকে মার-ধর করিয়াছ, খবরদার ! আর কখনও ইহাকে এইরূপ মার-ধর করিও না।

শ্বশুরের কথা শুনিয়া উম্মে রাওমান বলিলেন, আব্বা! ওকে এই বয়সে একটু শাসন করিয়া গৃহের কাজকর্ম না শিখাইলে পরে তো বিশেষ অসুবিধায় পড়িবে।

আবু কোহাফা বলিলেন, তোমার কথাতো ঠিকই বৌমা, তবে একটু মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া-শুনাইয়া লওয়ার চেষ্টা করিও। আমি যে আমার কচি বোনটির কান্না মোটেই সহিতে পারি না।

বিবাহ-পূর্ব শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ

হযরত আয়েশা (রাঃ) জীবনের দুই পর্যায়ে শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। উহার একটি পর্যায় হইল শৈশব ও কৈশোর অর্থাৎ বিবাহের পূর্বকালীন সময় আর অন্য পর্যায় হইল তাহার বিবাহের পরবর্তী জীবন। এই পর্যায়ে তিনি বিশ্ব মানবের মহাশিক্ষক স্বামী হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সহধর্মিণী হিসাবে তাঁহার একান্ত সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভের সুযোগে খোদ তাঁহারই নিকট হইতে মানবতার প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করিয়াছিলেন। এখন প্রথম পর্যায়ের শিক্ষার কথা বলিতেছি।

সে যুগে আরব দেশে আক্ষরিক শিক্ষা লাভের প্রচলন যথাযথভাবে শুরু হয় নাই। তবু যাহা কিছু শুরু হইয়াছিল তাহা বর্তমানকালের মত মক্তব, মাদ্রাসা বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নহে। ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ, ওস্তাদ বা শিক্ষকের মাধ্যমে কেহ কেহ কিছু লেখা-পড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইরূপ শুনা যায়, প্রাথমিক অবস্থায় ইসলামে যখন চল্লিশজন লোক দীক্ষিত হইয়াছে তখন তাহাদের মধ্যে নারী-পুরুষ মিলাইয়া মোট আঠারজন লোকের আক্ষরিক জ্ঞান ছিল। তন্মধ্যে সতেরজন ছিলেন পুরুষ এবং একজন মহিলা। পুরুষদিগের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) মোটামুটি বেশী লিখা-পড়া জানিতেন। এই দুই ব্যক্তিকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিতই বলা যায়।

মহিলা শিক্ষিতার মধ্যে হযরত খাদীজার (রাঃ) পরে শিক্ষিতা ছিলেন শাফা বিনতে আবদুল্লাহ আকদিয়া। হযরত আয়েশা (রাঃ) শৈশবে ইহার নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

অবশ্য আরবে সে যুগে আক্ষরিক শিক্ষার এরূপ অবস্থা থাকিলেও প্রকৃত শিক্ষা এবং শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরবে তখনও চর্চার অভাব ছিল না। তবে তাহা সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পারিবারিক পরিবেশ শিক্ষা লাভের বেশী অনুকূল ছিল। হযরত আবুবকর (রাঃ) নিজেই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। তাহার স্ত্রী উম্মে রাওমানও ছিলেন কিছুটা শিক্ষিতা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। নারীসুলভ পারিবারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন। তাহা ছাড়া গুণে-জ্ঞানে, স্বভাব-চরিত্রে এবং বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতায় ছিলেন তিনি আদর্শ স্থানীয়া। সুতরাং তিনি স্বীয় স্নেহের দুহিতাকে নানারূপ উপদেশে, কাজে-কর্মে এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় যেভাবে সম্ভব শিক্ষা এবং জ্ঞান দান করিতেন।

পক্ষান্তরে হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর উপর তখন নিত্য নূতন বিষয় সম্বলিত কোরআনে পাকের আয়াতসমূহ নাযিল হইতেছিল। তিনি তাহা প্রিয় সাহাবীগণকে শুনাইয়া দিয়া সাথে সাথে মুখস্থ করাইয়া দিতেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) কোরআনে পাকের উক্ত বাণীসমূহ এবং তাহার অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ এবং তাৎপর্যসমূহ স্বীয় গৃহে আসিয়া সকলকে উত্তমরূপে শুনাইয়া-বুঝাইয়া ও শিখাইয়া দিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন অপ্রাপ্তা বয়স্কা বালিকা হইলেও তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এবং স্মরণশক্তির বলে স্বীয় পিতার মুখের সেই অমূল্য বাণীসমূহ অন্যান্য লোকদের সাথে সাথে শিখিয়া ও বুঝিয়া ফেলিতেন। এইভাবে কোরআন ও হাদীস ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহও বিজ্ঞজনের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতেন।

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী আরবে তখন ব্যাপকভাবে কাব্য সাহিত্য রচনা, বংশসূত্র বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলির অত্যধিক প্রচলন ছিল। হযরত আয়েশার (রাঃ) পিতা হযরত

আবুবকর (রাঃ) এইদিক দিয়া আরবের প্রথম সারির ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং হযরত আয়েশা (রাঃ) পিতার নিকট হইতে এইসব বিষয়গুলি অতি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিলেন।

তাহাছাড়া ইসলামের পাঁচ আরকান এবং ইহার আনুষঙ্গিক বিষয়-বস্তুগুলি যাহা হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট হইতে শিখিয়া যাইতেন, তাহা সম্পূর্ণ হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার পিতার মাধ্যমে পরিপূর্ণরূপে শিখিয়া লইতেন।

এইভাবে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষাই নয় বরং তৎকালীন প্রচলিত বিভিন্ন রকম পার্থিব শিক্ষা ও জ্ঞানেও তিনি পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তির প্রখরতা এই ধরনের ছিল যে, পিতার নিকট হইতে শুধু মৌখিকভাবে শুনিয়াই অন্ততঃ তিন চার হাজার কবিতা তিনি মুখস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। আরব দেশের বিভিন্ন কবিলার নসবনামা তথা বংশসূত্র-জ্ঞানে তিনি এত বেশী পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, পরবর্তী মহাবিদ্বান উমাইয়া খলীফা আমীর মুয়াবিয়া যখন 'কিতাবুল মুলক' ও 'আখবারুল মাদায়েন' নামক দুইখানা আরব নসবনামা গ্রন্থ রচনা করিতে উদ্যোগী হন তখন তিনি এ বিষয়ে সাহায্য গ্রহণ করিতে হযরত আয়েশার (রাঃ) দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট মূল্যবান তথ্য এবং উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বংশীয় নসবনামার জ্ঞানরাজি তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এইভাবে ঃ তাঁহার পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ) এ বিষয়টিতে সর্বজন স্বীকৃত সেরা অভিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। সুতরাং এই বিষয়টি অভিজ্ঞ পিতা তাঁহাকে শিক্ষা দানের সময় ছাড়াও যখন বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে পাত্র ও পাত্রীর অভিভাবকগণ একে অন্যের বংশ তালিকা জানার জন্য তাঁহার কাছে আসিত, তখন তিনি তাহাদের কাছে সংশ্লিষ্ট গোত্রের বংশ তালিকা বর্ণনা করিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) পিতার সে বিবরণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতঃ মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন। এইরূপ তীব্র স্পৃহা ও একাগ্রতাই তাঁহাকে নানাবিধ জ্ঞানে বিভূষিত করিয়াছিল।

হযরত আবুবকর (রাঃ) আরবের এক সেরা জ্ঞানী পুরুষ এবং সাধক ধার্মিক ছিলেন। সাথে সাথে তাঁহার বিচক্ষণতাও ছিল অতুলনীয়। তাই একান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার কন্যাটির ধীশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় লাভ করিয়া তিনি তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা লাভের ব্যাপারে বেশী মনোযোগী ছিলেন।

তাঁহার অনেক প্রকার শিক্ষার ভার তিনি নিজের হাতেই রাখিয়াছিলেন। তিনি কন্যাকে আদর্শ চরিত্রবতী করিয়া গড়িবার লক্ষ্যে যে ধারায় তাঁহাকে শিক্ষা দান করিতেন সত্যিই তাহা প্রণিধানযোগ্য।

তিনি কন্যাকে বলিতেন, মা আয়েশা ! আল্লাহ তায়ালার স্বভাবকে নিজের স্বভাব বানাইয়া লও। তাঁহার এক গুণবাচক নাম রাহমান। যেহেতু সারাজাহান তাঁহার রহমত তথা কৃপা ও করুণার দ্বারা আচ্ছাদিত। আল্লাহ তায়ালার আর একটি নাম 'গফুর'। যেহেতু দুনিয়ার সমগ্র মানব এবং অপরাপর জীব-জন্তুর গুনাহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি মার্জনা করিতেছেন। আল্লাহর আর একটি নাম 'সাত্তার'। যেহেতু তিনি সকলের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। প্রকাশ করিয়া কাহাকেও লজ্জিত করেন না। সত্যি বলিতে কি সুযোগ্য পিতার নিকট হইতে এইরূপ বিশেষ ধারায় বিশেষ শিক্ষাসমূহ লাভ করিয়া ও

তাহা স্বীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে রূপায়ন করিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেকে বিশ্ববাসীর নিকটে সেরা মহীয়সী ও মহিমান্বিত নারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

শুভ পরিণয়

হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন শৈশব পার হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করতঃ উল্লেখিতরূপ শিক্ষা-দীক্ষা লাভে লিপ্ত ছিলেন ঠিক সেই সময়ই হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর মহীয়সী পত্নী হযরত খাদীজা (রাঃ) সহসা মরধামে প্রস্থান করিলেন। ফলে তাহার পারিবারিক ক্ষেত্রটি যে কি সঙ্কটাপন্ন হইল তাহা হযরত সাওদার (রাঃ) জীবনালোচনা কালে উল্লেখ করিয়াছি। হুযুরে পাক (সঃ)-এর একমাত্র সঙ্গিনী, পরম হিতাকাঙ্খিনী হযরত খাদীজার (রাঃ) এভাবে হঠাৎ চির বিদায় গ্রহণ এবং সদ্য মাতৃহারা দুইটি নাবালিকা কন্যার লালন-পালন সমস্যা তাঁহাকে খুবই ম্রিয়মান করিয়া ফেলিল। তাহার এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে অনেকেই তাঁহাকে শীঘ্র একটি বিবাহ করিতে পরামর্শ দিল কিন্তু তিনি বলিলেন, বিবাহ করিলেই তো হইল না। খাদীজার (রাঃ) মত মহিলা পাওয়া যাইবে কোথায়?

হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রতি পরম সহানুভূতিশীল বিবি খাওলা নাম্নী তাঁহার এক খালা ছিলেন। তাঁহার কথাও উল্লেখ করিয়াছি। তিনি রাসূলুল্লাহর (সঃ) পারিবারিক ও মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বার বার তাঁহাকে পুনর্বিবাহ করিতে উপদেশ দিলেন এবং পাত্রী হিসাবে সাওদার (রাঃ) কথা প্রস্তাব করিলেন। শেষ পর্যন্ত হুযুরে পাক (সঃ) রাজী হইয়া তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। ঐ সময় খাওলা একথাও বলিয়াছিলেন যে, হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কুমারী কন্যা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহ করিলে উহার মাধ্যমে আরবের বিবাহ সম্পর্কিত যে কুসংস্কার আছে, তাহা দূর হইত এবং আয়েশার (রাঃ) দ্বারা ইসলামের নানাবিধ হিত সাধন হইতে পারিত। মূলতঃ রাসূলুল্লাহর (সঃ) ঘটকই ছিলেন বিবি খাওলা।

যেদিন হযরত সাওদার (রাঃ) সাথে হুযুরে পাক (সঃ)-এর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল, তাহার দুইদিন পরেই বিবি খাওলা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, জনাব! আপনি আপনার বালিকা কন্যা আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হুযুর (সঃ)-এর উত্তম সহচরী বানাইয়া দিন। আর এই বিবাহের মধ্য দিয়া আরবের প্রচলিত অবাঞ্ছিত কুসংস্কারগুলির মূলোৎপাটন করুন। আমার একটি সুদৃঢ় ধারণা এই যে, বিবি আয়েশার (রাঃ) দ্বারা ইসলামের বহু উপকার সাধিত হইবে। কেননা তাঁহার মত বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা বালিকা সমগ্র আরবে দ্বিতীয়টি নাই।

খাওলার কথা শ্রবণ করিয়া হযরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, ইসলামের খেদমত এবং সমাজের কুপ্রথা দূর করার জন্য আমি সর্বদাই প্রস্তুত। তারপর হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে কন্যা বিবাহ প্রদান করাতো পরম সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা। তবে একটি ব্যাপারে আমি দ্বিধাগ্রস্ত যে, তিনি তো আমাদের ধর্মীয় ভ্রাতা। তদুপরি ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহার সহিত আমার ভ্রাতৃসম্পর্ক। এক্ষেত্রে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রী স্থানীয়া আয়েশাকে বিবাহ করিবেন কিনা তাহাও তো বলা যায় না।

তাঁহার কথা শুনিয়া বিবি খাওলা বলিলেন, এই কুসংস্কারের কথাই আমি বলিয়াছিলাম। ইহাইতো সেই অবাঞ্ছিত কুসংস্কার। ইহার মূলোচ্ছেদ করিতেই হইবে। তারপর হুযুরে পাক (সঃ) এ বিবাহে রাজী হইবেন কি না সে জিম্মাদারী আমার রহিল।

হযরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, হুযুরে পাক (সঃ) যদি সম্মত থাকেন তবে আলহামদুলিল্লাহ—আমি সানন্দে তাঁহার কাছে আয়েশা (রাঃ)-কে সমর্পণ করিব।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সাথে এইভাবে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া আসিয়া বিবি খাওলা অতঃপর একদিন রাসূলুল্লাহর (সঃ) সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ) ! আরবের বিবাহ সংক্রান্ত কুসংস্কারের মূল্যোৎপাটন ইসলামের হিত সাধন এবং ব্যাপক স্বার্থে হযরত আবুবকর (রাঃ) দুহিতা আয়েশা (রাঃ)-কে আপনার বিবাহ করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা আপনার কোন ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ বা ভোগ-বিলাসের জন্য নহে; বরং ইহা জাতি-ধর্ম ও সমাজের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেই হওয়া উচিত।

হুযুরে পাক (সঃ) বিবি খাওলার কথাটি মনে মনে ভাবিয়া দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় হযরত সাওদা (রাঃ)-ও সেখানে আসিয়া পড়িলেন এবং তিনিও এ ব্যাপারে হুযুরে পাক (সঃ)-কে অনুরোধ করিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে হুযুরে পাক (সঃ)-এর একটি পূর্বদর্শিত স্বপ্নের কথা স্মরণে আসিয়া গেল। ঐ স্বপ্নে হযরত আয়েশার (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) গৃহিণী হওয়ার ইঙ্গিত ছিল। উক্ত স্বপ্নটি স্মরণ হওয়ায় হুযুরে পাক (সঃ)-এর মনে একটা ভাবান্তর সৃষ্টি হইল। তখন তিনি আর মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রশ্রয় না দিয়া খাওলার প্রস্তাবে রাজী হইলেন।

খাওলা আর দেরী না করিয়া তখনই হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে হুযুরে পাক (সঃ)-এর সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) এ শুভ সংবাদ শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন এবং নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলেন। অতঃপর তিনি পিতা আবু কোহাফা ও স্ত্রী উম্মে রাওমানকে জানাইয়া তাহাদের নিকট হইতেও সম্মতি গ্রহণ করিলেন। তাহারা উভয়ে সানন্দে সম্মতি জানাইলেন।

অতঃপর উভয় পক্ষের মতানুসারে নবুয়তের দশম সনের পঁচিশে শাওয়াল মোতাবেক ছয়শত বিশ ঈসায়ী সনের মে মাসে বিবাহের তারিখ নির্ধারিত হইল। বিবাহে হযরত আয়েশার (রাঃ) পাঁচশত দেরহাম মোহরানা সাব্যস্ত হইল।

উক্ত তারিখে হযরত আবুবকর (রাঃ) স্বয়ং গিয়া তাঁহার ভাবী জামাতাকে নিজ বাড়ীতে নিয়া আসিলেন। উপস্থিত লোকেরা এবং হযরত আবুবকর (রাঃ), আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহাকে সানন্দে ও সযত্নে অভ্যর্থনা জানাইলেন। ওদিকে ঠিক এমন সময়ও কিন্তু অবুঝ কিশোরী আয়েশা (রাঃ) খেলায় মগ্ন ছিলেন। জনৈকা মহিলা তাঁহাকে ডাকিয়া নিয়া হাত-মুখ ধোয়াইয়া, যথাবিধি চুল বাঁধিয়া বিবাহের পোশাকাদি পরাইয়া দিলেন। অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ) অন্তঃপুরে গিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে মজলিসে নিয়া আসিয়া দাদা আবু কোহাফার কোলে বসাইয়া দিলেন। তারপর তিনি মজলিসে দাঁড়াইয়া হৃদয়স্পর্শী ভাষায় একটি ভাষণ দিলেন ঃ

উপস্থিত সুধী মহোদয়বৃন্দ ! আপনারা সবাই জানেন; আমাদের নবী হযরত রাসূলে করীম (সঃ) উজ্জ্বল আলোক মশাল জ্বালাইয়া আমাদেরকে অন্ধকাররাশি হইতে

পুণ্যের আলোকে নিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এই দীপ্ত মশাল চির উজ্জ্বল রাখিতে আমাদের অনেক কিছুই করিবার আছে। আপনারা সভাস্থলে আমার এই কিশোরী কন্যাটিকে দেখিতেছেন, আপনারা উত্তমরূপে জানেন, আরব পাশবিকতায় আচ্ছন্ন। কেহবা নিজের কন্যা মৃত্তিকাগর্ভে পুঁতিয়া ফেলিতেছে। যাহাদের কন্যাগণ কোনরূপ প্রাণে বাঁচিয়া যায়, তাহাদের মৃতের মত কাল কাটাইতে হয়। এ দেশে বন্ধুর দুহিতা বন্ধু বিবাহ করিতে পারে না। আমি আজ সেই কুসংস্কারকে উচ্ছেদ করিতে চাই। যদি আপনারা আমার এ কন্যাকে রাসূলুল্লাহর (সঃ) করে সমর্পণ করিতে রাজী থাকেন তবে আরবের বুক হইতে চিরাচরিত দুর্নীতিগুলির মূলোৎপাটিত হইবে। অথচ রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে আমার সম্পর্ক বহালই থাকিবে। আমি চাই যে, আমার এ কন্যা হুযুরে পাক (সঃ)-এর সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করিয়া পরবর্তীকালে সে তাহার শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শ সমাজে প্রচার করুক।

সকলে বলিয়া উঠিল, আবুবকর (রাঃ) ! সাবাস আপনাকে। আপনার এ মহৎ উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খার সাথে আমরা সকলেই একমত। আমরা চাই, আয়েশার (রাঃ) বিবাহের মধ্য দিয়া আমাদের উপর কল্যাণ নামিয়া আসুক।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ভাষণের পর যথারীতি হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে হযরত আয়েশার (রাঃ) বিবাহ বন্ধন সুসম্পন্ন হইল। বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবারকালে হযরত আয়েশা (রাঃ) কত বৎসরের বালিকা ছিলেন, তাহা নিয়া জীবনীকার ও ঐতিহাসিকদের ভিতর বেশ কিছু মতভেদ দেখা যায়। কাহারও মতে তখন হযরত আয়েশার (রাঃ) বয়স ছিল ছয় বৎসর, কেহ বলেন সাত বৎসর, আবার কেহ কেহ নয় বৎসর ছিল বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

বিবাহ অনুষ্ঠানে হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন তাঁহার চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত হামজাহ (রাঃ), চাচি হযরত উম্মুল ফজল, খালা হযরত খাওলা ও তাঁহার স্বামী হযরত ওসমান ইবনে মাজউন, চাচাত বোন হযরত উম্মুহানী। অপরপক্ষে ছিলেন হযরত আয়েশার (রাঃ) দাদা হযরত আবু কোহাফা, মাতা উম্মে রাওমান, বড় ভগ্নি হযরত আসমা, সহচরী হযরত আতিয়া প্রমুখ পুরুষ ও মহিলাগণ।

একটি প্রশ্ন ও তাহার জবাব

"হযরত আয়েশার (রাঃ) মত এত অল্প বয়স্কা একটি কিশোরী বালিকাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন উদ্দেশ্যে কি স্বার্থে বিবাহ করিলেন" অনেকেরই মনে এই প্রশ্নটির উদয় হইতে পারে। ঐ প্রশ্নের উত্তর এই যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) দুনিয়ার কুরীতি-নীতি ও কু-সংস্কারগুলির মূলোচ্ছেদ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ সংস্কারক হিসাবে আগমন ঘটিয়াছিল তাঁহার।

যে যুগে আরবে দীর্ঘদিন ধরিয়া বহু অহেতুক ও অর্থহীন সংস্কার বিদ্যমান ছিল। এই বিবাহের মাধ্যমে সেই সব সংস্কার তো সরাসরিভাবে ঐ বিবাহের ফলেই চুরমার হইয়া যায়। আর অন্যান্য কুসংস্কারসমূহ দূর করিয়া দিবার মানসিক বলিষ্ঠতার সূচনাও হয় সেই বিবাহের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এই বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যে সকল রীতি-নীতি ও আদর্শ স্থাপন করা হয় তৎপ্রতি অনুপ্রাণিত হইয়াই আরব সমাজ তাহাদের দীর্ঘকাল ব্যাপী কুসংস্কারের মূল্যোচ্ছেদ করিতে সক্ষম হয়।

ইহা তো গেল একটি দিকের কথা। অন্যদিকটি হইল, আল্লাহ তায়ালা হুযুরে পাক (সঃ)-এর মাধ্যমে ইসলামের বিধি-বিধান দ্বারা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়াদির সমস্ত দিকে সুষ্ঠু ও কল্যাণমূলক পথ বাতলাইয়া দিয়াছেন। মানব জীবনের যে কোন দিকের ও ক্ষেত্রের সেরা আদর্শ ছিলেন হযরত রাসূলে করীম (সঃ)। সুতরাং তাঁহার জীবনে সর্বদিকের বিষয়াবলীই মানবদিগের অবহিত হওয়া দরকার। তবে কতকগুলি বিষয় আছে যাহা লোকসমাজে প্রচার করার লক্ষ্যেই অতি স্বাভাবিকভাবে হুযুরে পাক (সঃ)-এর এমন একজন নব্য জীবন সঙ্গিনীর প্রয়োজনীয়তা ছিল, যিনি সর্বদা হুযুরে পাক (সঃ)-এর সান্নিধ্যে থাকার সুযোগে তাঁহার জীবনাদর্শের সকল বিষয় বিশেষতঃ যাহা অন্য লোকদের পক্ষে কোন প্রকারেই জানা সম্ভব নহে, সেই বিষয়সমূহ জানিয়া-শুনিয়া লইতে পারেন এবং সর্বোপরি যিনি তাহা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার মত যোগ্যতা, ধীশক্তি, মেধা, স্মৃতিশক্তি এবং জ্ঞানার্জন লিপ্সার প্রাবল্যের অধিকারিণী। বিশেষতঃ নারীশ্রেণী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও মাসলা-মাসায়েল প্রভৃতি রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট হইতে ভালভাবে অবগত হইয়া উহা সকলের কাছে প্রচার করার জন্য হুযুরে পাক (সঃ)-এর এইরূপ একজন সহধর্মিণীরই প্রয়োজন ছিল। তাহাছাড়া ইহা অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব ছিল না। এইজন্যই এক্ষেত্রে হযরত আয়েশার (রাঃ) মত সুযোগ্য রমণীরই প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ এই প্রয়োজন হযরত আয়েশার (রাঃ) দ্বারা মিটিয়াছেও যথাযথভাবে। ইহা সর্বজন বিদিত যে, পরবর্তী পর্যায়ে নারীদের প্রকৃতগত মাসলাসমূহের বেশীর ভাগই উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশার (রাঃ)-এর মাধ্যমে জানিতে পারা গিয়াছে।

হযরত আয়েশার (রাঃ) বিবাহের পরের ঘটনা

হযরত আয়েশার (রাঃ) বিবাহ (আকদ)-কালীন বয়স লইয়া মতভেদ যতই থাকুক, এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, বিবাহকালে তিনি একেবারেই কচি বা নাবালেগ বালিকা ছিলেন। আর এই কারণেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পর মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত তিন বৎসর পাঁচমাস কাল হযরত আয়েশা (রাঃ) মক্কা শরীফে পিতৃগৃহেই অবস্থান করেন।

মক্কার মুসলমানগণ এ সময়ে কাফির-কোরায়েশদের নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। উহাদের এই নির্মম অত্যাচার হইতে সমাজের গণ্য-মান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হযরত আবুবকর (রাঃ)-ও রেহাই পান নাই। পিতার এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা দেখিয়া একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, পিতঃ! চলুন আমরা মক্কা ছাড়িয়া অন্য কোথাও গমন করি। হযরত আবুবকর (রাঃ) কন্যার কথা শুনিয়া তাহাকে সস্নেহে বলিলেন, মা আয়েশা! রাসূলুল্লাহর (সঃ) নির্দেশ হইলেই আমরা অন্যত্র যাইতে পারি।

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই হুযুরে পাক (সঃ) একদল মুসলমানকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করিলেন। তারপর কিছু কিছু লোক মদীনায়ও চলিয়া গেলেন। একবার হযরত আবুবকর (রাঃ)-ও হুযুরে পাক (সঃ)-এর নির্দেশে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহার আর সেবার মদীনায় যাওয়া হইল না। পথিমধ্য হইতে তাঁহাকে আবার মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিতে হইল।

এদিকে কোরায়েশদের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। এমনকি তাহারা হুযুরে পাক (সঃ)-এর জীবনহানী ঘটাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। হুযুর পাক (সঃ) ততক্ষণে একে একে প্রায় সমস্ত মুসলমানকে মদীনায় পাঠাইয়া দিয়া চিরসঙ্গী হযরত আবুবকর (রাঃ)-সহ স্বীয় হিজরতের জন্য আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্দেশ লাভ করিয়া একদিন হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই খবর শুনাইয়া দিলেন। সাথে সাথে প্রস্তুতি শুরু হইয়া গেল। হযরত আয়েশা (রাঃ) এই কথা শুনিয়া হুযুরে পাক (সঃ) ও পিতার হিজরতের সঙ্গী হইতে চাহিলেন। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, তাঁহারা মদীনায় গিয়া সকল ব্যবস্থাদি করিবার পর যথাশীঘ্র হযরত রাসূলে পাক (সঃ)-এর এবং তাহাদের পরিবারস্থ সকলকেই মদীনায় লইয়া যাইবেন। পিতার কথায় আয়েশা (রাঃ) ধৈর্য ধারণ করিলেন।

রবিউল আউয়াল মাসের পহেলা তারিখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে হযরত রাসূলে পাক (সঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-সহ জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ তায়ালার দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে মদীনার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। অতি সঙ্গোপনে তাঁহারা রওয়ানা করিলেন। তখন মক্কায় অবস্থান রত হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহাদের এই গোপন যাত্রার কথা জানিতে পারিল না। পরদিন ভোরে কাফির-কেরায়েশ হুযুরে পাক (সঃ)-কে মক্কায় না দেখিয়া তন্মুহূর্তে তাঁহার অনুসন্ধানে চারদিকে বাহির হইয়া পড়িল।

তবে সে যাহাই হউক না কেন, দীর্ঘ বাইশটি দিন পথে কাটাইয়া রবিউল আউয়াল মাসের তেইশ তারিখ শুক্রবার দিন হযরত রাসূলে করীম (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-সহ মদীনায় গিয়া উপনীত হইলেন। মদীনার লোকেরা তাঁহাকে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে আসিয়াছে এইরূপ মনে করিলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হইলেন।

মদীনায় পৌঁছিয়া প্রথম সাতমাস হুযুরে পাক (সঃ) স্বীয় মাতুল গোত্রের আবু আইউব আনসারীর (রাঃ) এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) খারেজা ইবনে সায়েদ আনসারীর গৃহে অবস্থান করিলেন। এই সময়ের মধ্যে হুযুরে পাক (সঃ) মসজিদে নববী এবং তৎসংলগ্ন নিজ বাসগৃহসমূহ বানাইয়া লইলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ)-ও তাঁহার নিজের ও পরিবার-পরিজনদের জন্য যুনহ নামক স্থানে বাসগৃহ নির্মাণ করিলেন।

বাসগৃহাদি তৈরীর পর উভয়েই তাঁহাদের আপনাপন পরিবার-পরিজনদের মদীনায় নিয়া আসিবার জন্য আবু রাফে যায়েদ ইবনে হারেসা এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবুবকর (রাঃ)-কে মক্কা পাঠাইয়া দিলেন।

তাহারা মক্কায় পৌঁছিয়া হযরত রাসূলে করীম (রাঃ) এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পরিজনদেরকে লইয়া মদীনায় রওয়ানা হইলেন এবং যথাসময়ে গিয়া মদীনায় উপনীত হইলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) মদীনা আসিয়াও পিতৃগৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রুসুমাত অনুষ্ঠান

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় মদীনা তেমন স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল না। বিশেষতঃ মক্কায় এক ধরনের আবহাওয়ায় লালিত মুসলিমগণ মদীনার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় আসিয়া অনেকেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। জ্বর দেখা দিল প্রায় সকলেরই। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পরিবারে একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ) ব্যতীত বাকী প্রত্যেকেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। বালিকা আয়েশা (রাঃ) কঠোর পরিশ্রমে তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা সবাই ভাল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এইবার হযরত আয়েশা (রাঃ) রোগের কবলে পড়িলেন। তাঁহার রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করিল। প্রায় একমাস তাঁহাকে শয্যাগত থাকিতে হইল। এই কঠিন রোগে তাঁহার মাথার কেশ সব উঠিয়া গেল। নারীদের কেশের মায়া খুব বেশী। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার কেশের মায়ায় মাঝে মাঝে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। অনেক সময় তিনি তাঁহার কেশহীন মস্তক পিতাকে দেখাইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিতেন।

পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ) কন্যার মনের বেদনা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া-শুনাইয়া প্রবোধ ও সান্ত্বনা দান করিতেন।

এইরূপ মারাত্মক অসুখের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে প্রায় সাত মাস সময় কাটিয়া গেল। অতঃপর একদিন হযরত আয়েশার (রাঃ) মাতা স্বামী হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে বলিলেন, আমাদের আয়েশা (রাঃ) তো এখন একটু বড়ই হইয়াছে। এখন তাঁহার রুসুমাত করা দরকার। হযরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, তাহা তো অবশ্যই। এ কথাটি আমিও ভাবিতেছিলাম। এ সময় হযরত আয়েশার (রাঃ) বয়স ছিল অধিকাংশের মতে চৌদ্দ বৎসর।

হযরত আবুবকর (রাঃ) একদা হুযুরে পাক (সঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া বিষয়টি তাঁহার নিকট উত্থাপন করিলেন। কিন্তু তখন হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট হযরত আয়েশার (রাঃ) মোহরানার পাঁচশত দেরহাম না থাকায় তিনি এ ব্যাপারে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট একটু সময় চাহিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে পাঁচশত দেরহাম কর্জ দিতে রাজী হইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার নিকট হইতে পাঁচশত দেরহাম ধার গ্রহণ করিয়া উহা দেন-মোহর বাবত হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর উভয় পক্ষের মতানুযায়ী দ্বিতীয় হিজরী সনের একুশে শাওয়াল তারিখে রুসুমাতের দিন নির্ধারিত হইল।

মদীনার মুসলমানদের ঘরে ঘরে রুসুমাতের কথা প্রচারিত হইয়া গেল। নির্দিষ্ট তারিখে মুহাজির ও আনসারগণ হুযুর পাক (সঃ)-কে লইয়া হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়া পরম খুশীতে জামাতাকে মেহমানদেরসহ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া স্বীয় গৃহে তুলিয়া লইলেন। অতঃপর সবার জন্য নিরাড়ম্বর খানা-পিনার ব্যবস্থা করিলেন। ওদিকে আনসার ও মুহাজির মহিলাগণ হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে নববধূ বেশে সজ্জিত করিলেন।

অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ) জামাতা হযরত রাসূলে পাক (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত লোকজন সানন্দে মারহাবা ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়া উঠিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে পূর্বেই অপরূপ বেশে

সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। এইবার হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নির্দেশে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা আসমা (রাঃ) অগ্রসর হইয়া হুযুরে পাক (সঃ)-কে হযরত আয়েশার (রাঃ) পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। তারপর হযরত আয়েশার (রাঃ) মাতা উম্মে রাওমান (রাঃ) আসিয়া কন্যা আয়েশার (রাঃ) একখানা হাত রাসূলুল্লাহর (সঃ) হাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এইভাবে অনাড়ম্বর এবং একান্ত শান্ত পরিবেশে রুসুমাত অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল।

রুসুমাত অনুষ্ঠানের পর শাওয়াল মাসেরই কোন একদিন হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বিবি আয়েশা (রাঃ)-কে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে নিয়া স্বগৃহে উপনীত হইলে হযরত সাওদা (রাঃ) অন্যান্য মহিলাগণকে লইয়া তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনায় গৃহে বরণ করিয়া নিলেন।

একটি বিষয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও না করিয়া পারিতেছি না। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব দুই জগতের শাহানশাহ হযরত রাসূলে পাক (সঃ)-এর পারিবারিক অসচ্ছলতার রূপটি তখন এমনই ছিল যে, আজ এই এমন খুশীর দিনে তাঁহার গৃহে খাইবার মত শুধু এক পেয়ালা দুধ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাহাও জনৈক সাহাবী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হযরত সাওদা (রাঃ) উক্ত দুধ পেয়ালাই আনিয়া হুযুরে পাক (সঃ) এবং হযরত আয়েশার (রাঃ) সম্মুখে রাখিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) উহা হইতে এক চুমুক দুধ পান করিয়া পিয়ালাটি হযরত আয়েশার (রাঃ) হাতে দিলেন। নব বধূ আয়েশা (রাঃ) লজ্জাবশতঃ উহা পান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। হযরত আসমা (রাঃ) অদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দিয়াছেন, পান করিয়া ফেল। তখন আসমার কথায় আয়েশা (রাঃ) কতটুকু দুধ পান করিলেন এবং কতটুকু রাখিয়া দিলেন। হুযুর (সঃ) তখন আসমা (রাঃ)-কে বলিলেন, এটুকু আপনার জন্য রাখা হইয়াছে। অতএব আপনি খাইয়া ফেলুন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর শিক্ষার পরিপূর্ণতা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বাল্য জীবনে কিভাবে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। হযরত আবুবকর (রাঃ) ও উম্মে রাওমানের মত পিতা-মাতার যত্নে ও আগ্রহে তিনি বাল্য জীবনে অনেক কিছুই লাভ করিয়াছিলেন। তবু এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার সাধনালব্ধ যে অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার ও শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা সারা জগতের মুসলিমগণকে জ্ঞানালোক দান করিয়াছিলেন সেই শিক্ষা ও জ্ঞানের তুলনায় বাল্য শিক্ষা ছিল কেবল তাঁহার সূচনা মাত্র। তাঁহার ব্যাপকতর ও উচ্চতর শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ হয় বিবাহের পর স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর গৃহে। এলমের সমুদ্র ও জ্ঞানের সম্রাট খোদ হযরত রাসূলে পাক (সঃ) ছিলেন তাঁহার প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষক।

বস্তুতঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) যে তৎকালীন যুগে শুধু নারীদের মাঝেই নয়, বরং আরবের খ্যাতনামা শিক্ষিত পুরুষ সাহাবীদের অপেক্ষাও উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন তাহা ঐতিহাসিকদের দ্বারা স্বীকৃত সত্য।

বিভিন্ন জীবনীকারের মতে হযরত আয়েশা (রাঃ) যে শুধু অন্যান্য নবী-মহিষীদের অপেক্ষাই বেশী বিদ্বান ও জ্ঞানী ছিলেন তাহাই নহে; বরং বিশিষ্ট কয়েকজন ছাড়া

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পুরুষ বা রমণী সকল সাহাবীর মধ্যেই তিনি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা সকলেরই দ্বারা স্বীকৃত।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন, এমন কোন কঠিন মাসয়ালা আমরা পাই নাই যাহা হযরত আয়েশার (রাঃ) দ্বারা মীমাংসিত হয় নাই।

ইমাম যাহরী বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) অন্যান্য সবার অপেক্ষা শিক্ষিত ও বিজ্ঞতমা ছিলেন। বিশিষ্ট সাহাবীগণও তাঁহার নিকট বিভিন্ন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহার নিকট সন্তোষজনক উত্তর পাইতেন। ইমাম যাহরী (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি সমস্ত লোকের এবং অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের বিদ্যা-বুদ্ধি একত্রিত করা হয় তবুও হযরত আয়েশার (রাঃ) বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা বেশী বিস্তৃত মনে হইবে।

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত আবু আসমা ইবনে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন যে, সুন্নাতে রাসূল, ফিকাহ শাস্ত্র এবং কোরআনে পাকের শানে নযুল বর্ণনা ও কোরআনে পাকের ব্যাখ্যায় হযরত আয়েশার (রাঃ) মত বিজ্ঞ আর কাহাকেও দেখি নাই।

সুবিখ্যাত তাবেয়ী উরওয়া ইবনে জোবায়ের বলেন, কোরআনের ব্যাখ্যা, এলমে ফারায়েজ, হালাল-হারাম, ফিকাহ শাস্ত্র, আরবী সাহিত্য, কাব্য, চিকিৎসা শাস্ত্র, আরব জাতি ও কবিলাসমূহের ইতিহাস এবং বংশ পরিচয়ে হযরত আয়েশার (রাঃ)) মত জ্ঞানী আর কাহাকেও দেখা যায় নাই।

মাহমুদ ইবনে লবীদ বলেন, উম্মুহাতুল মু'মিনীনগণ সকলেই হুযুরে পাক (সঃ)-এর হাদীস মুখস্থ করিতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাহাদের কেহই উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশার (রাঃ) ও হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

হযরত আয়েশার (রাঃ) শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধি বহু বিস্তৃত। বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তবু একথা সত্য যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মহান কোরআনে পাকের শিক্ষাই ছিল আসল শিক্ষা। আরবে তখন পর্যন্ত মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন হয় নাই। হস্ত লিখিত কোরআন শরীফই তখন পাঠ করা হইত। হযরত আয়েশা (রাঃ) হস্তলিখিত কোরআন শরীফ তিনি পাঠ করিতেন, জাকওয়ান নামক সেই সাহাবীর হস্তাক্ষর অত্যন্ত সুন্দর ছিল। এই ব্যক্তি প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) ইহার ক্রীতদাসত্ব মোচন করাইয়া নিজের আশ্রয়েই রাখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই লোকের কাছেই তিনি লিখা শিখিয়াছিলেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মতে তাঁহার হস্তাক্ষরও অত্যন্ত সুন্দর ছিল।

হযরত আয়েশার (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট হইতে দৈনন্দিন কোন নির্দিষ্ট সময়ে ধরা-বাঁধা নিয়মে এলেম শিক্ষা করেন নাই বরং হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট হইতে বিভিন্ন সময়ের উপদেশ, কথাবার্তা, কার্যকলাপ, চাল-চলন ও আচরণাদি প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া-শুনিয়া ও তাঁহার একান্ত নিবিড় সাহচর্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি সর্ববিষয়ে ব্যাপকতর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ) যখন মসজিদে নববীতে সাহাবীদের সমাবেশে কোন বিষয়ে উপদেশ দান ও আলোচনা করিতেন, মসজিদ সংলগ্ন গৃহের ভিতর থাকিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহা অতি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন। কখনও কখনও কোন কথা ভালরূপে শুনিতে না পাইলে বা কোন অস্পষ্ট ব্যাখ্যা বুঝিতে না পারিলে হযরত রাসূলে পাক (সঃ) গৃহে আসার পর তাঁহার নিকট হইতে ভালরূপে শুনিয়া ও বুঝিয়া

লইতেন। তিনি স্বীয় জ্ঞানের পিপাসা নিবৃত্ত করিতে হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট যখন তখন যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন। এমনকি কখনও কোন কারণবশতঃ হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিরস বদন বা ব্যস্ততা ও অস্থিরতা দেখা গেলে তদবস্থায়ও তাঁহার নিকট হইতে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে পিছুপা হইতেন না। হুযুরে পাক (সঃ)-ও ইহাতে তাঁহার উপর বিরক্ত বা রুষ্ট না হইয়া বরং তাঁহার জ্ঞান আহরণের আগ্রহের প্রাবল্য দেখিয়া তাঁহার উপর খুশী হইতেন।

কেহ কেহ বলেন যে, কোরআনে পাকের নিম্নোক্ত আয়াতটিই হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জ্ঞান অর্জনের প্রতি এত বেশী উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আয়াতটির মর্মার্থ এই ঃ

হে নবী সহধর্মিণীগণ! আপনাদের গৃহে যে সকল সত্যজ্ঞান এবং আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ—যাহা পঠিত হয় তাহা আয়ত্ত করুন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কোমল ও জ্ঞান বিজ্ঞানময়।

দোজাহানের সেরা শিক্ষক হযরত রাসূলে পাক (সঃ)-এর নিকট হইতে হযরত আয়েশা (রাঃ) জাহেরী-বাতেনী এলেমসমূহ তথা শরীয়ত ও মারেফাত তথা পার্থিব এবং জাগতিক অন্যান্য এলেমসমূহও কিছু না কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, আর এই কারণেই তৎকালীন লোকগণ তাঁহাকে আকায়েদ, মারেফাত, নীতিশাস্ত্র, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, শাসনতন্ত্র, প্রকৃতিতত্ত্ব, রসায়ন, দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্র, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন জানিয়া সমসাময়িক যুগের সেরা শিক্ষয়িত্রীর মর্যাদা দান করিতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) জ্ঞান তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিতে গিয়া যখন তিনি কোরআন পাঠে লিপ্ত হইতেন, তখন কোন দুর্বোধ্য কিংবা তাৎপর্যবহ অর্থবোধক আয়াত সামনে পড়িলে তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া কিংবা হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট হইতে উহার ব্যাখ্যা জানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি লাভ করিতেন না। তাঁহার এই অবস্থাটার কয়েকটি নজির উল্লেখ করিতেছি ঃ

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজের কক্ষে বসিয়া কোরআনে পাকের এই আয়াত শরীফ পাঠ করিতেছিলেন ঃ

'আল্লাযীনা ইয়ুতুনা মা আতাও অকুলুবুহুম অজ্বিলাতুন আন্নাহুম ইলা রাব্বিহিম রাজিউন।'

অর্থ ঃ এবং তাহারাই—যাহারা যাহা কিছু দান করে, আর যাহাদের মন ভীতিগ্রস্ত নিঃসন্দেহে তাহারাই তাহাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনশীল।

এই আয়াত শরীফ পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও কথাটার মর্মোদ্ধার করিতে অপারগ হইয়া তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ) আয়াতের প্রকাশ্য অর্থতো বুঝা যাইতেছে—চোর, ডাকাত, শরাবী, দুরাচার, যেই হোক না কেন, অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকিলেই মুক্তিলাভ করিবে।

আর একদিন তিনি নিম্নলিখিত আয়াত শরীফদ্বয় পাঠ করিতেছিলেন ঃ

(১) "যেদিন আসমান যমিন অন্য একরূপ পরিগ্রহ করিবে। তখন সৃষ্টজীবনসমূহ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে।

(২) রোজ কিয়ামতে সমগ্র জগত তাঁহার মুঠার মধ্যে এবং সৌরজগত তাহার দক্ষিণ হস্তে লেপ্টান থাকিবে।

উক্ত আয়াত দুইটি পাঠ করিয়া জ্ঞানপিপাসু আয়েশার (রাঃ) মনে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগিল। তিনি রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! রোজ কিয়ামতে তো আসমান যমিন, ঊর্ধ্বঃ, অধঃ, গ্রহ, উপগ্রহ কিছুই থাকিবে না। তবে এমনি অবস্থায় লোকজন কোথায় দাঁড়াইবে?

হুযুরে পাক (সঃ) জবাবে বলিলেন, লোকজন পুল সিরাতের উপর দাঁড়াইবে।

কোরআনে পাকে পাড়া-প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর লওয়া ও তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করা সম্পর্কে কতিপয় আয়াত আছে। তাহা পাঠ করিয়া হঠাৎ হযরত আয়েশার (রাঃ) মনে একটি প্রশ্ন জাগিল, তারপর যথাসময়ে তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর কাছে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! কাহারও প্রতিবেশী যদি একাধিক থাকে তবে কাহাকে বেশী সাহায্য করিতে হইবে?

হুযুরে পাক (সঃ) জবাব দিলেন, যাহার গৃহ নিজের গৃহের বেশী নিকটে তাহাকে বেশী সাহায্য করিবে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! এবার লক্ষ্য করুন, হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর কথাবার্তা, কার্যকলাপ এবং উপদেশাদির মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষালাভ করিতেন।

একদা হুযুরে পাক (সঃ) এরশাদ করিলেন, আল্লাহর রহমত তথা অনুগ্রহ ব্যতীত শুধু নিজের আমল দ্বারা কেহই বেহেশতে যাইতে পারিবে না। একথা শুনিয়া বিবি আয়েশা (রাঃ) মনে করিলেন, ইহা সম্ভবতঃ পাপীদের ব্যাপারে বলা হইতেছে। তবে মনের সন্দেহ ভঞ্জন মানসে তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আপনিতো সম্পূর্ণ মাসুম (বেগুনাহ্) ব্যক্তি। আপনারও কি এই অবস্থা? হুযুরে পাক (সঃ) জবাব দিলেন, হাঁ, আমিও আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর রহমত ছাড়া আমারও মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়।

একদা হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলিলেন, যাহারা আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাত লাভ পছন্দ করে আল্লাহ তায়ালাও তাহাদের সহিত সাক্ষাত দান পছন্দ করেন। শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! (তবু) আমরা তো কেহই তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করি না।

হযরত আয়েশার (রাঃ) কথা শুনিয়া হুযুরে পাক (সঃ) মৃদুহাস্যে বলিলেন, এই কথার তাৎপর্য হইল, মুমিন বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অসীম করুণা ও অনুগ্রহের কথা এবং বেহেশত প্রভৃতির সুসংবাদের কথা শ্রবণ করিয়া খুশীতে তাহাদের মন আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাত লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে ও আনন্দে চঞ্চল হইয়া পড়ে। তখন আল্লাহ তাঁহাদের প্রিয় বান্দার সহিত সাক্ষাত দান পছন্দ করেন। কিন্তু বিধর্মী কাফিরদের অবস্থা এইরূপ নয়। তাহারা আল্লাহর সহিত সাক্ষাত লাভ অপছন্দ করে, আর আল্লাহও তাঁহার এই অবাধ্য বান্দার সহিত সাক্ষাত দান পছন্দ করেন না।

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট জিহাদ সম্পর্কিত মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, জিহাদ, মুসলমানদের প্রতি ফরজ হইলেও উহা মহিলাদের উপর নহে। হজ্জ আদায় করিলেই মহিলাদের জিহাদের ছওয়াব মিলিয়া যায়।

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! বিবাহকালে কন্যার কাছে মতামত গ্রহণ করাতো অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু নাবালেগা কন্যারা তো চুপ করিয়াই থাকে। তাহাদের মতামত বুঝিবার উপায় কি?

হুযুরে পাক (সঃ) জবাব দিলেন, হাঁ, কন্যাদের মতামত লওয়া অবশ্য কর্তব্য হইলেও কুমারী কন্যাদের বেলায় তাহাদের নীরব থাকাই সম্মতির লক্ষণ।

একদা হযরত আয়েশার (রাঃ) রেজায়ী (দুধ সম্পর্কিত) চাচা তাঁহার খবর জানার উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে সাক্ষাত করার জন্য গৃহে সংবাদ পাঠাইলেন। এ সময় হুযুরে পাক (সঃ) কোন কার্যোপলক্ষে বাহিরে ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) উক্ত লোকটির সহিত সাক্ষাত করিলেন না। যেহেতু তাঁহার ধারণা ছিল যে, লোকটি গায়ের মাহরাম অর্থাৎ তাহার সহিত সাক্ষাত করা সিদ্ধ নয়। কিছুক্ষণ পরে হুযুরে পাক (সঃ) গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আমি যাহার স্তনধৃর দুধ পান করিয়াছি এইরূপ রেজায়ী চাচার সহিত সাক্ষাত করিতে পারি কি না?

হুযুরে পাক (সঃ) জবাব দিলেন, হাঁ, সাক্ষাত করিতে পার। যেহেতু রেজায়ী চাচা মাহরাম লোকদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমার চাচাকে গৃহে ডাকিয়া পাঠাও।

এইভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) অগণিত দ্বীনী মাসয়ালা সম্পর্কে হুযুর (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, অবস্থাভেদে অনুরোধ ও অবস্থাভেদে কিছুটা বিতর্ক বা কথা কাটাকাটি করিয়াও হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া সঠিক তথ্য দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

কেবলমাত্র মাসয়ালা-মাসায়েলই নয়; বরং চারিত্রিক ও নৈতিক বিষয়াদিও তিনি হুযুরে পাক (সঃ) হইতে এইভাবে সদা-সর্বদা নানারূপ উপদেশ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে শিক্ষার্জন করিয়াছেন। নিম্নে তাহারও কতক নজির উল্লেখ করিতেছি।

একদা গভীর রাত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ) নিদ্রা হইতে জাগিয়া দেখিলেন, হুযুরে পাক (সঃ) ইবাদতে মগ্ন। একটু পরেই তিনি মুনাজাত শুরু করিলেন ঃ

হে মাবুদ! আপনি আমাকে গরীব রাখুন। গরীবী অবস্থায়ই মৃত্যুদান করুন এবং গরীবের সাথেই আমাকে কবর হইতে উঠাইয়া হাশর করান।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর মুনাজাত সবই শুনিলেন। মুনাজাত শেষ হওয়ার পরে তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আপনি এইরূপ মুনাজত কেন করিলেন? হুযুরে পাক (সঃ) জবাব দিলেন, গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তি ধনী লোকদের চল্লিশ বৎসর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আয়েশা! তুমি কখনও নিঃস্ব মুসাফিরকে খালি হাতে ফিরাইয়া দিও না। অন্ততঃ একটি খুরমা দান করিও। দুঃখী-দরিদ্রকে স্নেহ করিও এবং নিজের কাছে বসিতে দিও।

একদা হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহ দরজায় এক মুসাফির আসিয়া প্রার্থনা জানাইল, মা আমাকে কিছু দান করুন। হযরত আশেয়া (রাঃ) স্বীয় পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে তখন তাহাকে কিছু দান করিয়া বিদায় করিল।

হুযুরে পাক (সঃ) বিবি আয়েশার (রাঃ) ব্যাপারটি লক্ষ্য করিলেন। তারপর তাঁহাকে বলিলেন, আয়েশা! কোন সময় কাহাকেও এইরূপ হিসাব করিয়া অর্থাৎ গণিয়া দান করিবে না। কারণ তাহা হইলে আল্লাহও তোমাকে গণিয়া হিসাব করিয়া উহার পুণ্য দান করিবেন।

একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) রুটি তৈরী করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। হযরত রাসূলে পাক (সঃ) তাঁহাকে এমতাবস্থায় দেখিতে পাইয়া নিজেও নামাজ পড়িতে শুরু করিলেন। ইতোমধ্যে প্রতিবেশীর একটি বকরী আসিয়া তৈরী রুটি খাইতে আরম্ভ করিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং

বকরীটিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। তখন হুযুরে পাক (সঃ) তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, আয়েশা ! প্রতিবেশীকে যে কোন রকম কষ্ট দেওয়া উচিত নহে।

একদা এক এহুদী ব্যক্তি হুযুর পাক (সঃ)-কে দেখিয়া আসসামু আলাইকুম (যাহার অর্থ তোমার মৃত্যু হইক) বলিল। কিন্তু হুযুরে পাক (সঃ) কোনরূপ ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে জবাব দিলেন, আলাকুম। এ সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) নিকটেই ছিলেন। তিনি এহুদীর এই স্পর্ধাপূর্ণ বেআদবী দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, অ আলাইকুমুস সামু অল্লা'নাতু (অর্থাৎ তোমার প্রতি মৃত্যু ও অভিসম্পাত আসুক)।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এই উক্তি শুনিয়া রাসূলে করীম (সঃ) বলিলেন, আয়েশা! আমাদের বিনয়ী হওয়া আবশ্যক। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সর্বদাই বিনয়-নম্রতা পছন্দ করেন। নম্র ব্যবহারে যে কাজ সাধন হয়, শক্ত কথায় তাহা কখনও হয় না।

একদা হযরত আয়েশার (রাঃ) কিছু মাল-পত্র চুরি হইয়া গেল। হযরত আয়েশা (রাঃ) চোরকে উপলক্ষ করিয়া কটু ভাষণ প্রয়োগ শুরু করিলেন। তখন হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বুঝাইয়া বলিলেন, আয়েশা! এইরূপ কটুক্তি দ্বারা নিজের পুণ্য ও উহার পাপ লাঘব করিও না।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিবিগণের মধ্যে হযরত সুফিয়া (রাঃ) রন্ধন কার্যে অন্যান্যদের অপেক্ষা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে, হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন সর্বাধিক অযোগ্য। একদা হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে হযরত সুফিয়ার রন্ধন কার্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আপনি বিরত হউন। সে তো একটি ক্ষুদ্রাকৃতি বামুন মেয়ে ছাড়া আর কিছু নয়। হযরত আয়েশার (রাঃ) কথা শুনিয়া হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলিলেন, আয়েশা! এমন ধরনের কথা বলা মোটেই ঠিক নয়। উহা সমুদ্রে ছুঁড়িয়া মার। জানিয়া রাখ পরনিন্দা খুবই তিক্ত জিনিস। আর সমুদ্রের পানি লবণাক্ত। হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর এই উপদেশ শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন।

একদা হুযুরে পাক (সঃ) উপদেশ দানকালে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ব্যতীত কেবল নিজের আমল দ্বারা কেহই বেহেশতে যাইতে পারিবে না। হুযুরে পাক (সঃ)-এর একথা শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) মনে করিলেন যে, সম্ভবতঃ পাপীদের সম্পর্কে উহা বলা হইতেছে। তবে এ ব্যাপারে স্বীয় মনের সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আপনিতো একেবারেই মাছুম (বেগুনাহ) ব্যক্তি! আপনাকেও কি আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভর করিতে হইবে? হুযুরে পাক (সঃ) জবাব দিলেন, হাঁ আয়েশা! আমিও তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া আছি। (অর্থাৎ আল্লাহর রহমত আমাকে ঘিরিয়া না থাকিলে মুক্তিলাভ করা আমার পক্ষেও অসম্ভব)।

খায়বর যুদ্ধাভিযানে হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহগামিনী হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে একই উষ্ট্র হাওদাতে সমাসীন ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) কোন কারণবশতঃ উষ্ট্রকে মালউন (অভিশপ্ত) বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) তাহা শুনিয়া বলিলেন, এইরূপ উক্তি করা তাঁহার ঠিক হয় নাই। কেননা হুযুরে পাক (সঃ)-এর ছোহবতে কোন মালউন থাকিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) তখনই তওবা করিলেন।

একদা হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) হাতে স্বর্ণের কাঁকন দেখিয়া তাঁহাকে কোমল কণ্ঠে বলিলেন, আয়েশা! তোমাকে একটি উত্তম উপদেশ দেই। তুমি চাঁদির কাঁকন গড়াইয়া উহার উপরে জাফরানী (লাল) রং দিলে খুব সুন্দর দেখাইবে। শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তবে চাঁদির উপরে সামান্য স্বর্ণের লেপ দিয়া তাহার উপরে লাল রং দিব কি?

ইহার জবাবে হুযুরে পাক (সঃ) এরশাদ করিলেন, না, চাঁদির উপরে সামান্য লাল রং দিবে মাত্র। হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে উহা ছাড়া আরও পাঁচটি বস্তু ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

যথা ঃ (১) রেশমী পোশাক, (২) স্বর্ণের পাত্র, (৩) স্বর্ণের অলঙ্কার, (৪) চাঁদির পাত্র এবং (৫) গাঢ় লাল রং।

উক্ত বস্তুসমূহের মধ্যে রেশমী বস্ত্র এবং স্বর্ণালঙ্কার নারীদের জন্য শরীয়তে নিষিদ্ধ না হইলেও উহাদ্বারা ভোগ-বিলাসিতা প্রকাশ পায় বলিয়া হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

এইভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট হইতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ক উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া, তাঁহার আদর্শ, কার্যকলাপ ও আচরণাদি প্রত্যক্ষ করিয়া এবং আদর্শ মানবরূপে গণ্য হওয়ার যাবতীয় বিষয়বস্তুগুলি নানাভাবে দেখিয়া ও শুনিয়া শিখিয়া লইয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বীয় শিক্ষার পরিপূর্ণতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাহাছাড়া তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট হইতে জগতের মানবজাতির ইতিহাস এবং নবী-রাসূলদিগের বৃত্তান্ত ও ঘটনাবলী শ্রবণ করতঃ তাহা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিয়াছিলেন। উপরন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানও তিনি খোদ হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রেও হযরত আয়েশা (রাঃ) জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন। হযরত রাসূলে পাক (সঃ)-এর অসুখের কালে ও অন্যান্য সময়ে গৃহে আগত চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়াদি শ্রবণ করিয়া বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহর (সঃ) রোগশয্যায় শায়িতকালীন তাঁহার চিকিৎসার্থে আগত বিজ্ঞ ডাক্তার, কবিরাজ, হাকীম ও অন্যান্য শ্রেণীর চিকিৎসকদের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধপত্র নিজ হাতে তৈরী করিয়া আয়েশা (রাঃ) চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রের বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি জন্মসূত্রেই বিশেষ প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন বলিয়া এইরূপ বিভিন্নমুখী জ্ঞানার্জন করিতে তাঁহাকে মোটেই বেগ পাইতে হয় নাই।

স্বামী হুযুর (সঃ)-এর সাথে পারিবারিক জীবন

হযরত আবুবকর (রাঃ) মক্কার বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী এবং সচ্ছল জীবনের অধিকারী ছিলেন। সে হিসাবে তাঁহার আদরের দুলালী হযরত আয়েশা (রাঃ) শৈশব এবং কৈশোর পিতৃগৃহে যথেষ্ট আরাম-আয়েশ এবং সচ্ছলতার মধ্যেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অভাব-অনটন কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। অভাবের প্রথম পরিচয় তিনি লাভ করেন দরিদ্র স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর গৃহে আগমন করার পর। প্রথম স্বামীগৃহে যে দিন তিনি আগমন করিলেন, সেইদিন সে গৃহে খাইবার মত ছিল মাত্র একটি গ্লাস দুধ। আর কিছু নহে। তাহাও ছিল জনৈক সাহাবী কর্তৃক হাদিয়াস্বরূপ

প্রেরিত। এ ঘটনাটি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নবীগৃহে শুধু খাওয়া পরারই অভাব নয় অভাবের প্রকট রূপটি পরিস্ফুটিত ছিল প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। নবীর (সঃ) যে গৃহখানিতে তাঁহাকে থাকিতে দিয়াছিল তাহা ছিল এইরূপ ঃ

গৃহখানি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছিল মাত্র সাত হাত করিয়া। উচ্চতায় ছিল এইরূপ যে, কেহ মেঝের উপর দাঁড়াইয়া হাত দ্বারা উহার ছাদের নাগাল পাইত। গৃহের প্রাচীর নির্মিত ছিল মাটির দ্বারা আর উহার ছাদ নির্মাণ করা হইয়াছিল খোরমা-খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষের ডাল-পালা দিয়া। বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টির পানি হইতে বাঁচার জন্য ছাদের উপরে মোটা কম্বল বিছাইয়া দেওয়া হইত। গৃহের দরজা ছিল মাত্র একটি। একখানি কাঁঠের তক্তা ছিল উহার কপাট। দরজাটি প্রায়ই উন্মুক্ত থাকিত। অবশ্য উহাতে সদা-সর্বদা একখানা পর্দা লটকানো থাকিত।

মসজিদে নববীর ঠিক পূর্ব দরজার সংলগ্ন ছিল হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহখানা। গৃহখানার ছোট একটা দরজা অবশ্য মসজিদের দিকেও ছিল। হুযুরে পাক (সঃ) ঐ দরজা দিয়াই মসজিদে গমনাগমন করিতেন।

গৃহ মধ্যে তেমন কোন সরঞ্জামাদিই দেখা যাইত না। উহার শূন্যাবস্থা দেখিয়া সহজেই অত্যন্ত দরিদ্রের গৃহ বলিয়া মনে করা যাইত। উক্ত গৃহখানা সংলগ্ন আর একখানা ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ ছিল। উহাকে মাশবারা বলা হইত। ঐ গৃহ খানায়ও তেমন কোন মালামাল ছিল না। ছিল কেবলমাত্র একখানা খাট, একটাই চাদর, খুরমা বৃক্ষের বাকলের তৈরী একটি তাকিয়া, খেজুর বা আটা-ময়দা রাখার উপযোগী দুইটি মটকি আর একটি কলসী ও একটি পেয়ালা।

এই গৃহের অধিবাসী ছিলেন শুধু হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) প্রতি নয়দিনে দুইদিন করিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এই গৃহে অবস্থান করিতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সহিত নানা সুখে-দুখে পারিবারিক জীবনযাপন করিতেন।

সত্যি বলিতে কি একদিকে তাহাদের সুখ ও শান্তির অন্ত ছিল না। যেহেতু গভীর প্রেম ও ভালবাসা তাঁহাদের ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। তদুপরি তাঁহারা পার্থিব দুনিয়াতে অবস্থান করিলেও অপার্থিব দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণাই তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কাজেই পার্থিব দুনিয়ার বাস করিয়াও তাঁহারা সর্বদাই অপার্থিব স্বর্গ সুখের স্বাদ উপভোগ করিতেন।

পক্ষান্তরে, বাহ্যতঃ দুঃখ-ক্লেশেরও সীমা ছিল না। অবশ্য একথা সত্য যে, আমরা আমাদের বিবেচনায় যাহাকে দুঃখ-ক্লেশ বলিয়া মনে করি, তাঁহারা তাহাতে মোটেই ব্যথিত হন নাই এবং দুঃখজনক বলিয়া মনে করেন নাই।

তবে বলিতে কি, কখনও কখনও নবী গৃহের অভাব এমন পর্যায়ে উপনীত হইত যে, একাধারে তিন-চারি দিন পর্যন্ত তাঁহাদের তৃপ্তির উপযুক্ত পরিমাণ খানাও জুটিত না। মাঝে মাঝে পাকাইয়া খাইবার উপযোগী খানার অভাবে একাধারে মাসাধিক কাল পর্যন্ত চুলায় আগুনই জ্বলিত না। মাঝে মাঝে সাহাবীদের প্রেরিত খাদ্য-সামগ্রীর দ্বারাই তাঁহাদের দিন চলিয়া যাইত।

অবশ্য একথা সত্য যে, অনেক সময় বিভিন্ন দেশের রাজ রাজন্য ও আমীর-ওমরাগণ হুযুরে পাক (সঃ)-এর দরবারে বহু মূল্যবান সম্পদ ও অজস্র পরিমাণ মাল-দৌলত হাদিয়া উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিতেন। কিন্তু হুযুরে পাক (সঃ) স্বীয় পারিবারিক খরচ বাবত তাহা হইতে কিছুই নিতেন না; বরং সাথে সাথে উহা বাইতুল মালের তহবিলে জমা দিয়া দিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও ইহাতে এতটুকু মাত্র দ্বিধান্বিত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। বস্তুতঃপক্ষে হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত এক অপূর্ব নেয়ামত এবং রহমতস্বরূপ ছিলেন। দুঃখে-সুখে তিনি তাঁহার জন্য ছিলেন প্রকৃত ও প্রধান বান্ধবী সদৃশ। শোকে ও বিষাদে ছিলেন শান্তি, সেবা ও যত্নের ক্ষেত্রে আত্মত্যাগিনী দাসী। এক কথায় বলা চলে, হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর জীবনে আরাম এবং শান্তি।

একাধারে নয়টি বৎসর হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বীয় স্বামী হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর জীবন সঙ্গিনীরূপে তাঁহার সাহচর্য লাভে ধন্য ছিলেন। জীবনে এই পর্যায়টিতে একদিকে যেমন তিনি প্রিয়তম স্বামীর অপরিসীম স্নেহ-ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতিতে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন, অপরদিকে তিনিও তাঁহার হৃদয়ের গভীর প্রেমের অর্ঘ্য প্রিয়তম স্বামীর চরণে নিঃশেষে অর্পণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ নবী দম্পতিটি পরস্পরের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, সুখে-দুঃখে অংশ গ্রহণ, সেবা, স্নেহ, সহানুভূতি এবং ধৈর্য ও সহ্য শক্তির মধ্য দিয়া যে পারিবারিক জীবনের নিখুঁত ও মহান আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ইহার নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে মিলে না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে যে কত বেশী ও গভীরভাবে মহব্বত করিতেন নিম্নোক্ত দুই একটি ঘটনার মাধ্যমেই তাহা উপলব্ধি করা যাইবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) যেহেতু বিবাহের পরও কিছুদিন পর্যন্ত অল্প বয়স্কা বালিকা ছিলেন। কাজেই তাঁহার মন খুশী করার জন্য হুযুরে পাক (সঃ) অনেক সময়ই তাঁহার সহিত পবিত্র আনন্দ এবং নির্দোষ কৌতুকে রত হইতেন। অনেক সময় নবীজীকে (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে দৌড়ের পাল্লা দিতেন। তাহাতে কখনও বা হুযুরে পাক (সঃ) জয়লাভ করিতেন কখনও বা আবার আয়েশা (রাঃ) জিতিয়া যাইতেন। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে ইচ্ছাকৃতভাবেই এরূপ পরাজয় বরণ করিতেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর আন্তরিক মহব্বত ও আকর্ষণের প্রকৃত পরিচয় ইহাই।

একবারকার একটি ঘটনা, হুযুর পাক (সঃ) মালাসেল-এর জিহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। এবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও হুযুরে (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। ঘটনা ঘটিল এইরূপ ঃ হযরত আয়েশার (রাঃ) হাওদাটি উষ্ট্র পৃষ্ঠে উঠাইয়া দিবার সাথে সাথে উষ্ট্রটি এমন দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিল যে, মুহূর্ত মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে পিঠে লইয়া সকলের চোখের আড়াল হইয়া গেল। এ অতর্কিত ঘটনায় হুযুরে পাক (সঃ) এত বেশী বিচলিত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি ছোট বালকের ন্যায় বার বার বলিতে লাগিলেন, হায়! হায়! প্রিয়া আয়েশা না জানি উটের পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া গিয়া কতই আঘাত পাইয়া বসে। হায়রে তখন কি অবস্থাই না হইবে। আমি তাহার পিতা আবুবকর (রাঃ)-এর নিকটই বা কি বলিব?

একবার হুযুরে পাক (সঃ)-এর জনৈক প্রতিবেশী ইরানী মহিলা এক ভোজানুষ্ঠানে হুযুরে পাক (সঃ)-কে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু হুযুরে পাক (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে রাখিয়া একাকী দাওয়াতে যাইতে মন চাহিত না। তাই তিনি উক্ত মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিবি আয়েশা (রাঃ)-কে দাওয়াত করা হইয়াছে কি না? মহিলাটি বলিলেন, না। শুনিয়া হুযুরে পাক (সঃ) বলিলেন, তাহা হইলে আমি এ দাওয়াত গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। উক্ত মহিলা হুযুরে (সঃ)-কে খুব অনুরোধ করিলেন ঃ কিন্তু হুযুর (সঃ) কিছুতেই রাজী হইলেন না।

অতঃপর উক্ত ইরানী মহিলা হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত হযরত আয়েশা (রাঃ)-কেও দাওয়াত করিলেন। সাথে সাাথে হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহার দাওয়াত কবুল করিলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সহ যথাসময় গিয়া তাহা রক্ষা করিয়া আসিলেন।

কোন কোন অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ শ্রেণীর লোকেরা এইরূপ বলে ও মনে করিয়া থাকে যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ও হযরত আয়েশার (রাঃ) মধ্যে যে প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক, তাহা ছিল একান্তই এক পক্ষীয়। অর্থাৎ হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ছিলেন বেশী বয়সের লোক। পক্ষান্তরে, হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন হুযুরে পাক (সঃ)-এর পত্নীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ও সর্বাধিক সুন্দরী। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রেমে আত্মহারা ছিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশার (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রতি আকৃষ্ট হইবার কোন কথাই উঠে না। মূলতঃ এইরূপ ধারণা ও উক্তি একেবারেই অজ্ঞতা প্রসূত। তাহাছাড়া এই ধরনের কথা কোনক্রমেই কল্পনাও করা যায় না। যেহেতু অসংখ্য হাদীস মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রেমে নিজেকে একেবারে উজার করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-কে এত বেশী ভালবাসিতেন ও তাঁহাকে এমনভাবে একার করিয়া রাখিতে চাহিতেন যে, তাঁহার যবান হইতে অন্য যে কোন মহিলার প্রশংসা ও আলোচনা পর্যন্ত তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর মুখে হযরত খাদীজার (রাঃ) প্রশংসা শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুর (সঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া কিরূপ উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি।

তবে হুযুরে পাক (সঃ) অবশ্য হযরত আয়েশার (রাঃ) এ উক্তিকে প্রশ্রয় দান না করিয়া বরং বলিয়াছিলেন, আয়েশা! নিশ্চয়ই তুমি হযরত খাদীজার (রাঃ) সম্পর্কে অবগত নও, তাই এরূপ কথা বলিতে পারিলে। যদি তাঁহাকে জানিতে, তবে কিছুতেই এরূপ বলিতে না। হুযুরে পাক (সঃ)-এর কথায় হযরত আয়েশা (রাঃ) বিশেষভাবে লজ্জিত হইলেন এবং নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি মনে মনে তওবা করতঃ হযরত খাদীজার (রাঃ) প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতঃ তঁহার পবিত্র আত্মার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর ক্ষণকালের অদর্শন এবং বিচ্ছেদ যাতনাও সহ্য করিতে পারিতেন না। হুযুরে পাক (সঃ)-এর গৃহে যখন তাঁহার কয়েকজন পত্নী ছিলেন তখন সেরা ন্যায়-নিষ্ঠ নবী (সঃ) পালাক্রমে প্রতি সপ্তাহে দুইদিন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থান করিতেন। এ সময় রাত্রে যদি কিছুক্ষণের জন্যও হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বামী তাঁহার পার্শ্বে নাই বলিয়া অনুভব করিতেন, তবে

তিনি একেবারে বিচলিত হইয়া পড়িতেন এবং অন্ধকারের মধ্যেই তিনি তাঁহাকে হাতড়াইয়া খুঁজিতে থাকিতেন। একবার এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল।

একদা গভীর রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া গিয়া নামায পড়িতে শুরু করিলেন। ক্ষণকাল পরেই হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বামীর অনুপস্থিতি অনুভব করিয়া ব্যতিব্যস্ততার সাথে অন্ধকারের মধ্যেই স্বামীকে হাত বুলাইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। গৃহে আলো জ্বালাইবার ব্যবস্থা ছিল না। কোন দিকে না পাইয়া অবশেষে দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইবা মাত্র হযরতের পায়ের সহিত হস্ত স্পর্শ হইল। এ সময় হুযুরে পাক (সঃ) সিজদায় গিয়া গুনাহগার উম্মতের জন্য প্রার্থনায় মগ্ন হইয়াছিলেন।

আর এক রাত্রের ঘটনা, হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর বক্ষ সংলগ্ন হইয়া নিদ্রা মগ্ন হইলেন। শেষ রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন, হুযুরে পাক (সঃ) শয্যায় নাই। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে তালাশ করিতে লাগিলেন কিন্তু গৃহের কোথাও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। অবশেষে তিনি তাঁহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কিছু দূর গিয়া তিনি দেখিলেন, হুযুরে পাক (সঃ) কবরস্থানে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মৃতদের জন্য দোয়া করিতেছেন। এ ঘটনা দেখিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) নীরবে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। প্রত্যুষে রাত্রের ঘটনা তিনি হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে প্রকাশ করিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) শুনিয়া বলিলেন, তাই তো! রাত্রে আমি একবার অদূরেই কালো মত কি যেন দেখিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, তাহা তুমিই ছিলে।

ঠিক একইভাবে আর এক রাত্রে হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বামীর বাহির হওয়ার সাড়া পাইয়া চুপে উঠিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) কবর স্থানে পৌঁছিয়া মুনজাত শুরু করিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) অদূরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর হুযুর (সঃ) যখন গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহা বুঝিতে পারিয়া একরূপ ছুটিয়া গিয়া হুযুরে পাক (সঃ)-এর পূর্বেই গৃহে পৌঁছিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আয়েশা! এইরূপ সন্দেহপ্রবণতা কোনক্রমেই ভাল নয়। যেহেতু ইহা মানুষের আদর্শ চরিত্র গঠনের পরিপন্থী। হুযুরে পাক (সঃ)-এর কথা শ্রবণ করিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) নির্দ্বিধায় বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! নিশ্চয়ই আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি শয্যা হইতে উঠিয়া অন্য কোন বিবির গৃহে গমন করিতেছিলেন। তাই আমি ঐরূপ করিয়াছিলাম। আমার অপরাধ মার্জনা করুন।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর একটি অভ্যাস ছিল, মাঝে মাঝে তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে নানারূপ সরস গল্প শুনাইয়া তাঁহাদের মধুর সম্পর্ককে মধুরতর করিয়া তুলিতেন। জবাবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও তাঁহাকে সরস গল্প বলিয়া শুনাইতেন।

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) এমন একটি গল্প বলিলেন, যাহার সারমর্ম ছিল ঃ কতিপয় বিবাহিত মহিলার স্বামীরা সকলেই কোন না কোন একটি দোষে দোষী ছিল। কেবলমাত্র একটি মহিলার স্বামীর চরিত্রে কোনরূপ ত্রুটি ছিল না বরং সে তাহার

পত্নীকে খুব বেশী আদর-যত্ন করিত। গল্পটি শুনিয়া হুযুরে পাক (সঃ) সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, আয়েশা! তবে আমি তো তোমার উপাখ্যানের শেষোক্ত মহিলার স্বামীর অনুরূপ নিশ্চয়ই। কেননা আমিতো তোমাকে যথেষ্ট আদর-যত্ন ও স্নেহ-ভালবাসা দান করিতেছি।

নবী দম্পতির কথা-বার্তায় এই ধরনের আমোদ-প্রমোদ সুলভ রসালাপ প্রায়ই দেখা যাইত। ইহাতে তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রীতি বহুগুণে সরস হইত এবং বাড়িয়া যাইত।

স্বামী সেবা ও তাঁহার মনস্তুষ্টির দিকে হযরত আয়েশা (রা) যে কতদূর সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি দিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে নিম্নোক্ত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে।

একদা হযরত আয়েশার (রাঃ) জানুর উপরে রাসূলে পাক (সঃ) স্বীয় মস্তক স্থাপন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময় পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ) কন্যা আয়েশার (রাঃ) কোন একটি অপরাধের বিচার করিতে আসিয়া শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে এমন একটি মুষ্টাঘাত করিলেন যে, উহার ব্যথায় হযরত আয়েশা (রাঃ) একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহার জানুর উপর নিদ্রাভিভূত। সামান্য নড়া-চড়া করিলেও তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পারে। এইকথা মনে করিয়াই তিনি এতটুকু মাত্র হেলা-দুলা বা নড়া-চড়া করিলেন না।

একবার হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহার জনৈক সাহাবীর বিবাহের ভোজানুষ্ঠানের প্রয়োজন মনে করিলেন ঃ কিন্তু উক্ত সাহাবী ছিলেন একেবারেই নিঃস্ব এবং কপর্দকহীন। হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আয়েশার (রাঃ) গৃহে গিয়া তথা হইতে তরকারীর ঝুড়িটি নিয়া আস। বলাবাহুল্য সেদিন সেই গৃহের উক্ত ঝুড়িতে সামান্য তরকারী ছাড়া খাইবার মত আর কিছুই ছিল না। সাহাবীর হাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) নির্দ্বিধায় তাহা তুলিয়া দিলেন, তাহাতে এতটুকু মাত্র দ্বিরুক্তি করিলেন না। ঐদিন রাত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিতে হইল।

আর একদিন হুযুরে পাক (সঃ) কয়েকজন সাহাবীসহ হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে হাজির হইয়া বলিলেন, আয়েশা! আজ আমরা সবাই তোমার মেহমান, আমাদের খাবার যোগাড় কর। আয়েশার (রাঃ) গৃহে মেহমানদারী করার মত তেমন কিছুই ছিল না। সামান্য ভূষী এবং খুদ দ্বারা এক রকম খাবার তৈরী হইল। খুরমা দ্বারা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হইল। মেহমানগণ তৃপ্তি সহকারে তাহাই আহার করিলেন। অতঃপর হুযুরে পাক (সঃ) বলিলেন, আয়েশা! এবার আমাদের জন্য পানীয়ের ব্যবস্থা কর। হযরত আয়েশা (রাঃ) সাথে সাথে এক পেয়ালা দুধ ও পানি আনিয়া তাঁহাদের সম্মুখে পেশ করিলেন। তাঁহারা তাহা সবটুকুই পান করিলেন, হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে আর কিছুই রহিল না। অতএব হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সেদিনও উপবাসী থাকিতে হইল।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রায়শঃ এক বরতনে খানা খাইতেন। অনেক সময় এইরূপ দেখা যাইত যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) যে হাড্ডিখানা চুষিয়া দস্তরখানে রাখিয়াছেন হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহাই উঠাইয়া চুষিতেছেন। আবার হযরত আয়েশা (রাঃ) যে হাড্ডিখানা চুষিয়া রাখিয়া দিতেন, হুযুরে পাক (সঃ) তাহাই মুখের ভিতর পুরিয়া চুষিতে থাকিতেন।

ইহাছাড়া তাঁহারা উভয়ে একই পেয়ালার পানি পান করিতেন। পেয়ালার যে পার্শ্ব দিয়া হুযুরে পাক (সঃ) পানি পান করিতেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) সাগ্রহে সেই পার্শ্ব দিয়াই পানি পান করিতেন।

বিভিন্ন সময়ে তাঁহারা এক পাত্রে খাইতে বসিয়া তাঁহাদের মধ্যে নানারূপ মজার ঘটনা সৃষ্টি হইত এবং তাহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে হাসাহাসি পড়িয়া যাইত। তেলের অভাবে হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে বহু রাত্রেই বাতির ব্যবস্থা থাকিত না। সুতরাং অন্ধকারেই তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত একই পাত্রে খাইতে বসিতেন যাহার ফলে মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হইত যে, যে গোশতের টুকরাখানায় হযরত আয়েশা (রাঃ) হাত বাড়াইয়া দিতেন, তাহাতে হয়ত হুযুরে পাক (সঃ) তৎপূর্বেই হাত দিয়া বসিয়াছেন। অনেক সময় আবার ইহার উল্টাটিও হইত। এমনি ঘটনায় দুইজনেই এক সরস-মধুর আনন্দ উপভোগ করিতেন।

ইসলাম বিদ্বেষী হিংসুটে লোকগণ বলিয়া বেড়ায় যে, প্রৌঢ় বয়স্ক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী হযরত আয়েশার (রাঃ) মন তোষণের জন্য চেষ্টা-সাধ্য অনেক করিয়াছেন ঠিকই কিন্তু যুবতী ও সুন্দরী রমণী হযরত আয়েশার (রাঃ) পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করা কোনরূপেই স্বাভাবিক ও সম্ভব ছিল না।

উহাদের এই কথাটি একেবারেই মনগড়া ও কল্পিত। ইহাতে সত্যের লেশমাত্র নাই। হাদীসসমূহে পরিষ্কারভাবে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে তাহাতে দেখা যায়, হুযুরে পাক (সঃ) যখন হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে কৌতুকালাপ এবং আমোদ-প্রমোদে রত হইতেন তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহাতে কেবল সাড়াই দিতেন না; বরং উৎসাহ ও উদ্দীপনা তুলনামূলক যেন হুযুরে পাক (সঃ) অপেক্ষা আরও বেশী প্রদর্শন করিতেন।

একদা হুযুরে পাক (সঃ)-কে স্বগৃহে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে পাইয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) লজ্জাজড়িত কৌতুক বশে ও খুব বিনীতভাবেই আরজ করিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! মনে করুন, দুইটি সবুজ চারণ ক্ষেত্রের একটিতে উট চরিয়াছে, আরটিতে চরে নাই। উট চরাইবার জন্য আপনি ইহার কোনটিকে পছন্দ করিবেন? হুযুরে পাক (সঃ) মুচকি হাসিয়া জবাব দিলেন, যেটিতে চরে নাই সেটিকেই।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা কোন কোন গ্রন্থে ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া এইরূপ লিখিয়াছে যে, হযরত আয়েশার (রাঃ) সহিত হুযুরে পাক (সঃ)-এর আচরণ এবং ব্যবহারের পর্যালোচনা করিলে কোনক্রমেই তাঁহাকে স্ত্রৈণ না বলিয়া পারা যায় না। শুধু এতটুকুই নয়, ঐসব লোকেরা চরম স্পর্ধিতভাবে এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছে যে, হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) সহিত অধিক মাত্রায় মেলামিশা করিতে গিয়া অনেক সময় স্বীয় কর্তব্য কর্মে পর্যন্ত অবহেলা করিতেন (নাউযুবিল্লাহ)।

আসলে এইরূপ জঘন্য উক্তিসমূহ একেবারেই উদ্ভট এবং বিভ্রান্তিমূলক। ইহার পিছনে সত্যের কোন নিশানাই নাই; বরং ইহা যে একেবারেই ভিত্তিহীন, তাহার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে স্বয়ং হযরত আয়েশার (রাঃ)-ই বাক্যের মাধ্যমে। তিনি বলেন, অনেক সময় আমরা উভয়ে আনন্দ ঘন পরিবেশে গল্পগুজব এবং কৌতুকামোদ রত হইয়াছি। হঠাৎ আযানের শব্দ কানে আসামাত্রই তিনি ব্যস্ত-ত্রস্তভাবেই উঠিয়া পড়িয়া

এমনিভাবে মসজিদ অভিমুখে ধাবিত হইতেন যে, কে বলিবে তিনি ক্ষণকাল পূর্বে আমার সহিত হাস্যকৌতুক ও আমোদ-প্রমোদ রত ছিলেন।

মূলকথা, একদিকে আল্লাহর আশেক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নবীসূলভ বৈশিষ্ট্য ও মানবীয় গুণের সমন্বয়ে যেমন আল্লাহর নির্দেশ পালনে সমস্ত কিছুই ভুলিয়া যাইতেন এবং মানব সুলভ কর্তব্যের তাগীদে স্বীয় মহিষীগণকে প্রেম-প্রীতি ও স্নেহ-আদরে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন, অন্যদিকে সেই মহান নবীরই শিক্ষাপ্রাপ্তা পতিপ্রাণা স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও তাঁহার প্রতি অনুসরণ করিয়া একদিকে যেমন পতির সেবায় স্বীয় মন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে ও প্রতিটি মুহূর্ত তাঁহাকে তাঁহার নিজের নিকট ধরিয়া রাখিতে আগ্রহান্বিত থাকিতেন এবং মুহূর্তের বিচ্ছেদের-অনুপস্থিতিতে অস্থির ও অধীর হইয়া পড়িতেন আবার অন্যদিকে সপত্নীদিগের ন্যায্য দাবীর কথা মনে উদয় হওয়ার সাথে সাথে তিনি তাহাদের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া হুযুরে পাক (সঃ)-কে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে রোখসত দিয়া অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পরম শান্ত ও নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত হইতেন।

আদর্শ রমণী হযরত আয়েশা (রাঃ)

নারী জগতের সম্মুখে হযরত আয়েশা (রাঃ) সেরা আদর্শ স্থানীয় রমণী। তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও পর্যায়েই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ প্রতিভাত হইয়াছিল। প্রথম জীবনের দীর্ঘ নয়টি বৎসর তাঁহার মহান ও আদর্শবান স্বামীর পরম সান্নিধ্যে থাকিয়া ইসলামের অনুপম আদর্শকে অন্যান্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরার লক্ষ্যে তিনি নিজের জীবনকে নিখুঁত, সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বমুখী গুণরাজির অধিকারিণী। আর এইজন্যই হযরত রাসূলে করীম (সঃ) তাঁহাকে অন্যান্য বিবিগণ অপেক্ষা অধিক মহব্বত করিতেন। একদিকে তাঁহার পবিত্র অন্তর যেমন নির্মল ও সরল সুশীল ছিল, পক্ষান্তরে বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেও তাঁহার অত্যধিক মনোযোগ এবং সতর্কতা পরিলক্ষিত হইত।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর পবিত্র দন্ত পরিষ্কার করার মেসওয়াক ধুইয়া পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে হযরত আয়েশার (রাঃ) উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি তাহা বার বার অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। ইহাতে যেন তিনি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেন। হুযুরে পাক (সঃ)-এর কাপড়-চোপড় ধুইয়া পরিষ্কার রাখার ভারও ছিল হযরত আয়েশার (রাঃ) উপরে। একদা হযরত (রাঃ) একখানা কম্বল গাত্রে পেচাইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। জনৈক সাহাবী বলিলেন যে, হুযুর (সঃ)-এর কম্বলখানা অত্যন্ত ময়লা দেখা যাইতেছে। একথা শুনিয়া সাথে সাথে হুযুরে পাক (সঃ) কম্বলখানা পরিষ্কার করার জন্য হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন পারিবারিক কোন কাজে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তখন উহা ফেলিয়া রাখিয়া সাথে সাথেই কম্বলখানি উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট পাঠাইয়া দিয়া স্বস্তি লাভ করিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কন্যা। সুতরাং ইচ্ছা করিলে তিনি পারিবারিক কাজ-কর্মের জন্য বহু দাস-দাসী রাখিতে পারিতেন। হুযুরে পাক (সঃ)-এর কাছে আবদার করিলেও হয়ত ভৃত্যের

ব্যবস্থা হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া গৃহের যাবতীয় কাজ-কর্ম নিজের হাতেই করিতেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি ছিলেন দুনিয়ার মুসলিম নারী সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মহিলা। যতদূর সম্ভব অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের কার্য নিজের হাতেই করা উচিত। মুসলিম নারী জাতিকে এই মহান আদর্শ শিক্ষা দেওয়াই ছিল, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য।

হযরত আয়েশা (রাঃ) খানা-পিনার ব্যাপারেও বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন। যথা ঃ এ ব্যাপারে তিনি কোনরূপ বাহুল্য বা বাড়াবাড়ি পছন্দ করিতেন না। সাধারণ মামুলী খাবারই ছিল তাঁহার প্রিয় খাদ্য। তিনি মনে করিতেন, দুনিয়ার মানুষ উত্তম ও উপাদেয় খাদ্য আহার দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে আসে নাই। ইন্দ্রিয়ের পূজা করা মানুষের উদ্দেশ্য নহে; বরং জীবন ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল আল্লাহর নির্দেশিত কার্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদন করতঃ পরকালের সাফল্য বিধান করা। ভোগ-বিলাস এবং বাহুল্য জীবনের উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রাণ বাঁচাইয়া রাখার জন্য যতটুকু যাহা কিছু প্রয়োজন, ততটুকুই ভোগ করা প্রয়োজন এবং আবশ্যক মনে করা চাই; ইহার বেশী কিছুতেই নহে। হযরত আয়েশা (রাঃ) এই নীতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন এবং তজ্জন্যই তিনি সাধারণ আহার্য গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। কোন কোন সময়ে শুধু দুই-চারটি খেজুর এবং এক গ্লাস পানি খাইয়া এবং কখনও কখনও বা শুধু দুই একটি যবের রুটি আহার করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতেন। আটার রুটি এবং গোশত জাতীয় উত্তম খানা খুব কমই আহার করিতেন। তাঁহার মনোভাব ছিল এইরূপ যে, স্বামী হযরত রাসূলে করীম (সঃ) যেখানে পর পর দুই বেলা আসুদাসহ খানা আহার করেন নাই, সেখানে তাঁহার স্ত্রী হইয়া সেই আদর্শ গ্রহণ করিবেন না কেন?

হযরত আয়েশা (রাঃ) জীবনযাপনের যে কোন দিকই ছিল অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধা। দোজাহানের সম্রাটের প্রিয়তমা মহিষী হিসেবে ইচ্ছা করিলে বহুমূল্যবান কাপড়-চোপড় ও গহনাদি ব্যবহার করিতে পারিতেন। কিন্তু দুনিয়াবী ক্ষণস্থায়ী জীবনে এই বিলাসিতার কোনই মূল্য নাই, হযরত আয়েশা (রাঃ) বিশ্ব-মুসলিম নর-নারীদের সামনে সেই মহামূল্যবান আদর্শই তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ভাবিলে সত্যিই বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়, যিনি ছিলেন খোদ হযরত সাইয়্যিদুল মুরসালীনের সর্বশ্রেষ্ঠা সহধর্মিণী, যিনি ছিলেন সাহাবী প্রধান মহামাননীয় মর্যাদাশীল হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর স্নেহধন্যা কন্যা, যিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের কাছে পরম শ্রদ্ধেয়া জননী তুল্যা, যাহার দরবারে কোরআন-হাদীস, ফিকাহ তাফসীর প্রভৃতি শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে প্রত্যহ অসংখ্য লোক উপস্থিত হইত। সেই মহামর্যাদাশালিনী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) পোশাক-পরিচ্ছদে এতটুকু বিলাসিতা বা শান-শওকতের লেশ মাত্র ছিল না। ছিল তাহা একেবারেই সাধারণ, অতিশয় মামুলী। এমনকি কোন কাপড় কিছুটা ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া যাওয়ার সাথে সাথেই তিনি উহা ফেলিয়া দিতেন না; বরং উহা পরিধানের অযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত সেলাই করিয়া এবং তালির উপর তালি লাগাইয়া পরিতে থাকিতেন।

একবার জনৈক উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দরবারে আগমন করিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) আগন্তুককে বলিলেন, আপনার একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, আমি কাপড় সেলাই করিয়া লইয়া পরিয়া আসিতেছি। ইহাতে

আগন্তুক ব্যক্তি পরম বিস্ময়ের সাথে বলিলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! বলেন কি আপনি! আপানি ছিন্ন কাপড় সেলাই করিয়া পরেন? দেখুন! আমি যদি একথা লোকদের মাঝে প্রকাশ করিয়া দেই, তবে তাঁহারা নিশ্চয় আপনাকে কৃপণ ভাবিবে।

জবাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, দুনিয়াতে যাহারা ছিন্ন ও পুরাতন কাপড় পরে না, পরকালে তাহাদের ভাগ্যে নূতন কাপড় জুটিবে না।

হযরত আয়েশার (রাঃ) ব্যবহার্য ও পছন্দনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত হাদীসে জানা যায়, হযরত আয়েশা (রাঃ) সাধারণতঃ যা'ফরানী রংয়ের পোশাকই বেশী পছন্দ করিতেন। তাঁহার সাধারণ পোশাক বলিতে ছিল একটি কামীস এবং একটি সাদা ওড়না। কখনও কখনও তিনি একখানা রেশমী চাদরও ব্যবহার করিতেন। তাঁহার ব্যবহার্য সব পোশাকই হইত মোটা সুতার তৈরী এবং খুবই অল্প দামী। বর্ণিত রহিয়াছে যে, তাঁহার একটি বেশী মূল্যবান জামাও ছিল, তবে তিনি উহা মোটেই ব্যবহার করিতেন না; বরং পাড়া-প্রতিবেশী মহিলারা বিবাহ-শাদীতে তাঁহার নিকট হইতে উহা ধার লইয়া উহার দ্বারা কাজ সমাধা করিত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের ব্যাপারে শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। নিজে তো পাতলা কাপড় পরিধান করিতেনই না, অন্যের দ্বারাও উহা বর্জন করাইতেন। একবার হযরত হাফসা বিনতে আবদুর রহমান (হযরত আয়েশার ভ্রাতুষ্পুত্রী) একখানা পাতলা কাপড় পরিধান করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) তৎক্ষণাত তাঁহার নিকট হইতে উহা ছিনাইয়া লইয়া তাঁহাকে একখানা মোটা চাদর পরিতে দিলেন।

আর একদিন কয়েকজন মহিলা হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট আগমন করিলেন। নামাযের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা চাদর ব্যতীত শুধু ছালওয়ার ও কামীস পরিহিতাবস্থায় নামায আদায় করিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট ইহা অত্যন্ত খারাপ লাগিল। নামায শেষে তিনি তাহাদিগকে অত্যন্ত কঠোরভাবে বলিলেন এবং সতর্ক করিয়া দিলেন যে, কখনও যেন মস্তক অনাবৃত না থাকে, আর চাদরবিহীন অবস্থায় যেন কখনও নামায পড়া না হয়।

ইসলামী শরীয়তে পর্দা বিধানকে হযরত আয়েশা (রাঃ) যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করিতেন এবং যথাযথভাবে উহা পালন করিতেন। বহু পুরুষ লোকই হযরত আয়েশার (রাঃ) খেদমতে বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েলের উত্তর ও নানা বিষয়ক তত্ত্ব এবং তথ্যসমূহ জানিতে অনবরতই আগমন করিতেন। কোন পুরুষ ব্যক্তি তাঁহার নিকট কোনও মাসলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিতে বা হাদীস তাফসীর প্রভৃতি শুনিতে আসিলে পর্দার আড়ালে বসিয়া তিনি খুব নিম্নস্বরে তাহার জবাব দিতেন।

পর্দা পালন সম্পর্কিত কঠোরতা অবলম্বনে তিনি কত বেশী সক্রিয় ছিলেন তদসম্পর্কে বহু মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক ও লিখক অনেক ঘটনাই বর্ণনা করিয়াছেন।

একবার হজ্জের সময় হযরত আয়েশার (রাঃ) সহচরীগণ তাঁহাকে হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) চুম্বন করিতে বলিলে তিনি জবাব দিলেন, পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে আমি যাইতে পারি না।

হযরত ইবনে ইসহাক (রাঃ) নামক জনৈক তাবেয়ী একবার হযরত আয়েশার (রাঃ) সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন। উক্ত তাবেয়ী অন্ধ ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)

তাঁহার আগমনে পর্দা করিতেছেন, একথা জানিতে পারিয়া তিনি আরজ করিলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনি আমার কারণে পর্দা করিতেছেন কেন, আমি তো আপনাকে দেখিতে পাইতেছি না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আপানি দেখেন না, কিন্তু আমি তো আপনাকে দেখিতে পাই।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পর্দার প্রতি গুরুত্ব প্রদানের আর একটি দৃষ্টান্ত এই যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁহার হুজরায় দাফন করার পর হযরত ওমর (রাঃ)-কেও যখন ঐ হুজরায় দাফন করা হইল তখন হইতে তিনি তাঁহার সেই নিজের হুজরায়ও বিনাপর্দায় প্রবেশ করা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার কারণও মাহরাম পুরুষ হযরত ওমর (রাঃ)-কে সেখানে দাফন করা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

ইবাদত-বন্দেগী

হযরত আয়েশা (রাঃ) শরীয়তের বিভিন্ন নির্দেশাবলী পালনে যেমন দৃঢ়পণ মহিলা ছিলেন, ইবাদত-বন্দেগীতেও ঠিক তেমনই আদর্শ মহিলা ছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহার এতটুকু মাত্র অবহেলা বা উদাসীনতা ছিল না। যে কোন রকমের ইবাদত তিনি যথাসময়ে ও যথাযথভাবে অত্যন্ত একাগ্রতা এবং সতর্কতার সাথে আদায় করিতেন।

নামাযের ওয়াক্ত হওয়ামাত্র তিনি সাথে সাথে পবিত্র হইয়া ধীর-স্থিরভাবে নামায আদায়ে মশগুল হইতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জীবনে কোনদিন এক ওয়াক্ত নামাযও কাজা করেন নাই। তিনি দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ সময়ই ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করিতেন। ইবাদত করিয়া বাকী সময়টুকুতে পারিবারিক কাজকর্ম করিতেন। নামায আদায় করিতে গিয়া ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত নামাযসমূহের তো কথাই উঠে না। নফল ও মুস্তাহাব নামাযসমূহের জন্যও তাঁহার ব্যগ্রতার সীমা ছিল না। চাশত নামাযের প্রতি তাঁহার এত বেশী আসক্তি ছিল যে, তিনি বলিতেন, আমার পিতাজী স্বয়ং কবর হইতে উঠিয়া আসিয়া যদি আমাকে বারণ করেন তবু আমি চাশত নামায কোনদিন তরক করিব না। হুযুর পাক (সঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি তাঁহার সহিত গভীররাত্র জাগিয়া তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিতেন। হুযুরে পাক (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরেও তিনি তাহাজ্জুদের নামায নিয়মিতভাবেই আদায় করিতেন। ঘটনাক্রমে কোনদিন যথাসময় নিদ্রাভঙ্গ না হইলে ফজরের নামায শুরু করিবার পূর্বে তিনি তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিয়া লইতেন।

রমজান মাসে তারাবীহর নামায আদায়ের ব্যাপারেও তিনি একান্ত যত্নবান ছিলেন। জামাতের সাথেই তিনি তাহা আদায় করিতেন। তাঁহাদের তারাবীহর জামাতে জুকওয়ান নামক তাঁহার এক শিক্ষিত ভৃত্য ইমামতি করিতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বাৎসরিক রমজান মাসের ফরজ রোযা ছাড়া বৎসরের প্রায় অধিকাংশ দিনগুলিতেই নফল রোযা রাখিতেন। কেহ কেহ এরূপও বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সারা বৎসর ধরিয়াই রোযা আদায় করিতেন।

হজ্জ আদায়ের ব্যাপারেও হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে অত্যন্ত যত্নবান দেখা যাইত। কোন বৎসর তাঁহার হজ্জ আদায় করা বাকী রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভীষণ গরমের

দিনেও তিনি আরফার দিনে রোযা আদায় এবং হজ্জের আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলি নিখুঁতভাবে আদায় করিতেন। এক কথায় বলা যায় যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) মুসলিম মহিলাদের জন্য আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ ইবাদতগুজার বা একনিষ্ঠ "আবিদাহ" ছিলেন।

অতিথিপরায়ণতা

আরব জাতির বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে অতিথিপরায়ণতা অন্যতম। এ ব্যাপারে তাহাদের সুনাম ও সুখ্যাতি সারা বিশ্ব জুড়িয়া। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অতিথিপরায়ণ আরব জাতির একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ। বিশেষতঃ তিনি স্বামী হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এবং পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর মত মহান পুরুষদ্বয়ের আদর্শের ছায়াতলে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহার অতিথিপরায়ণতা গুণটি অন্যান্য যে কোন সাধরাণ আরবের তুলনায় যে বহুগুণে বেশী ছিল, তাহা ছিল একান্তই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ তিনি খুবই অতিথিপরায়ণ মহিলা ছিলেন। তাঁহার গৃহে কোন মুসাফির বা মেহমান আসিলে তাঁহার খুশী ও আনন্দের সীমা থাকিত না। তিনি মনে-প্রাণে ও সাধ্যাতীতভাবে, তাহাদের সেবা-যত্নে ও আদর-আপ্যায়ন করিতেন। মুসাফির ও মেহমানগণ তাঁহার ব্যবহারে নিজেদেরকে ধন্য মনে করিতেন।

একদা বনী শাফাক গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত সাক্ষাত লাভের জন্য আসিয়া হাজির হইলেন। হুযুরে পাক (সঃ) তখন গৃহে ছিলেন না। মেহমানের ক্ষুধায় কষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর গৃহে ফিরিবার পূর্বেই আরবের প্রচলিত সুস্বাদু খাদ্য 'হারীরা' পাকাইয়া মেহমানদের পরম যত্নে আপ্যায়ন করিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই নিজের অভ্যাস মত প্রথমেই মেহমানগণের খোঁজ-খবর লইতে গিয়া তাঁহাদের খানাপিনা হইয়াছে কিনা জানিতে চাহিলেন। মেহমানগণ বলিলেন, যারপর নাই উদ্যোগ-আয়োজনের সহিতই তাহাদের পানাহার কার্য সম্পাদন হইয়াছে। হুযুরে পাক (সঃ) শুনিয়া খুবই খুশী হইলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রাণ খুলিয়া দোয়া করিলেন।

বদান্যতা

হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় সর্বপ্রথম হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-কে পরে হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে দাফন করা হয়। তিনিও একই হুজরায় স্বামী ও পিতার কবরের পার্শ্বেই সমাহিত হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে ইন্তেকালের পূর্বক্ষণে নিজের কবরের উক্ত স্থানটির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বীয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিনা দ্বিধায় হযরত ওমর (রাঃ)-এর মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া দেন।

একদা একটি ফকির আসিয়া হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। তিনি সেদিন রোযাদার ছিলেন আর তাঁহার গৃহে একটি মাত্র রুটি ছিল। ইফতারের জন্য উহাই একমাত্র সম্বল ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) পরিচারিকাকে ঐ রুটিই মুসাফিরকে দিয়া দিতে নির্দেশ করিলে সে আরজ করিল, আপনার ইফতার করার জন্য ঐ রুটিটি ব্যতীত আর তো কিছুই নাই। তিনি শুনিয়া বলিলেন, আগে মুসাফিরকে বিদায় কর তো

দেখি! অগত্যা পরিচারিকা তাঁহার নির্দেশ পালন করিল। সন্ধ্যায় দেখা গেল জনৈক সাহাবী উত্তম পাকানো গোশত নিয়া হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার পরিচারিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কি হে! গোশত রুটি অপেক্ষা ভাল খানা নয় কি?

আর একদিনের ঘটনা, হযরত আয়েশা (রাঃ) সেদিনও রোযাদার ছিলেন। ঐদিন সিরিয়ার গভর্ণর আমীর মুআবিয়ার তরফ হইতে তাহার খেদমতে নজরানা বাবত একলক্ষ দিরহাম আসিয়া পৌঁছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি গরীব-মিসকীনদিগকে দান করিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার আর কোন একটি কপর্দকও রহিল না। তাঁহার দাসী আরজ করিল, আম্মা! ইফতারের জন্য যে কিছুই রাখিলেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) একথা শুনিয়া বলিলেন, একথা আমাকে পূর্বেই স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত ছিল।

একদা মুনকাদার ইবনে আবদুল্লাহ হযরত আয়েশার (রাঃ) খেদমতে হাজির হইলে তিনি তাঁহার পারিবারিক অবস্থাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে গিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার সন্তান-সন্ততি কয়টি? হযরত মুনকাদার (রাঃ) জবাব দিলেন, উম্মুল মু'মিনীন! অর্থানটনের কারণে এখনও বিবাহই করিতে পারি নাই।

সাহাবী মুনকাদার (রাঃ)-এর কথা শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) দুঃখিত স্বরে বলিলেন, হায়! আজ যদি আমার নিকট দশ হাজার দিরহামও থাকিত, তবে উহা আমি সমস্তই তোমাকে দিয়া দিতাম। আল্লাহর কি অপূর্ব মহিমা! ঐ দিনই আমীর মুআবিয়ার (রাঃ) নিকট হইতে উম্মুল মু'মিনীনের দরবারে দশ হাজার দিরহাম আসিয়া গেল। উম্মুল মু'মিনীন সঙ্গে সঙ্গে নিজের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে উহা মুনকাদার (রাঃ)-কে দান করিলেন।

দুঃস্থ পীড়িতদের প্রতি হযরত আয়েশার (রাঃ) অন্তর এতই দয়ালু এবং সহানুভূতিপূর্ণ ছিল যে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার অসীম অনুগ্রহ ও অর্থানুকূল্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৬৭ জন ক্রীতদাস-দাসী দাসত্ব হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। দান ও সাহায্য করার প্রতি তাঁহার এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি নিজের বাসগৃহটি পর্যন্ত আমীর মুআবিয়ার নিকট বিক্রয় করতঃ বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ অভাবগ্রস্তদের মাঝে বন্টন করিয়া দেন।

জ্ঞান সাধনার অনুপম নমুনা

সত্যি বলিতে কি, দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বমুখী জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে তুলনীয় হইতে পারে এমন মহিলা দ্বিতীয়টি নাই। ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি নিরলস সাধনার দ্বারা চরম সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোরআন, হাদীস, ফিকাহ, তাফসীর, কালাম, কিয়াস প্রভৃতি ধর্মীয় শাস্ত্রসমূহে তিনি যেমন গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন ; আদব, ইতিহাস, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, তদুপরি বক্তৃতা, শিক্ষকতা প্রভৃতি বিষয়গুলিতেও ঠিক একইরূপ ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এত অধিক বিষয়ে এরূপ নৈপুণ্য অর্জন করা বহু প্রতিভাশালী পুরুষদের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই।

হযরত আয়েশার (রাঃ) উল্লিখিত শাস্ত্রসমূহে সাধনা এবং সাফল্যের উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করিতেছি।

ইলমুল কোরআন ঃ সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ ইলম ইলমুল-কোরআন সম্পর্কেই আলোচনা করা যাইতেছে। পবিত্র কোরআনে হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রতি গৃহে ও বাহিরে দুই জায়গায়ই নাযিল হইতেছিল। গৃহে যাহা নাযিল হইয়াছিল তাহা কেবলমাত্র হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহেই। অন্য কাহারও গৃহে নয়।

যখন কোরআন শরীফ নাযিল হইত, কখনও কখনও হুযুরে পাক (সঃ)-এর বক্ষ মধ্যে ঘন্টার আওয়াজের ন্যায় একটা আওয়াজ শুনা যাইত। আর কখনও কখনও বা ফেরেশতা জিব্রাঈল বাহির হইতে হুযুরে পাক (সঃ)-কে কোরআনের আয়াত পড়িয়া শুনাইতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) উক্ত ঘন্টার আওয়াজ এবং হযরত জিব্রাঈল পঠিত কোরআনের শব্দ শুনিতে পাইতেন। ইহার ফলে হযরত আয়েশার (রাঃ) মনে কোরআনের প্রতি এক অনন্য ধরনের স্বতন্ত্র ধারণা আকর্ষণ এবং শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। যাহা অন্য কাহারও মধ্যে সম্ভব হয় নাই।

কোরআন পাক নাযিল হইবার সাথে সাথে যখন হযরত রাসূলে পাক (সঃ) উহা সকলকে পড়িয়া শুনাইতেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) উহা সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন।

তাহাছাড়া কোরআনে পাকের সূরা ও আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য ও কারণসমূহ হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হইতে এমনভাবে জানিয়াছিলেন যে, বহু সাহাবীর পক্ষেই তদ্রূপ সম্ভব হয় নাই। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিম্নলিখিত দুইটি জবাব দ্বারাই কোরআনে পাকে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

একবার কতিপয় ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হুযুরে পাক (সঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তোমরা কি পবিত্র কোরআন পাঠ কর নাই? হুযুরে পাক (সঃ)-এর চরিত্র আগা-গোড়াই তো কোরআনে বর্তমান। লোকেরা আবার তাঁহাকে বলিল, আপনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর ইবাদতের রীতি-নীতি বর্ণনা করুন। হযরত আয়েশা (রাঃ) জবাব দিলেন, তোমরা সূরা মুযযাম্মিল পাঠ করিও।

কোরআনে পাকের ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য উদঘাটনে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছেন। কোন আয়াতের প্রকৃত মর্মার্থ এবং নিগূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে উক্ত আয়াতের শানে নুযুল অর্থাৎ উহা কখন কোথায় কি উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে তৎসম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা অপরিহার্য। হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর একান্ত সান্নিধ্যে জীবনযাপনের ফলে উক্ত বিষয়সমূহ অত্যুত্তমরূপে অবহিত হইয়াছিলেন বলিয়াই কোরআনে পাকের যে কোন আয়াতের মর্ম এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। উপরন্তু আরবী সাহিত্যেও তাঁহার সবিশেষ দখল ছিল। কাজেই কোরআনে পাকের মর্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে তাঁহার যোগ্যতা আরও বেশী পরিমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার প্রদত্ত কোরআনের ব্যাখ্যা হইত অতিশয় জ্ঞানগর্ভ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া শীর্ষস্থানীয় পুরুষ সাহাবীগণ পর্যন্ত মুগ্ধ এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া যাইতেন।

একদা জনৈক ছাত্র হযরত আয়েশার (রাঃ) খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন যে, সূরা নিসার এক আয়াতে দেখা যায়, পুরুষের পক্ষে এক আয়াতে একত্রে চারিজন

চারজন স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া রাখাও জায়েয। আবার ঐ একই আয়াতে ইয়াতীমদের বিষয়ও উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল যে, চারিটি বিবাহের সাথে ইয়াতীমদের সম্পর্ক কি? এই আয়াতের অর্থে কি তাৎপর্য রহিয়াছে? প্রকাশ্যে তো এই আয়াতের প্রথমাংশের সহিত দ্বিতীয়াংশের কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না। আয়াতটি এই ঃ

'অ ইন খিফতুম আল্লা তুক্বছিতু ফিল ইয়াতামা ফানকিহু মা ত্বাবা লাকুম মিনান্নিছাই মাছনা অছুলাছা অরুবাআ।"

অর্থাৎ যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে ন্যায়নীতি প্রদর্শন করিতে পারিবে না, তবে তোমাদের অভিরুচি অনুযায়ী নারীদের মধ্য হইতে দুই, তিন বা চারিজনকে পর্যন্ত বিবাহ করিতে পার।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন, ইয়াতীম বালিকাদের কোন কোন আত্মীয় তাহাদের অভিভাবক সাজিয়া পরে সেই অভিভাবকত্বের বলেই তাহাদেরকে জবরদস্তী বিবাহ করিতে প্রয়াস পায়, উদ্দেশ্য তাহাদের বিষয়-সম্পত্তির উপর অধিকার স্থাপন করা। এই হতভাগিনী ইয়াতীম বালিকাদের অপর কেহ সাহায্যও করিতে পারে না বলিয়া এই অভিভাবকদের প্রতি যথেচ্ছা জোর-জুলুম ও অত্যাচার চালায়। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এই ধরনের লোকদের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন—যদি তোমরা ইয়াতীম বালিকাদের উপর ইনসাফ করিতে পারিবে না বলিয়া আশংকা কর, তবে ঐ ইয়াতীম বালিকাগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীদের মধ্য হইতে এক, দুই, তিন কিংবা চারিজন পর্যন্ত বিবাহ করিতে পার। তবুও ঐ ইয়াতীম বালিকাদেরকে জোরপূর্বক বিবাহ করিয়া তাহাদেরকে নিজেদের অধিকারে আনার চেষ্টা করিও না।

ঐ ছাত্রটি সূরা নিসার আরও দুইটি আয়াত পাঠ করিয়া আয়াত দুইটির তাফসীর জানিতে চাহিল এবং বলিল যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যামতে প্রথম আয়াতটি দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা মনসুখ (হুকুম রদকৃত) হইয়াছে। আয়াত দুইটি এই ঃ

(১) "অমান কানা গানিয়্যান ফালইয়াসতা'ফিফ অমান কানা ফাক্বীরান ফালইয়া'কুল বিল মা'রূফি।"

(২) "ইন্নাল্লাযীনা ইয়া'কুলূনা আমওয়ালাল ইয়াতামা জুলমান ইন্নামা ইয়া'কুলূনা ফী বুতুনিহিম নারাঁও অ ছাইয়াছলাওনা ছাঈরা।"

অর্থাৎ (১) এবং যাহারা ধনী তাহাদের ধৈর্যধারণ করা উচিত এবং যাহারা গরীব তাহারা সুন্দরভাবে (হিসাব মত) ভোগ করিবে।

(২) যাহারা অত্যাচার করিয়া ইয়াতীমদের মাল-সামানা আত্মসাৎ করে, তাহারা অবশ্যই নিজেদের উদরে আগুন ব্যতীত আর কিছুই ভোজন করে না এবং তাহারা নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে দোযখে পতিত হইবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, কোরআনের কোন আয়াতই মনসুখ হইতে পারে না। অতঃপর তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়া দেখান যে, উক্ত দুইটি আয়াতই ইয়াতীমদের অভিভাকদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং অর্থের দিক দিয়া আয়াত দুইট মোটেই পরস্পর বিরোধী নহে।

প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে যে, ইয়াতীমদের অভিভাবকগণ দরিদ্র হইলে ঐ ইয়াতীমদের মাল হইতে খরচ লওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ধনী অভিভাবকদের পক্ষে ইয়াতীমদের মাল হইতে কিছুই লওয়া সঙ্গত নহে। সামান্য কিছুই লওয়া নাজায়েয। সূরা নিসার অপর একটি আয়াতের ব্যাখ্যা লইয়াও কতিপয় সাহাবীর সঙ্গে হযরত আয়েশার (রাঃ) মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। আয়াত হইল এই ঃ

"অইনিমরাতুন খাফাত মিম বা'লিহা নুশুযান আও ইরাদ্বান ফালা জুনাহা আলাইহিমা আইয়্যুছলিহা বাইনাহুমা ছলহাঁও অচ্ছুলহু খাইর।"

অথাৎ যদি স্ত্রী তাহার স্বামী হইতে অবাধ্যতা বা অবজ্ঞার আশঙ্কা করে তবে নিজেদের মধ্যে কোনও সন্ধি করিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে দোষের বিষয় নহে বরং সন্ধি করা মঙ্গল।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবী এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন যে, স্ত্রী স্বামী সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করিলে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিলে তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া দেওয়ার জন্য এই আয়াতে বলা হইয়াছে। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এই আয়াতের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহা খুবই চমকপ্রদ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন, যদি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করিয়া দেওয়ার পন্থা এই আয়াতের উদ্দেশ্য হইত তবে এই আয়াতে 'ছুলহ' অর্থাৎ সন্ধির জন্য বিশেষ হুকুম এবং এত তাগীদ করা হইল কেন? আসলে এই আয়াত এমন স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে যাহাদের যৌবন বিগত প্রায় এবং যাহারা আপন স্বামীর কাজের অনুপযুক্ত। ফলে স্বামীগণ তাহাদের কাছে বিশেষ একটা আসে না। অথচ শরীয়ত অনুযায়ী স্বামীর উপর তাহার সকল স্ত্রীর সহিত সমানভাবে কাল যাপন করা ফরজ। এইরূপ অবস্থায় বৃদ্ধা স্ত্রী নিজ স্বামীর উপর হইতে তাহার সহিত অবস্থানের দাবী পরিহার করিলে উভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ উত্তমরূপেই বজায় থাকে। বস্তুতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার তুলনায় এইরূপ ছুলহ বা সন্ধিই উত্তম।

হযরত আয়েশার (রাঃ) এইরূপ জ্ঞানগর্ভ ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ ব্যাখ্যার বহু উদাহরণ রহিয়াছে। বস্তুতঃ ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিজী (রহঃ) তাহাদের হাদীস গ্রন্থে যে সকল তাফসীরাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার মধ্যে হযরত আয়েশার (রাঃ) সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যাই অন্যান্যদের তুলনায় অধিক বাস্তবধর্মী ও সারগর্ভ বলিয়া অনুমিত হয়।

ইলমুল হাদীস ঃ ইসলামের ভিত্তিমূলসমূহের মধ্যে মহান কোরআন ও হাদীস এই দুইটিই প্রধান। কোরআন ইসলামের মূলনীতি ও মৌলিক নিয়মাবলীর সমষ্টি এবং হাদীস তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা কোরআনে পাকের মূলনীতিসমূহের সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বাণী, কর্ম এবং সাহাবাদের কোন কার্যের প্রতি তাঁহার অনুমোদন ইত্যাদির সমষ্টিই হইল পবিত্র হাদীস। কোরআনে পাকের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য পবিত্র হাদীসই প্রধান অবলম্বন।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর উঠিতে-বসিতে, চলিতে-ফিরিতে তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে যে সকল পবিত্র বাণী নিঃসৃত হইত এবং তিনি যাহা কিছু করিতেন সাহাবায়ে কেরাম

আন্তরিক সতর্কতার সাথে পুংখানুপুংখরূপে অনুধাবন করতঃ হৃদয়পটে অঙ্কন বা সংরক্ষণ করিয়া রাখিতেন। কিন্তু তাঁহারা এসব শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য লোকদের নিকট বর্ণনা করেন। এই প্রতিক্রিয়ায়ই মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক হাদীস শাস্ত্র সম্পাদিত হয়।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রিয়তমা জীবন সঙ্গীনীরূপে হযরত আয়েশার (রাঃ) পক্ষে তাহার পবিত্র বাণী শ্রবণের ও কার্যকলাপ দর্শনের সর্বাপেক্ষা বেশী সুযোগ প্রাপ্ত হন। স্বাভাবিকভাবে তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর সর্বাধিক জ্ঞানী, গুণী ও শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শিনী মহিলা হিসাবে তিনি এই হাদীস শাস্ত্রে যতবেশী অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, ততটা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহস্রের অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদিগের মধ্যে সাত তারকার এক তারকা। হাজারের অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাতজন সাহাবীর মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) ষষ্ঠ স্থানীয়া। নিম্নলিখিত তালিকার মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে।

(১) আবু হোরায়রা (রাঃ)	বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা	৫৩৬৪
(২) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)	” ”	২৬৬০
(৩) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)		২৬৩০
(৪) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)		২৫৪০
(৫) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)		২২৮২
(৬) আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)		২২১০
(৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)		২১৭০

হযরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণিত ২২১০টি হাদীসের মধ্যে ২৮৬টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭৪টি হাদীস উভয় গ্রন্থেই স্থান লাভ করিয়াছে। বাকী ১১২টি হাদীসের ৫৪টি বুখারী শরীফে এবং ৫৮টি মুসলিম শরীফে স্থান লাভ করিয়াছে। অবশিষ্ট ১৯২৪টি হাদীস অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত হইয়াছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) যে কেবল অধিক সংখ্যক হাদীসই বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা নহে। হাদীসের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বর্ণনায়ও তিনি অনেক প্রধান ও প্রবীণ সাহাবীদের তুলনায় অধিক যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার হাদীস বর্ণনার একটি বিশেষত্ব এই যে, উহা অন্যান্যদের তুলনায় সহজ, সরল এবং অধিক সুস্পষ্ট।

ইলমুল ফিকাহ কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরাম ও বা তাবেয়ীগণ কর্তৃক মানবজীবন যাপনের যে বিভিন্ন বিধি-বিধানসমূহ প্রণীত হইয়াছে তাহাই ফিকাহ নামে পরিচিত।

হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট লোকগণ যখন কোন নতুন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিত তখন তাহারা কোরআনের আলোকে উহার সমাধান করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাহাতে ব্যর্থ হইলে বিজ্ঞ সাহাবীদেরকে আহ্বান করা হইত। তাহারা উক্ত বিষয়ের উপর কোন হাদীস উপস্থিত করিতে পারিলে তাহার মাধ্যমে

সমাধান করা হইত। নতুবা সকলের সম্মিলিত জ্ঞানের আলোকে কেয়াসের সাহায্যে সমাধান করা হইত।

তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলে মদীনায় ব্যাপক অশান্তির কারণে প্রবীণ সাহাবীদের অধিকাংশই কুফা, দামেশক প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিতে থাকেন।

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) তো স্বয়ংই কুফা তাশরীফ নিয়া বসবাস শুরু করেন। এ সময়ে ইলমে ফিকাহর কেন্দ্রভূমি মদীনা একরূপ বিজ্ঞ সাহাবীশূন্য হইয়া পড়ে। তখন একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ)-ই মদীনার ঐতিহ্য ও মর্যাদা রক্ষা করেন। এ সময় কেহ কোন মাসলা লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি এত বিচক্ষণতার সাথে তাহার জওয়াব দিতেন যে, তাহাতে আর কাহারও মনে কোনরূপ প্রশ্নের উদয় হইত না।

ইলমুল কিয়াস ঃ কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে যে সকল বিষয়ের পরিষ্কার সমাধান উদ্ঘাটন করা যায় না। তখন ঐ দুই বস্তুর আলোকে জ্ঞান খাটাইয়া উহার সমাধান করার নামই হইল কিয়াস। হযরত আয়েশা (রাঃ) কোরআন ও হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন। সুতরাং কিয়াসের সাহায্যে মাসলা প্রদান করার যোগ্যতায় তিনি শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার সেই যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইলমুল কালাম ঃ অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ধারণা ও মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া ইলমে কালাম বা আকায়েদ শাস্ত্র সৃষ্টি হইয়াছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) এই শাস্ত্রেও অনন্য প্রতিভা এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন।

নিম্নোক্ত কতিপয় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাঁহার সত্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা ঃ

(১) দুনিয়াতে থাকা কালে আল্লাহ তায়ালাকে চর্ম চক্ষুদ্বারা দেখা সম্ভব কিনা এই প্রশ্নে বহুসংখ্যক আলেম-ওলামা, সুফী-দরবেশ এবং বোযর্গগণ সম্ভব বলিয়া মনে করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতের উপর ভিত্তি করিয়াই সম্ভবতঃ তাহারা এইরূপ মত পোষণ করেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, দুনিয়াতে থাকিয়া আল্লাহকে দেখা কোনরূপেই সম্ভব নহে। অবশ্য পরকালে দীদারে ইলাহি সম্পর্কে তিনি কোনরূপ দ্বিমত পোষণ করিতেন না।

(২) হুযুরে পাক (সঃ)-এর ইলমুল গায়েব ছিল কিনা বিভিন্ন সাহাবীর সাথে হযরত আয়েশার (রাঃ) এ বিষয়েও মতদ্বৈধতা ছিল।

হযরত আয়েশার (রাঃ) এই মত ছিল যে, গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়-বস্তুর খবর একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কেহই জানে না। এ সম্পর্কে তাঁহার দলীল এই যে, কোরআনে পাকে উল্লেখ আছে "লা তাদরী নাফসুম বা যা তাকসিবু গাদান" অর্থাৎ কেহই বলিতে পারে না আগামী কল্য সে কি উপার্জন করিবে।

(৩) কোরআনে পাকের বহুস্থানে উক্ত হইয়াছে আল্লাহ তায়ালা মুখ, হাত, চোখ, কান ইত্যাদির কথা। যেমন তিনি বলেন, ধরেন, দেখেন, শুনেন ইত্যাদি। এই সকল কালামের উপর ভিত্তি করিয়াই অনেক লোক আমাদের মত আল্লাহ তায়ালারও মুখ, হাত, চোখ, কান প্রভৃতি আছে বলিয়া মনে করেন; কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) ঐ সকল বিষয়ের অর্থ কুদরত, জ্ঞান এবং ইলমরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দুনিয়ার অধিকাংশ জ্ঞানীব্যক্তিই হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহীত এই অর্থকে বাস্তবধর্মী এবং বিবেকসম্মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ইলমুল আদব (বা সাহিত্যজ্ঞান)ঃ হযরত আয়েশার (রাঃ) অনন্য বৈশিষ্ট্যের অন্যতম বিষয় হইল তাহার জ্ঞান সাধনা ও সাফল্য শুধু ধর্মীয় বা পারলৌকিক বিষয়-বস্তুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং ইহলৌকিক বিষয়বস্তু বা শাস্ত্রসমূহেও তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। সাহিত্য সাধনা বা কাব্যচর্চা আরবের এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেও ইহার প্রচলন ছিল। মুসলমানগণ সেখানে মোশায়েরা বা কাব্যানুষ্ঠানের আয়োজন করিত। উহাতে দেশের বড় বড় কবিগণ যোগদান করিতেন এবং তাহারা কবিতা আবৃত্তি করিতেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) যোগ্যতা এই ক্ষেত্রেও ছিল অত্যধিক।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ)-ও আরবের এক খ্যাতিমান সাহিত্যিক এবং কাব্যরচয়িতা ছিলেন। সেই সুযোগ্য পিতার নিকট হইতেই কন্যা আয়েশা (রাঃ) উত্তরাধিকার সূত্রেই আরবী সাহিত্য ক্ষেত্রে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন। আরবের বহু প্রাচীন গ্রন্থেই হযরত আয়েশার (রাঃ) রচিত কবিতা দেখা যায়।

শের বা কবিতার দোষ-গুণ সম্পর্কে একবার বিতর্ক উঠিল এবং উহা রচনার সিদ্ধ-অসিদ্ধতা সম্পর্কেও প্রশ্ন দেখা দিল। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কবিতা নিষিদ্ধ বলিলেন এবং তাহার মতের সপক্ষে হুযুরে পাক (সঃ)-এর একটি হাদীসও পেশ করিলেন।

এই ঘটনা হযরত আয়েশার (রাঃ) কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ আবু হোরায়রাকে রক্ষা করুন। আবু হোরায়রার হাদীস স্মরণ থাকে না। কবিতার দোষ-গুণ ছন্দ দ্বারা বিচার হয় না। ভাব ও বিষয়বস্তুর ভালমন্দের উপর ইহার দোষ-গুণ (বা সিদ্ধ-অসিদ্ধতা) নির্ভরশীল।

আল ইলমুত্তারীখ (বা ইতিহাস শাস্ত্র) ঃ হযরত আবুবকর (রাঃ) নিজে একজন উচ্চ পর্যায়ের ইতিহাসবিদ ছিলেন। সুতরাং অতি স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য শাস্ত্রগুলির ন্যায় ইতিহাস শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করিতেও হযরত আয়েশা (রাঃ) পিতার নিকট উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি নিজেই কন্যাকে ইতিহাসের জ্ঞানে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া স্বীয় প্রখর স্মরণ শক্তির দ্বারা হযরত আয়েশা (রাঃ) সমসাময়িক আরবের ঘটনা ও অবস্থাসমূহ এবং হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রধান চারি সহচর তথা খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের ঘটনাবলী পুংখানুপুংখরূপে স্মরণ রাখিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ও সাধারণ লোকদেরকে জানাইয়া গিয়াছিলেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞান বা রসায়ন শাস্ত্রের আরবের সে যুগে চর্চা না থাকিলেও সামান্য যাহা কিছু ছিল, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহাতেও পিছাইয়া ছিলেন না। বিশেষতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই যোগ্যতা দর্শনে জনৈক শিষ্য বিস্মিত হইয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া উম্মুল মু'মিনীন! কাব্য প্রতিভাশালী হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর দুহিতা হিসাবে কবিত্ব অর্জন আপনার দ্বারা হইতে পারে কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রে আপনার এই নৈপুণ্যের কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) জবাবে বলিলেন, শেষ জীবনে হুযুরে পাক (সঃ) যখন মাঝে মাঝে রোগাক্রান্ত হইতেন, তখন আরবের বহু চিকিৎসাক তাঁহার চিকিৎসার জন্য

আগমন করিতেন এবং তাঁহাকে দাওয়াইর ব্যবস্থাপত্র দিতেন ও তাঁহার সহিত চিকিৎসা বিষয়ে আলাপালোচনা করিতেন। আমি তাঁহাদের সেই ব্যবস্থাপত্র মনোযোগের সহিত দেখিতাম এবং আলাপ-আলোচনা বিশেষ একাগ্রতার সাথে শ্রবণ করিতাম। এইভাবেই আমি চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করিয়াছি।

কোন কোন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, জীবনে আয়েশা (রাঃ) বহু রোগীরই চিকিৎসা করিয়াছেন এবং ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন। তাহা ছাড়া জঙ্গে ওহুদের সময়ে যখন হুযুরে পাক (সঃ) মারাত্মকভাবে আহত হইয়াছিলেন, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার নিজের ব্যবস্থা মতই ঔষধ দ্বারা উক্ত যখমে পট্টি বাঁধিয়াছিলেন এবং তাহাতেই হুযুরে পাক (সঃ)-এর যখমের ক্ষত আরোগ্য হইয়াছিল।

হযরত আয়েশার (রাঃ) রসায়ন শাস্ত্রেও যারপর নাই অভিজ্ঞতা ছিল। ধাতুকে অন্য ধাতুর সহিত মিশাইয়া নতুন বস্তু সৃষ্টি করিতে তিনি অত্যদ্ভুত যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট হইতে তাম্রকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা এবং রৌপ্যের উপরে স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়ার কলা-কৌশল তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে এ সকল বিষয়ে অধিক নৈপুণ্য লাভ করিয়া স্বীয় শিষ্যদিগকেও ইহা শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁহার শিষ্য খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বরচিত গ্রন্থে হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট হইতে রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষালাভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বক্তৃতা ঃ সেই যুগে আরবে বড় বড় বক্তার অভাব ছিল না। আবার বক্তৃতাবিমুখ লোকও ছিল বিস্তর। বক্তাদের বক্তৃতা যতই প্রাণস্পর্শী এবং আকর্ষণীয় হউক না কেন চির স্বাধীনতাপ্রিয় একরোখা আরবদিগকে বক্তৃতা দ্বারা বশ করা বড়ই দুঃসাধ্য কাজ ছিল। অবশ্য ইহা সত্ত্বেও প্রাক-ইসলামিক যুগের আরবের কতিপয় বক্তার কথা শুনা যায় যে, তাহাদের বক্তৃতার প্রভাবে সাধারণ লোকগণ অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন-মরণ সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িত। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেও এই শ্রেণীর শক্তিমান বক্তাদের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) প্রমুখ মুসলিম বক্তাগণ এই শ্রেণীরই ব্যক্তি ছিলেন। এক্ষেত্রে হযরত আয়েশার (রাঃ) যোগ্যতাও কাহারও তুলনায় ন্যূন ছিল না। জঙ্গে জামাল অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বক্ষণে বসরাবাসীদেরকে লক্ষ্য করিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) যে মর্মস্পর্শী ও অগ্নিগর্ভ ভাষণ দান করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা চিরদিন অম্লান হইয়া থাকিবে। তাঁহার বক্তৃতায় একদিকে যেমন তেজবীর্যের প্রকাশ ছিল, অন্যদিকে আবার আকর্ষণীয় শক্তি এবং শালীনতার নিদর্শনও বজায় ছিল। তাহাছাড়া উহাতে তাঁহার একটি নিজস্বধারা এবং স্বাতন্ত্র্যও নিহিত ছিল।

আমীর মুআবিয়া বলেন যে, হযরত আয়েশার (রাঃ) মত অমন ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদানকারী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। তাবেয়ী মূসা ইবনে মূসা (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশার (রাঃ) মত এমন বিশুদ্ধ ভাষায় বক্তৃতা প্রদানকারী আর কাহাকেও আমার জানা নাই।

তাবেয়ী আহনাফ ইবনে কায়েস (রহঃ) বলেন যে, আমি হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ) প্রমুখ খ্যাতনামা সাহাবীদের বক্তৃতা

শুনিয়াছি কিন্তু হযরত আয়েশার (রাঃ) বক্তৃতার ভাব, ভাষা আমার নিকট অত্যন্ত প্রাঞ্জল, আকর্ষণীয়, বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হইয়াছে।

শিক্ষকতা ঃ হুযুরে পাক (সঃ)-এর রেহলত লাভের পর সাহাবায়ে কেরাম ইসলাম প্রচার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যোপলক্ষে মক্কা, তায়েফ, কুফা, বসরা, ইয়ামান, দামেশক, বাহরাইন প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। ফলে ঐ সমস্ত নগরী শিক্ষাগুরু সাহাবীদের অবস্থানহেতু ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে পরিণত হয়। তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলে মদীনায় বিভিন্ন দুর্যোগ, উপদ্রব ও চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর (রাঃ) আমলে কুফায় দারুল খেলাফত স্থানান্তরিত হয়। যাহার ফলে মদীনার বহু সাহাবীই মদীনা হইতে অন্যত্র চলিয়া যান এবং তাঁহাদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার ও দ্বীনি শিক্ষার কাজ চলিতে থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান চর্চার দিক দিয়া মদীনার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় ছিল। কারণ তখনও মদীনায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), ইবনে যায়েদ বিন সাবেত এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণ মদীনাতেই তাহাদের শিক্ষাদান কার্য জারী রাখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার যে শিক্ষা কেন্দ্র খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার বেশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বেই মদীনার গুরুত্ব সর্বাধিক অনুভূত হইতেছিল।

হযরত আয়েশার (রাঃ) শিক্ষালয় ছিল মসজিদে নববী। উহার শিক্ষত্রিয়ী ছিলেন তিনি নিজে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা প্রভৃতি সর্ব শ্রেণীর লোকই তাঁহার শিক্ষালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ছিল। কোন কোন সময় তাঁহার ছাত্র সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইত যে, তিনি তাঁহার মাহরাম শিষ্যদিগকে নিজের হুজরায় বসিতে দিতেন। সেখানে বসিয়াই তাহারা শিক্ষালাভ করিতেন।

তাঁহার শিক্ষাদান প্রণালী ছিল এইরূপ, তিনি স্বীয় হুজরায় পর্দার আড়ালে থাকিয়া সকলকে সবক দান করিতেন। কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কখনও কখনও তাঁহার এই শিক্ষালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দশ বার হাজার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন করিতেন। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ওরওয়াহ, কাসেম, আবু সালমা, মাসরু এবং সুফিয়া প্রমুখ ব্যক্তিগণ হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

মানবীয় প্রকৃতি

মানবকে আল্লাহ মানবসুলভ উপাদান দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং মানবকে কখনও একেবারে ফেরেশতার গুণে কল্পনা করা অবান্তর বৈকি। মানবের ভিতরে মানবসুলভ গুণের প্রভাব কখনও আত্মপ্রকাশ করিলে তাহা মানবের জন্য ব্যর্থতার নিদর্শন নয়; বরং তাহা সার্থকতারই লক্ষণ।

যাহারা কল্পনার আশ্রয় নিয়া মানুষের নিজস্ব ও স্বাভাবিক গুণকে ঢাকিয়া রাখিয়া তাহাকে ফেরেশতার স্বভাবে ও গুণে প্রকাশ করিতে চাহে, তাহারা অবাস্তবতার অনুসারী।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) নবীভার্য্যা হইলেও তিনি মানবী ছিলেন। হযরত রাসূলে পাক (সঃ) তাঁহার একান্ত প্রিয় স্বামী ছিলেন। তিনি তাঁহার পবিত্র কদমে স্বীয় হৃদয় নিংড়ানো প্রেমের অর্ঘ্য সবটুকু ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং

প্রতিদানে স্বামী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সবটুকু প্রেম পুরাপুরি নিজের জন্য কামনা করা তাঁহার পক্ষে মানবীয় প্রকৃতির দিক দিয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তদুপরি সপত্নী বেষ্টিত ক্ষেত্রে কিছুটা উৎকণ্ঠা ও উদ্বিগ্নতা এবং ভাবনা-চিন্তা কাহার না আছে? ইহা থাকিবেই। প্রকৃত মানবীয় গুণের আসল পরিচয় এই। সুতরাং অতি স্বাভাবিক নিয়মেই হযরত আয়েশার (রাঃ) ভিতরেও এই মানবীয় প্রকৃতির প্রভাব ছিল। আর তাহা ছিল বলিয়াই নবী (সঃ) পরিবারে দুই-একটি এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা যাইত, যাহা প্রতিটি মানুষের পরিবারে ঘটিয়া থাকে। নিম্নে এইরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রায় সমমর্যাদা সম্পন্না ছিলেন হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)। রূপে, গুণে, যোগ্যতায়, ক্ষমতায় এবং বংশ আভিজাত্যে দুইজনই প্রায় সমতুল্য ছিলেন। সুতরাং অতি স্বাভাবিক কারণেই ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এতটুকু স্পর্শকাতরতা, সতর্কতা এবং সামান্য ব্যতিব্যস্ততা থাকিবেই। ইহাতে ত্রুটি কিংবা দোষের পর্যায়ে নেওয়া যায় না।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর এক আদত ছিল, প্রায়শঃ আছরের নামাযের বাদে তিনি কিছু সময় প্রত্যেক বিবির হুজরায় গিয়া বসিতেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের সাথে স্বামী-স্ত্রীসুলভ আলাপালোচনা করিতেন। ন্যায়-নিষ্ঠ নবী (সঃ) প্রত্যেক মহিষীর গৃহেই সমান সময় কাটাইতে কোনরূপ কম-বেশী করিতেন না। সুতরাং সকল মহিষীই অত্যন্ত খুশী ছিলেন। হঠাৎ ঘটনা ক্রমে এই নিয়মে একটু পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। কিছুদিন ধরিয়া হুযুরে পাক (সঃ) হযরত জয়নব বিনতে জাহাশের (রাঃ) ঘরে একটু বেশী সময় কাটাইতে লাগিলেন। যাহার ফলে অন্যান্য বিবিদের স্বামী সাহচর্যের প্রাপ্য সময়ের কিছুটা অংশ কমিয়া গেল। ইহাতে তাঁহারা অধীরা হইয়া পড়িলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, হযরত জয়নব (রাঃ)-এর জনৈক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাঁহাকে মধু উপহার পাঠাইয়াছেন। হুযুরে পাক (সঃ) স্বভাবতঃই মধু অত্যন্ত ভালবাসেন। সুতরাং হযরত জয়নব (রাঃ) মধু দ্বারা শরবত বানাইয়া তাঁহাকে আপ্যায়ন করেন। ইহাতেই সামান্য কিছুটা বেশী সময় হুযুরে পাক (সঃ)-কে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতে হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) মানবীয় প্রবৃত্তি বশে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য হযরত হাফসা (রাঃ) ও হযরত সাওদা (রাঃ)-কে লইয়া সলা-পরামর্শ করতঃ এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তিনি সঙ্গিনী দুইজনকে বলিয়া দিলেন, অতঃপর হুযুরে পাক (সঃ) যখন আপনাদের গৃহে আগমন করিবেন, তখন আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহে বসিয়া হুযুরে পাক (সঃ)-কে বলিবেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আপনার পবিত্র মুখে মাগাফিরের দুর্গন্ধ অনুভব করিতেছি, ইহা যে বড়ই বিকট। (মাগাফির আরবের এক প্রকার কটুগন্ধ ফুলের নাম) হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহাদিগকে আরও শিখাইয়া দিলেন যে, কথাটি দুইজনেই একদিন না বলিয়া দুইদিন বলিবেন।

ঐ সময় হুযুরে পাক (সঃ)-এর দশজন বিবি বর্তমান ছিলেন। ইহাদের হুজরাসমূহে হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রবেশের দিক দিয়া হযরত জয়নব (রাঃ) ছিলেন ৭ম স্থানীয়া, ৮ম হাফসা, ৯ম সাওদা এবং তারপর ১০ম বা সর্বশেষ স্থানীয়া ছিলেন হযরত আয়েশা (রাঃ)। অতঃপর একদা বাস্তবিক হুযুরে পাক (সঃ) হযরত জয়নব (রাঃ)-এর গৃহ হইতে মধুর শরবত পান করিয়া পরবর্তী তিন মহিষীর গৃহে কথাবার্তা শুরু করিলে একে একে

তিনজনে তিনদিন তাহাদের গুপ্ত পরামর্শানুযায়ী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আপনার পবিত্র মুখ হইতে যেন কিসের কটুগন্ধ অনুভব করিতেছি। তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া হুযুরে পাক (সঃ) জীবনে কোনদিন আর মধু পান করিবেন না বলিয়া কসম করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (তাঁহার নবী একটি ভিত্তিহীন ঘটনার উপর এভাবে কসম করিবেন) তাহা পছন্দ করিলেন না। অতএব তন্মুহূর্তে তিনি ফেরেশতা জিব্রাঈলকে অহী লইয়া প্রেরণ করিলেন ঃ

ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু লিমা তুহাররিমু মা আহাল্লাল্লাহু লাকা তাবতাগী মারদ্বোয়াতে আয্ওয়াজিকা, অল্লাহু গাফুরুর রাহীম ক্বাদফারাদ্বাল্লাহু লাকুম তাহিল্লাতান আইমানিকুম আল্লাহু মাওলাকুম অহুয়াল আলীমুল হাকীম।

অর্থাৎ ঃ হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যাহা হালাল করিয়াছেন, স্বীয় পত্নীগণের সন্তোষ লাভের আশায় কেন তাহা আপনি নিজের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন? আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের উপর তোমাদের কসমসমূহের কাফফারা আদায় ফরজ করিয়া দিয়াছেন একং আল্লাহ-ই তোমাদের প্রকৃত বন্ধু তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞতাসম্পন্ন।

ঈলার ঘটনা

নবম হিজরী সন। আল্লাহর সেরা নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এই সময় একাধারে মহান পয়গাম্বর আবার দুনিয়ারও শাহানশাহ। এই সময় প্রায় সমগ্র হেজায এলাকা তাঁহারই করায়ত্তে। ৮ম হিজরী সনে জন্মভূমি মক্কায়ও তাঁহার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মোটকথা হুযুরে পাক (সঃ)-এর এবং মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা তখন স্বচ্ছল এবং সন্তোষজনক। মদীনায় তখন চারিদিক হইতে নজর, উপঢৌকন, হাদিয়া প্রভৃতি আকারে প্রচুর অর্থ আমদানী হইতেছিল। তাহা ছাড়া বিভিন্ন যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল এবং খায়বার ও অন্যান্য এলাকা হইতে কর বাবত সংগৃহীত শস্য ও অর্থে মদীনার পার্থিব জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার এতটুকু মাত্র দৃষ্টি বা আকর্ষণ ছিল না। তিনি যে প্রেরিত হইয়াছিলেন সত্য, ন্যায় ও খাঁটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে; পার্থিব ভোগ-বিলাস এবং দুনিয়ার আরাম-আয়েশ লাভের জন্য নয়।

কাজেই চারিদিক হইতে হুযুরে পাক (সঃ)-এর দরবারে ধন-সম্পদ যতই সংগৃহীত হইত সাথে সাথে উহা সবই বাইতুল মালের তহবিলে জমা হইয়া ২ত। ঐ তহবিলে একজন সাধারণ মুসলমান এবং খোদ হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর অংশ কোনই তফাৎ ছিল না। সুতরাং নবী-পত্নীদিগের খোর-পোষের জন্য যে পরিমাণ শস্য, খেজুর ও অর্থাদি নির্দিষ্ট ছিল, তাহা একে তো খুবই সামান্য ছিল, তদুপরি তাঁহাদের দানশীলতা, অতিথিপরায়ণতা এবং দুঃস্থদিগের সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতির জন্য উহার দ্বারা কিছুই হইত না। খুব হিসাব করিয়া চলিলে এবং দান-দাক্ষিণ্যের হাত খাট করিয়া ফেলিলে হয়ত কোন রকমে চলিয়া যাইত। কিন্তু দান-ছদকাহ করিয়া রিক্তহস্ত হইয়া পড়ার কারণে কখনও কখনও তাঁহাদের অবস্থা এমন দাঁড়াইত যে, একাধারে কয়েকদিনের মধ্যে তাঁহাদের উনানে আগুন জ্বলিত না। তেলাভাবে রাত্রে বাতি জ্বালাইবার মত অবস্থা থাকিত না।

আজওয়াযে মুতাহহারাতের (পুণ্যময়ী নবী-পত্নীগণ) মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত অভিজাত এবং ধনীগৃহের দুহিতা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ), হযরত হাফসা (রাঃ), হযরত জোয়াইরিয়া প্রমুখ ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্যা। পিতৃগৃহে তাঁহারা কেহই কোনদিন অভাব দেখেন নাই। তাই তাহারা স্বামী হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর গৃহে আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে থাকিয়া যখন মদীনায় যথেষ্ট সম্পদের সমাগম দেখিতে লাগিলেন, তখন তাহারা সকলেই নিজেদের নির্দিষ্ট ভাতার পরিবর্তন করতঃ উহা বৃদ্ধি করাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। একদিন তাঁহারা সকলেই হুযুরে পাক (সঃ)-এর চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজনের ফিরিস্তি উল্লেখ করতঃ ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী করিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) অবশ্য তখন যেমন অবস্থায় ছিলেন তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দাবী মিটাইবার মত যথেষ্ট সামর্থ্য তাঁহার ছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহ্ প্রেরিত মহামানব হইয়া রোম বা পারস্য সম্রাটের মত চলিবেন! ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? হুযুরে পাক (সঃ) বিবিগণের আব্দারে খুবই মনঃক্ষুণ্ন হইলেন। এই সময় হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) হুযুর (সঃ)-এর দরবারে আসিয়া দেখেন যে, নবী-পত্নীগণ সকলেই নবী (সঃ)-কে ঘিরিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ দাবী ও আব্দার পেশ করিতেছেন। ইহাতে হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) নিজ নিজ কন্যাদ্বয়কে শাসাইয়া বলিলেন, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাঁহাদের নিজ নিজ পিতার নিকট হইতে চাহিয়া লন। এই ব্যাপারে যেন এভাবে হুযুরে পাক (সঃ)-কে অতিষ্ঠ না করেন। ফলে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) তাঁহাদের দাবী পরিত্যাগ করিলেও অন্যান্য বিবিগণ নিজ নিজ দাবীতে অটল রহিলেন। শেষ পর্যন্ত ইহাতে হুযুরে পাক (সঃ) খুবই অসন্তুষ্ট হইলেন। ঘটনাক্রমে এমনি সময় তিনি একটি ঘোড়ার উপর হইতে সহসা পড়িয়া যান এবং একটি গাছের শিকড়ে লাগিয়া পাঁজরে আঘাত পান। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরার উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। সিঁড়ি বাহিয়া তাহাতে আরোহণ করা হইত। হুযুরে পাক (সঃ) সেখানেই শয্যা পাতিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, তিনি একমাস পর্যন্ত স্বীয় বিবিগণ হইতে দূরে থাকিবেন। ইহাতে মুনাফিকদের একটি সুযোগ জুটিয়া গেল। তাহারা চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল যে, হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহার সকল বিবিকে তালাক দিয়াছেন।

ঠিক এই সময় আর একটি ব্যাপার ঘটিল, তাহা এই যে, হযরত ওমর (রাঃ) ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে কিছুটা বাক-বিতণ্ডাকালে হযরত ওমর-পত্নী বলিলেন যে, তাহাদের কন্যা হাফসা (রাঃ) স্বামী রাসূলে করীম (সঃ)-এর কথার প্রতিবাদ করেন এবং তাহাতে হুযুরে পাক (সঃ) সারাদিনই ক্রোধান্বিত অবস্থায় দিনাতিপাত করেন। একথা ওমর (রাঃ)-এর কানে পৌঁছামাত্র তিনি কন্যার কাছে উপস্থিত হইয়া এই বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জবাবে বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা সকলেই তাঁহার কথার উত্তর করিয়া থাকি।

হযরত ওমর (রাঃ) তখন স্বীয় কন্যাকে ইহার অপকারিতা সম্পর্কে বিশেষভাবে বুঝাইয়া ভবিষ্যতে আর কখনও এইরূপ না করার জন্য সতর্ক করিয়া দিলেন। অতঃপর স্বীয় আত্মীয় সম্পর্কিত হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকেও এ বিষয় উপদেশ প্রদান করিলেন। জবাবে হযরত উম্মে সালমা বলিলেন, ওমর ইব্নে

খাত্তাব! অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আপনি প্রত্যেকটি ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করিতে আসেন। এমন কি আপনি হুযুরে পাক (সঃ) এবং তাঁহার বিবিগণ সম্পর্কিত ঘরোয়া ব্যাপারেও অনধিকার চর্চা করিতে চাহেন।

হযরত উম্মে সালমার কড়া কথা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) অনেকটা দমিয়া গিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া গেলেন।

ঠিক সেইদিনই হযরত ওমর (রাঃ)-এর জনৈক আনছার বন্ধু ওমর (রাঃ)-এর গৃহদরজায় উপস্থিত হইয়া দরজার কপাটে করাঘাত করিলেন এবং শীঘ্র দরজা খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) অবশ্য গৃহমধ্যেই ছিলেন। ঐ সময় কয়েকদিন ধরিয়াই মদীনায় জনৈক গাসসানী কাওমের বাদশাহর আক্রমণের কথা মুখে মুখে প্রচারিত হইতেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার বন্ধুর ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি. হে! গাসসানীরা আক্রমণ করিয়াছে না কি? লোকটি জবাব দিল, তা অবশ্য নয়, তবে খবর তদপেক্ষাও গুরুতর। হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহার সমস্ত বিবিদের হইতে আলাদা হইয়া গিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) এই খবর শুনামাত্র সশব্যস্তে তখনই গৃহ হইতে বাহির হইয়া সোজা কন্যা হাফসার (রাঃ) কাছে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তিনি বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) অতঃপর মসজিদে নববীতে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, সাহাবীদের একটি দল মিম্বরের চারিপার্শ্বে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। হুযুরে পাক (সঃ) তখনও সেই উর্ধে স্থাপিত কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত কক্ষ সংলগ্ন সিঁড়ির নিকট জনৈক হাবসী গোলাম দণ্ডায়মান ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) উক্ত গোলামের মাধ্যমে হুযুরে পাক (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু এইভাবে পর পর দুইবার চেষ্টা করিয়াও অনুমতি পাওয়া গেল না। ইতোপূর্বে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণও এইভাবে অনুমতি লাভে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তিনি সহজে দমিলেন না। তিনি তৃতীয়বারে হাবসী গোলামকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, ওহে! বল যে, ওমর ইবনে খাত্তাব হুযুরে পাক (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হওয়ার প্রার্থনা করিতেছে।

এইবার হযরত ওমর (রাঃ) অনুমতি লাভ করিলেন। তিনি এইবার হুযুরে পাক (সঃ)-এর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সালাম আরজ করিলেন। ওমর (রাঃ) লক্ষ্য করিলেন, হুযুরে পাক (সঃ) একটি খালি চাটাইর উপর খালি গায়ে শায়িতা আছেন, মাথার নীচে খেজুর ছালভর্তি চামড়ার একটি বালিশ। হুযুরে পাক (সঃ)-এর পবিত্র পিঠে চাটাইয়ের দাগ বসিয়া গিয়াছে। তাহা দেখিতে পাইয়া হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদিয়া দিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বেদনাজড়িত কণ্ঠে জওয়াব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! রোম ও পারস্যের সম্রাটগণ কি সুখে কালযাপন করেন আর যিনি স্বয়ং আল্লাহর প্রেরিত সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্রাট তাঁহার অবস্থা এই! হুযুরে পাক (সঃ) বলিলেন, ওমর! তাহাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া আর আমাদের জন্য চিরস্থায়ী পরকাল।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ) ! আপনি কি উম্মুহাতুল মুমিনীনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন?

হুযুরে পাক (সঃ) বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, না, তাহা করি নাই তো! একথা শ্রবণ করতঃ হযরত ওমর তৎক্ষণাত মসজিদে চলিয়া আসিয়া সকলের কাছে এই সংবাদ জানাইলেন। এই শুভ সংবাদ শুনিয়া সকলের চোখে-মুখে আনন্দের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল এবং তাহারা আল্লাহ তায়ালার শোকর গুজারী করিতে করিতে যাহার যাহার বাড়ী প্রত্যাবর্তন করিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ) শপথ করিয়াছিলেন যে, এক মাসের মধ্যে তিনি কোন বিবির সাথে সাক্ষাত করিবেন না। এই দীর্ঘ একটি মাসের বিচ্ছেদ যাতনা হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা কঠোর মনে হইতেছিল। তিনি মাসটির একটি একটি করিয়া দিনের হিসাব করিয়া যাইতেছিলেন যে, কবে মাসটি শেষ হইবে। যেদিন এক মাস শেষ হইয়া গেল, হুযুরে পাক (সঃ) নামিয়া আসিয়া সর্বপ্রথম হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরাতেই গমন করিলেন। তিনি এতদিন পর হুযুরে পাক (সঃ)-কে নিকটে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) হিসাব মত ঐদিন মাসের ২৯ তারিখ অতিক্রান্ত হইয়া ৩০ শুরু হইয়াছিল। অতএব তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আপনি তো এক মাসের ঈলা করিয়াছিলেন কিন্তু সে একমাস তো শেষ হয় নাই। আজ তো মাসের শেষ দিনটি চলিতেছে।

হুযুরে পাক (সঃ) এরশাদ করিলেন, না আয়েশা! কোন কোন মাস ২৯ দিনেও হইয়া থাকে। এ মাসটিও সেই ২৯ দিনেরই একটি মাস।

তা'খীর বা দুইটি বস্তুর একটি গ্রহণ করার অধিকার প্রদান

ইতোপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযুরে পাক (সঃ)-এর মহিষীগণ কিছুটা আরাম-আয়েশ এবং সুখ-শান্তি কামনার প্রেক্ষিতে হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাদের সাথে ঈলা বা অভিমানসুলভ সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন। অবশ্য তাহাতে তাঁহারা দাবী ও আবদারের ব্যাপারে একেবারেই দমিয়া গিয়াছিলেন। তবু প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখার প্রয়োজনে ঈলার ঘটনার কয়েকদিন পরেই আল্লাহ তায়ালা নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন ঃ

"হে নবী (সঃ)! আপনি আপনার পত্নীগণকে বলুন যে, তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং উহার শোভা-সৌন্দর্য কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদিগকে উহার ফল ভোগ করাইব এবং তোমাদিগকে উত্তম বিদায়ে বিদায় দান করিব। আর যদি তোমরা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আখেরাত কামনা কর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার পুণ্যবান মহিষীগণের জন্য মহাপুরস্কার প্রস্তুত রাখিয়াছেন।"

আল্লাহ পাকের এই প্রত্যাদেশ নাযিল হইবার পর হুযুরে পাক (সঃ) সর্বপ্রথম হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট গমন করিয়া এরশাদ ফরমাইলেন, আমি তোমাকে একটি কথা বলিব। তবে উহার জওয়াব দেওয়ার ব্যাপারে তোমার ব্যতিব্যস্ততার প্রয়োজন নাই। তুমি তোমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবে। তারপর হুযুরে পাক (সঃ) সদ্য অবতীর্ণ আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) উহা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! এই ব্যাপারে পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করার কি আছে? আমি অবশ্যই আল্লাহ, রাসূল এবং পরকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পছন্দ করি। হযরত আয়েশার (রাঃ) এই উত্তর শুনিয়া হুযুরে পাক (সঃ)-এর মুখমণ্ডলে

আনন্দের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পুনরায় হুযুরে পাক (সঃ)-কে অনুরোধ জানাইলেন, যেন অন্যান্য উম্মুহাতুল মু'মিনীনের নিকট তাঁহার এই জওয়াব প্রকাশ না করেন।

অতঃপর হুযুরে পাক (সঃ) একে একে তাঁহার প্রত্যেক মহিষীর নিকট গমন করিয়া এই সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত জানিতে চাহিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রত্যেক মহিষীই হযরত আয়েশার (রাঃ) ন্যায় একইরূপ জওয়াব প্রদান করিলেন।

হযরত আয়েশার (রাঃ) জীবনে একটি অবান্তর অপবাদ বা এফকের ঘটনা

মদীনায় হিজরতের পরে মুসলমানগণ কাফিরদের অত্যাচার, হত্যার আশঙ্কা প্রভৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিলেন এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম করিবার সুযোগ পাইলেন ঠিকই; কিন্তু সেখানে তাঁহারা একটি নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলেন। মদীনায় একদল মুনাফিক ছিল। তাহারা ইসলামের সাথে শত্রুতায় অবতীর্ণ হইয়া মুসলমানদের সাথে পাড়িয়া উঠিবে না মনে করিয়া গোপনে ও কৌশলে তাহারা যে কোনভাবে শত্রুতাচরণ করিতে লাগিল। প্রকাশ্যে তাহারা মুসলমানদের কাছে নিজেদেরকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিত আবার গোপনে ইসলামের শত্রু কাফির-মুশরিকদের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিত যে, আমাদের সম্পর্কে তোমরা ভুল ধারণা করিও না। আমরা তোমাদের সাথেই আছি। মুসলমানদের অপকার, অহিত সাধন এবং ধ্বংস করাই কাম্য।

ইহারা মুলমানদের পারিবারিক ও ঘরোয়া ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে কলহ ও বিবাদ সৃষ্টির চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, মনোমালিন্য এবং শত্রুতা উদ্ভবের চেষ্টা করিতেছিল। তাহা ছাড়া মিথ্যা গুজব রটাইয়া নিখুঁত নিষ্কলঙ্ক চরিত্রবান মুসলমান নর-নারীদের নামে অপবাদ প্রচার করিত। মদীনার এই মুনাফিক দলটির সর্দার ছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই। আল্লাহ তায়ালার কি অপূর্ব কুদরত এবং দুর্ভেদ্য রহস্য! হুযুরে পাক (সঃ)-এর পাক-পবিত্র মহিষী হযরত আয়েশা (রাঃ) ইহাদের এক গভীর কুচক্রের শিকার হইলেন। অবশ্য তাঁহার একগাছি কেশাগ্রও স্খলিত হইল না; বরং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্যদান করতঃ দুনিয়াতে তাঁহার মর্যাদা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। উক্ত ঘটনাটি ছিল এই ঃ

পঞ্চম হিজরী সনের ২রা শাবান সোমবার দিন নজদের বনী মুসতালেক কবিলার সাথে মুসলমানদের একটি ছোট-খাট যুদ্ধ হইয়াছিল নজদের প্রান্তসীমায় মোরায়সী নামক একটি কূপের নিকটে।

এই যুদ্ধটি যে তেমন গুরুতর হইবে না এবং ইহাতে আহত বা নিহত হইবারও তেমন আশঙ্কা নাই। পক্ষান্তরে ইহাতে প্রচুর গনিমতের মাল মিলার সম্ভাবনা আছে ইহা পূর্বাহ্নেই আন্দাজ করিয়া মুনাফিকদের একটি বিরাট বাহিনী এই যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে শামিল হইয়াছিল।

এই যুদ্ধ সফরে হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহগামিনী হইয়াছিলেন। তিনি এইসময়ে যদিও সপ্তদশ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন তবে দৈহিক শীর্ণতা এবং হাল্কা-পাতলা হওয়ার কারণে তাঁহার দেহের ওজন ছিল খুবই কম।

প্রবাসে তাঁহার জন্য একটি হাওদাবিশিষ্ট ভিন্ন উষ্ট্রের ব্যবস্থা করা হইল। তিনি উক্ত হাওদায় অবস্থান করিতেন। হাওদায় আরোহণ করিবার পর তাঁহাকেসহ হাওদাটি ধরিয়া

উটের পিঠে তুলিয়া দেওয়া হইত। তাঁহার দেহের ওজন এত কম ছিল যে, তাহাকেসহ হাওদা তুলিতে একজন সবল ব্যক্তির এতটুকু বেগ পাইতে হইত না!

মোরায়সীর যুদ্ধে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটিল না। যুদ্ধশেষে হুযুরে পাক (সঃ) মুজাহিদ বাহিনীসহ মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে ৫ই শাবান বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে একস্থানে রাত্রি যাপনোপযোগী তাঁবু স্থাপন করিলেন। রাত্রিশেষে অতি প্রত্যুষে উঠিয়া কাফেলা যখন পুনঃ রওয়ানা হওয়ার আয়োজন শুরু করিল, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁবুর অদূরে একটি নির্জন স্থানে এস্তেঞ্জায় গমন করিলেন। ইহাই হযরত আয়েশার (রাঃ) জীবনে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক একটি দুর্যোগ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিল।

অল্পবয়স্কা বালিকা হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বামীর সহিত সফর যাত্রাকালে ভগ্নি আসমার (রাঃ) নিকট হইতে গলার এক ছড়া হার চাহিয়া লইয়া উহা নিজ গলায় পরিয়াছিলেন। সব সময় উহা তাঁহার গলায়ই শোভা পাইত। যখন তিনি তাঁবু হইতে বাহির হইয়া অদূরে এস্তেঞ্জা উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন, তখনও উহা তাঁহার কণ্ঠে শোভা পাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ কি ব্যাপার ঘটিল! এস্তেঞ্জা সারিয়া তিনি তাঁবুর দিকে ফিরিয়া চলিলেন তখন আর তাঁহার গলায় তিনি হার ছড়া দেখিতে পাইলেন না। তিনি তখন যেখানে এস্তেঞ্জায় গিয়াছিলেন, হয়ত হার ছড়া সেখানে পড়িয়া গিয়াছে, এই ধারণায় উহার তালাশে আবার ফিরিয়া গেলেন। এদিকে কিন্তু কাফেলার যাত্রার আয়োজন শেষ হইল। তাহারা এখনি যাত্রা করিবে। হযরত আয়েশার (রাঃ) হাওদা উষ্ট্রের পিঠে উঠাইয়া দেওয়া হইল। যেই লোকে হাওদা উঠাইয়া দিল, সে মনে করিল যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্ভবতঃ হাওদার ভিতরেই আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাফেলার যাত্রা শুরু হইল। ওদিকে হযরত আয়েশা (রাঃ) কিন্তু নির্জন মরু প্রান্তরে একাকী পড়িয়া রহিলেন।

প্রবাসে চলা-ফিরার রীতি-নীতি সম্পর্কে হযরত আয়েশার (রাঃ) তেমন বিশেষ জানা-শুনা ছিল না। হার অন্বেষণ করিতে গিয়াই তিনি বিলম্ব করিয়া ফেলিলেন। বিলম্বের অবশ্য কতকগুলি কারণও ছিল। যেমন একে তো অনভিজ্ঞা বালিকা সফরে চলার রীতি-নীতি জানিতেন না। ২য় ঃ গহনার মায়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তদুপরি গহনা বা হার ছড়া তাঁহার নিজের ছিল না, ইহা ছিল অন্য লোকের। হাওলাত করিয়া লইয়াছিলেন তিনি উহা অন্য লোকের নিকট হইতে। আর এই শেষোক্ত কারণেই তিনি অত্যধিক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অধিক উদ্বিগ্নতা হেতুই তিনি কাফেলার কাহারও নিকট বলিয়া-কহিয়া যে হার অন্বেষণে সময় ব্যয় করা যায় নতুবা কাফেলার লোকগণ অজানা অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়া রাখিয়া রওয়ানা হইয়া যাইতে পারে এ কথাটাও খেয়াল হইল না।

যাহা হউক, কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তালাশ করিয়া হার পাইবার পর তিনি দ্রুত গতিতে যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আসিয়া দেখেন যে, তাঁবু বা লোকজনের চিহ্নমাত্র নাই। হুযুরে পাক (সঃ) সঙ্গীদেরসহ তাঁবু গুটাইয়া রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) অবলা বালিকা, তাঁহার নিকট নির্জন মরুপথ একান্তই অজানা অচেনা। কোন দিকে, কোন পথে তিনি এখন যাইবেন, তাহা তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার মনে এই খেয়াল জাগিল, রাস্তা যখন কিছুই জানা নাই, তাই কোন দিকে না যাইয়া এখানে অবস্থান করাই সর্বোত্তম। আগে-পরে যখনই প্রকাশ পাইবে যে,

হাওদার মধ্যে আয়েশা নাই। উহা লোকশূন্য, তখনই হুযুরে পাক (সঃ) এখানে তাঁহাকে নিতে আসিবেন। এইকথা চিন্তা করিয়াই তিনি একখানা চাদর দ্বারা সারাদেহ ঢাকিয়া ঐখানেই গভীর চিন্তাগ্রস্তভাবে বসিয়া রহিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ) সফরে চলাচল কালে কতকগুলি রীতি-নীতি অনুসারে সবকিছু করিতেন। তাঁহার একটি নিয়ম ছিল, কোন স্থান হইতে তাঁবু গুটাইয়া যাত্রা করিবার কালে একজন লোক সেখানে থাকিয়া যাইতেন। ভুলে বা কোন কারণবশতঃ কাফেলার কোন মাল-সামান সেখানে থাকিয়া গেলে ঐ লোকটি তাহা উঠাইয়া লইয়া পরে গিয়া কাফেলার সাথে মিলিত। ঐদিন কাফেলার মাল-সামান খুঁজিয়া দেখার কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন সাফওয়ান ইবনে মুআত্তিল (রাঃ)।

ছোবহের রোশনাই তখনও ভালভাবে বিচ্ছুরিত হইয়া চারিদিক পুরাপুরি পরিষ্কার হয় নাই। দূরের বস্তু কেবল অস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়। একটু দূর হইতেই সাফওয়ান লক্ষ্য করিলেন, জমির উপরে কি যেন একটি বস্তু দেখা যাইতেছে, তবে উহা কি তাহা বুঝা গেল না। নিশ্চয় উহা কাফেলারই কোন জিনিস হইবে মনে করিয়া তিনি দ্রুতপদে সেখানে চলিয়া গেলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এখানে এভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্ময়ের ঘোরে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে দেখিয়া তাঁহার চিনিতে মোটেই কষ্ট হইল না। কেননা পর্দার আয়াত নাযিল হইবার পূর্বে তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহাকে এভাবে এখানে দেখিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন ঃ "ইন্নালিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) মুদিত নেত্রে বসিয়াছিলেন। সাফওয়ানের মুখের আওয়াজ শুনিয়া তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন। কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। সাফওয়ানও কোন কিছু বলিলেন না। তবে মনে মনে অবশ্য অনুভব করিলেন যে, কোন অসতর্কতামূলক কাজের ফলেই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও জানিতেন যে, সাফওয়ান হুযুরে পাক (সঃ)-এর কাফেলারই লোক।

সাফওয়ান তাঁহার কর্তব্য স্থির করিয়া স্বীয় উটকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, ইয়া উম্মুল মু'মিনীন! উটের পৃষ্ঠে বসুন। হযরত আয়েশা (রাঃ) উটের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর সাফওয়ান উটের লাগাম ধরিয়া কাফেলার পরবর্তী মঞ্জিল অভিমুখে দ্রুতগতিতে উষ্ট্র চালনা করিতে লাগিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) উটের পৃষ্ঠে দৃঢ়ভাবে বসিয়াছিলেন আর সাফওয়ান উটটিকে দ্রুতবেগে চালনা করিয়া নিজে উহার লাগাম ধরিয়া উহার সাথে একরূপ দৌড়াইতে লাগিলেন। এইভাবে চলিয়া দিবা প্রায় দ্বিপ্রহর কালে গিয়া তাঁহারা হুযুরে পাক (সঃ)-এর কাফেলার সাথে মিলিত হইলেন।

প্রবাসে পথ চলাকালীন এ সামান্য ঘটনাটিতো তেমন কিছুই নহে। যান-বাহন ও পথ চলাচল ব্যবস্থার এই চরম উন্নতির যুগেও মানুষ পথে-ঘাটে নানারূপ বিপদাপন্ন হয় যাহার ফলে তাহাকে পথে দুই-চারিদিন অবস্থানও করিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও কোনরূপ কুকথার সৃষ্টি হয় না এবং হইবার কথাও নয়। কিন্তু কি বলিব অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস বৈ কি! ইসলাম ও মুসলমানের পরম শত্রুদল ক্ষতি ও শত্রুতা সাধন কল্পে সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। এইবার এক সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া জঘন্য মনোভাবাপন্ন মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ভয়ানক এক মিথ্যা দুর্নাম রটাইয়া দিল যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) অপবিত্রা হইয়াছেন।

পরম দুঃখ ও ক্ষোভের কথা যে, কতিপয় অজ্ঞ ও অদূরদর্শী মুসলিম নর-নারীও এই ব্যাপারে অল্প-বিস্তর শরীক হইয়াছিল। অবশ্য তাহার পিছনে ছোট-খাট কতকগুলি ঘটনাও সক্রিয় ছিল। ইহাদের মধ্যে একজন ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আসাসা। এই ব্যক্তি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এরই অন্নে পালিত, উপরন্তু তাঁহার আত্মীয়ও ছিল। এই লোকটি কেন যে এই মিথ্যা অপবাদ প্রচারে লিপ্ত হইয়াছিল তাহার কারণ অবশ্য জানা যাইতেছে না। তবে বিবি হাসনা বিনতে জাহহাস ছিলেন খোদ হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর ফুফাত ভগ্নি। ইনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত জয়নবের (রাঃ) সহোদরা ভগ্নি ছিলেন। এই মহিলা স্বীয় ভগ্নি জয়নব (রাঃ)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী তথা সপত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হেয় ও অপমানিত করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুতরাং এইবার সুযোগ পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিলেন।

কবি হাসসান ইবনে সাবেতের আয়েশার (রাঃ) সাথে এইরূপ শত্রুতা ছিল না ঠিকই, কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) যাহার উষ্ট্রে চড়িয়া আসিয়াছিলেন সেই সাফওয়ান তাহার প্রতিবেশী ছিলেন। এই প্রতিবেশীর দিন দিন সম্মান বৃদ্ধিতে কবি হাসসান মনে মনে তাহার প্রতি খুবই ঈর্ষাকাতর ছিলেন। সুতরাং তাহার সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যেই তিনি এইরূপ মারাত্মক অপপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এই দারুণ ঘটনা হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, এইবার তাহাই উল্লেখ করিতেছি। এইসব প্রচারণা বা ঘটনার কথা তখনও হযরত আয়েশার (রাঃ) কানে আসে নাই। এমনি অবস্থায় একদা রাত্রে তিনি আসাসাহ উম্মে মাসতাহকে সঙ্গে লইয়া এস্তেঞ্জা করিতে গৃহের বাহিরে গেলন। এই উম্মে মাসতাহ হঠাৎ পায়ে একটি আঘাত পাইয়া অজ্ঞাত কারণবশতঃ স্বীয় সন্তান মাসতাহকে অভিসম্পাত দিলেন। শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, মাসতাহ হুযুরে পাক (সঃ)-এর একজন সাহাবী বৈ ত নয়। সুতরাং এইভাবে অভিশাপ দেওয়া উচিত হইল না।

জবাবে উম্মে মাসতাহ বলিলেন, হউক না সাহাবী। কি সে যে অত্যন্ত হীন প্রবৃত্ত এবং চরম মিথ্যাবাদী। এই বলিয়া পুত্র মাসতাহ কর্তৃক হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে কুৎসা প্রচারের ঘটনাটি তিনি তাঁহার নিকট আনুপূর্বিক বিবৃত করিলেন।

ঘটনা শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) একেবারে নির্বাক-নিস্পন্দ জড় বস্তুর মত হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখে আর কোন কথা যোগাইল না। তিনি কিছুক্ষণ নির্জীবের মত বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া কোনরূপে টলিতে টলিতে পিতৃগৃহে গমন করিলেন। তথায় গিয়া স্বীয় জননীর কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কন্যাকে নানাভাবে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দান করিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পর হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর প্রতিবেশী জনৈক আনসার মহিলা আসিয়া বিষয়টি আদ্যোপান্ত বলিয়া গেলেন। তখন বুঝা গেল, ঘটনাটি মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। জনক-জননী বহু যত্নে তাঁহাকে হুঁশ করাইয়া নানাভাবে প্রবোধ দান করতঃ স্বামী হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

তিনি স্বামীগৃহে গমন করিলেন কিন্তু তথায় যাইবার পরেই জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় হুযুরে পাক (সঃ) গৃহে ছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে গৃহে প্রত্যাবর্তন

করিয়া তিনি হযরত আয়েশার (রাঃ) অবস্থা দেখিয়া তাঁহার শরীরের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

হযরত আয়েশার (রাঃ) মন অতি স্বাভাবিক কারণেই দুর্বল ছিল। সন্দেহ ও সংকোচ তাঁহার মনে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। তাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল তাঁহাকে এইরূপ ভীষণ রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখিয়াও যেন স্বামী রাসূলে করীম (সঃ) তাঁহার সহিত সহৃদয়তা প্রকাশ এবং সস্নেহ ব্যবহার প্রদর্শনের বদলে শুধু নিরস আচরণ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার প্রতি হুযুরে পাক (সঃ)-এর সেই পূর্বের আকর্ষণ এবং আন্তরিকতার যেন কোন নিদর্শনই অবশিষ্ট নাই। তিনি নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর স্বামীগৃহে অবস্থান করিতে মন চাহিল না। অতএব তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর অনুমতি গ্রহণ করতঃ পুনরায় পিতৃগৃহে প্রস্থান করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি শুধু কাঁদিয়া কাটাইতে লাগিলেন। ব্যথিত জননী উম্মে রাওমান তাঁহাকে নানারকম সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু ভগ্নহৃদয়া হযরত আয়েশার (রাঃ) মন কোন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। তিনি এত বেশী ব্যাকুলিতা হইয়া পড়িলেন যে, একবার তিনি কূপের পানিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) অবশ্য তাঁহার প্রিয় পাত্রী হযরত আয়েশার (রাঃ) চরিত্র ভালরূপেই জানিতেন। তাঁহার মনে হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি কোনরূপ সন্দেহের উদয় হইল না। তবু মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্য সত্য ও নিখুঁৎ বস্তুকেও যাচাই করা দরকার। এই নীতি অনুযায়ী তাঁহার কতিপয় প্রধান সাহাবীর কাছে বিষয়টি ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা সকলেই হযরত আয়েশার (রাঃ) অম্লান-পবিত্র এবং উন্নত চরিত্রের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিলেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) নিজস্ব পরিচারিকা বারিরাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "সুবাহানাল্লাহ! আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে আমি এমনভাবে জানি যেমন স্বর্ণকার খাঁটি স্বর্ণকে চিনিয়া থাকে। তাঁহার মধ্যে কোনরূপ খুঁতের লেশমাত্র নাই।"

হযরত আয়েশার (রাঃ) সপত্নীদের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষতার একমাত্র দাবীদার ছিলেন যয়নব (রাঃ)। তাঁহার নিকটও হযরত আয়েশার (রাঃ) চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল। তিনি জবাব দিলেন, আয়েশার (রাঃ) মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ছাড়া কোনদিন কোনরূপ দোষের লক্ষণ দেখি নাই।

অতঃপর হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহার সাহাবীদেরকে মসজিদ প্রাঙ্গণে সমবেত করিয়া জনে জনে নবী পরিবারের বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা এবং মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কুকীর্তির কথা উল্লেখ করতঃ বলিলেন, হে সহচরবৃন্দ! দুরাচার আবদুল্লাহ নবী পরিবারের প্রতি দুর্নাম রটাইয়া কি দুর্যোগ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা দেখিতেই পাইতেছ। এখন বল, উহার কি করা দরকার? সঙ্গে সঙ্গে কবিলায় আওসের নেতা সাআদ ইবনে মাআয বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আমার স্ববংশীয় বা আমার ভ্রাতা খাযরাজ বংশেরই হউক না কেন, আমি এই মুহূর্তে তাহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব।

হুযুরে পাক (সঃ) তখন তাঁহাকে এবং অন্যান্য উত্তেজিত সাহাবীদেরকে ধৈর্যধারণ করিতে বলিয়া বৈঠক হইতে উঠিয়া গিয়া হযরত আয়েশার (রাঃ) রোগ শয্যার পার্শ্বে গমন করিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং বিবি উম্মে রাওমান (রাঃ) তখন তাঁহার পরিচর্যায় রত ছিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করতঃ বলিলেন, আয়েশা! আমি কিছুই জানি না, রটনা যদি সত্য হয় তবে তুমি আল্লাহর নিকট তওবা কর। মহান ক্ষমাশীল তোমাকে ক্ষমা করিবেন, আর মিথ্যা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পবিত্রতা আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে ঘোষণা করিবেন।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর বাক্য শুনিয়া তেজস্বী হযরত আয়েশার (রাঃ) ক্ষুব্ধ হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আমার অবস্থা ঠিক ইউসুফ-জনক হযরত ইয়াকুব নবীর অনুরূপ। তিনি বলিয়াছিলেন, ধৈর্য ধরিয়া থাক। আমি তদ্রূপ ধৈর্যই অবলম্বন করিলাম। হুযুরে পাক (সঃ) কিন্তু হযরত আয়েশার (রাঃ) কথায় পূর্ণ শান্ত এবং আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। তিনি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁহার প্রিয় নবীর (সঃ) এই মনের অস্বস্তি কতক্ষণ আর সহ্য করিবেন? সতী সাধ্বী হযরত আয়েশার (রাঃ) পবিত্রতার সাক্ষ্য তিনি নিজেই দিবার মনস্থ করিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এরও নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় তাঁহার পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। তবে আল্লাহ যে এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল করিবেন, ইহা তিনি কল্পনা করেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হয়ত স্বপ্নযোগে এই বিষয়টি জানিতে পারিবেন। কিন্তু মাহবুবে খোদার অতি প্রিয়তমা সহধর্মিণী যে স্বয়ং আল্লাহরও অতি প্রিয়জন। তাই আল্লাহ তায়ালা হযরত আয়েশার (রাঃ) এই পবিত্রতার কাহিনীকে মানব সমাজে চিরঞ্জীব করিয়া রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন।

মহান করুণাময় আল্লাহর কি অপূর্ব করুণা! হঠাৎ লক্ষ্য করা গেল, হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিমর্ষ বদনে স্মিত হাস্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার উজ্জ্বল ললাট্ এবং কপোলদ্বয় পবিত্র স্বেদবিন্দুচ্ছটায় সিক্ত হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালার অহী লইয়া ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) অবতীর্ণ হইলেন। এইবার আল্লাহর নবীর (রাঃ) বেদনাদগ্ধ অন্তরখানা পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি অগণিত শোকরিয়া জ্ঞাপন করিলেন আল্লাহর দরবারে। অহী নাযিল সমাপ্ত হইবার পরক্ষণেই হুযুরে পাক (সঃ) মৃদু হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, প্রিয়তমা আয়েশা! আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তোমার পবিত্রতার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। অতঃপর হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এতদসম্পর্কিত একে একে দশটি আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইলেন। উক্ত আয়াতসমূহের কিছু অর্থ এখানে উল্লেখ করা হইল। যথা ঃ

যাহারা হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়াছে তাহারা তোমাদের মধ্যকারই একটা ক্ষুদ্র দল। উহাকে তোমরা নিজেদের জন্য অকল্যাণ মনে করিওনা; বরং তোমাদের জন্য (পরিণামে) উহা কল্যাণকর। (এই অপবাদ রটনার দ্বারা) তাহারা যে যেই পরিমাণ পাপ অর্জন করিয়াছে, সে সেই পরিমাণ শাস্তির কারণ

মাগিয়াছে। আর যে এই ব্যাপারে সর্বাধিক পরিমাণে সক্রিয় রহিয়াছে, তাহার জন্য কঠোরতম শাস্তি রহিয়াছে। তোমরা যখন উহা শুনিলে তখন মুমিন ও মুমিনাগণ পরস্পরের প্রতি কেন ভাল ধারণা করিল না এবং কেন বলিল না যে, ইহা স্পষ্টই মিথ্যা অপবাদ।

অতঃপর হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর গৃহ হইতে বাহির হইয়া মসজিদে নববীতে গমন করতঃ সমবেত সাহাবীবৃন্দের মাঝে উল্লিখিত আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইলেন। তাহারা ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ ও আহ্লাদে উদ্বেলিত হইয়া শত কণ্ঠে আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজারী করিতে লাগিলেন।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হইবার পর বিবি উম্মে রাওমান কন্যা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আয়েশা! তুমি এইবার হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কিন্তু অভিমানাহতা ক্ষুব্ধ-তেজস্বিনী হযরত আয়েশা (রাঃ) বালিকাসুলভ জবাব দিলেন, না আম্মা! আল্লাহর কসম আমি তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব না। আমি মহান সম্মানিত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রশংসা করিব না।

অভিমান-ক্ষুব্ধা কন্যার জবাব শুনিয়া জননী উম্মে রাওমান তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রবোধ এবং উপদেশ দান করিয়া শান্ত করিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) প্রিয়তমা আয়েশার (রাঃ) তৎকালীন মানসিক অবস্থা উত্তমরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কাজেই হযরত আয়েশার (রাঃ) উপস্থিত পরিস্থিতিতে এই জাতীয় মন্তব্যে তিনি এতটুকু দুঃখ বোধ করিলেন না; বরং হযরত আয়েশার (রাঃ প্রতি মিথ্যা অপবাদের ম্লান তিলক যে আল্লাহর সাহায্যে ধুইয়া-মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল তাহাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হইয়া গেলেন।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) মসজিদে সাহাবীদের সমাবেশে অপবাদ রটনাকারী লোক চারিজনকে ডাকিয়া আনিতে নির্দেশ দান করিলেন। তাহারা আনীত হইলে তাহাদেরকে তাহাদের প্রচারণার সপক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করিতে বলা হইল। তখন সকলেই তাহারা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিল যে, তাহাদের কোন স্বাক্ষী প্রমাণ নাই। তাহারা কেবল শুনা কথাই রটনা করিয়াছে।

মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি পরকালে ভয়াবহ আযাব প্রদানের কথা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই ঘোষণা করিয়াছেন। অপর তিনজন মুসলমান অপরাধী হাসসান ইবনে সাবেত, হাসনা বিনতে জাহশ এবং মাসতাহ ইবনে আসাসা কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ৮০টি করিয়া চাবুকের আঘাত ভোগ করতঃ স্বীয় কৃতকর্মের ফল লাভ করিল।

তাইয়াম্মুমের সূচনা

হযরত আয়েশার (রাঃ)-কে উপলক্ষ করিয়া এফকের ঘটনার তিনমাস পরে আর একটি ঘটনা ঘটিল এবং সেই ঘটনার মাধ্যমেই তাইয়াম্মুম প্রথার সূত্রপাত হইল।

ঘটনাটি ছিল এইরূপ ঃ হযরত রাসূলে করীম (সঃ) সসৈন্যে জাতুল জায়েসে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং যুদ্ধশেষে সৈন্যগণসহ মদীনায় রওয়ানা হন। উল্লেখ্য যে, এইবারও

হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহযাত্রিণী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পূর্বের সেই হার ছড়া তিনি এইবারও পরিয়া গিয়াছিলেন।

আল্লাহ তায়ালার কি অপূর্ব মর্জী! এইবারও হার ছড়া হারাইয়া গেল। তবে এইবার হযরত আয়েশা (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাহা হুযুরে পাক (সঃ)-এর গোচরে আনিলেন। তখন রাত্রি আর বেশী বাকি নাই। ঘটনা শুনিয়া হুযুরে পাক (সঃ) সৈন্যগণকে সেখানেই তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। শিবির সন্নিবেশিত হইল কিন্তু ঐ স্থানে পানির ব্যবস্থা ছিল না। পানির অভাবে সৈন্যদের ভারী অসুবিধা দেখা দিল। তাঁহারা আয়েশার (রাঃ) পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে গিয়া বলিলেন, দেখুন! হযরত আয়েশার জন্য আমাদিগকে কি অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। হযরত আবুবকর (রাঃ) তাহাদের কথা শুনিয়া উঠিয়া কন্যা আয়েশার (রাঃ) নিকট চলিয়া গেলেন এবং সরোষে বলিলেন, আয়েশা! তুমি আবার কি বিপদ ঘটাইলে বলত, রোষ ও বিরক্তি দমন করিতে না পারিয়া তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে কয়েকটি চপেটাঘাতও করিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) এই সময় তন্দ্রাভিভূত ছিলেন। একটু পরেই তিনি জাগিয়া উঠিয়া পানির অভাবের কথা অবগত হইলেন। এতগুলি লোক ফজরের নামায আদায় করিবে অথচ এতটুকু মাত্র পানির সন্ধান নাই। দারুণ সমস্যা বটে। হুযুরে পাক (সঃ) অত্যন্ত চিন্তায় পতিত হইলেন যে, কিভাবে নামায আদায় করা যাইবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সর্ব সমস্যা সমাধানকারী, তাঁহার প্রিয় বন্ধু ও তাঁহার অনুসারীদেরকে কখনও তিনি ঠেকাইয়া রাখেন না। এই মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ)-কে অহী লইয়া নবীর (সঃ) সমীপে প্রেরণ করিলেন। যথা ঃ

"যদি তোমরা পীড়িত হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেহ শোচাগার হইতে আসে, তোমরা স্ত্রী সঙ্গম কর, অথচ তোমরা পানি না পাও তবে (এইরূপ অবস্থায়) পাক মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করিবে। অতএব তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ মাসেহ করিবে।"

এই নির্দেশ বাণীর মর্ম কথাই হইল তাইয়াম্মুম বিধানের অনুমতি প্রদান। সুতরাং এই পবিত্র অহীর মাধ্যমেই হুযুরে পাক (সঃ) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের অজু সমস্যার সমাধান হইয়া গেল।

আল্লাহর পক্ষ হইতে এইরূপ বিধান লাভ করিয়া মুসলিম মুজাহিদগণ খুশীতে ভরিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পূর্বে যে মুসলিম বাহিনী পানির সমস্যায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছিলেন, মুহূর্তের ব্যবধানে তাহারা এবার আল্লাহ পাকের কৃপা ও করুণার নির্দেশ লাভ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এবার তাহারা হযরত আবুবকর (রাঃ)-দুহিতার প্রতি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত কামনা করিলেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি তাঁহাদের অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আপনা হইতে মস্তক অবনত হইয়া গেল।

উসায়েদ ইবনে হুজায়ের (রাঃ) নামক জনৈক প্রধান সাহাবী খুশীর প্রাবল্যে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, ধন্য ও সাবাস সিদ্দীক-তনয়া আয়েশা (রাঃ)! ইসলামে আপনার মাধ্যমে (বা উপলক্ষে) প্রাপ্ত দানগুলি চির অমর হইয়া থাকিবে।

অভূতপূর্ব গৌরবের অধিকারী পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ) স্নেহের কন্যা আয়েশা (রাঃ)-কে সানন্দে স্নেহ সম্ভাষণে বলিলেন, মা আমার! আমি বুঝিতে পারি নাই যে, তুমি

আমার এত পুণ্যবতী ও মহিমাময়ী সন্তান। তোমারই উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালা উম্মতে নবীর একটি সুকঠিন চিরন্তর সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। সত্যিই আমি আবুবকর (রাঃ) আজ অতিশয় গৌরান্বিত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্যযোগ্য যে, এই দিনও হারানো হার ছড়া হযরত আয়েশার (রাঃ)-ই উষ্ট্রের পায়ের কাছে পাওয়া গিয়াছিল। আর বিশেষ বিষয় হইল, এইদিন হইতেই মুসলমানদের জন্য পানির অভাবে বা ওজরে পানি ব্যবহার করিতে না পারায় তাইয়াম্মুমের বিধান প্রচলিত হইল।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর মহাপ্রয়াণকালে

হিজরী একাদশ সনের মাহে সফরের শেষ ভাগে একদা হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি রোগ শয্যায় ভীষণ মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন। এই সময় দুইজনের মধ্য কথায় কথায় একটি কথার জবাবে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলিলেন, আয়েশা! তোমার ইন্তেকাল আমার সম্মুখে হইলে আমি নিজ হাতে তোমাকে দাফন-কাফন করাইতাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) অত্যন্ত সরল প্রাণে এই কথার একটি জবাব দিলেন। তিনি বলিলেন, ওহ বুঝেছি আপনার উদ্দেশ্য হইল আমার মৃত্যুরপর আপনি অন্য মহিলা বিবাহ করিয়া আমার এই ঘরে আনিবেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) কথা শুনিয়া হুযুরে পাক (সঃ) মৃদু হাসিয়া আবার বলিলেন, আয়েশা! তোমার অনুমান ঠিক নয়। অতঃপর তিনি প্রিয়তমা পত্নীর মাথার যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য নিজের মাথায় হস্ত রাখিয়া বলিলেন, হায় মাথা!

আল্লাহ তায়ালার মর্জী অনুধাবন করা সহজ সাধ্য নহে। সঙ্গে সঙ্গে হুযুরে পাক (সঃ)-এর দারুণ মাথা ব্যথা শুরু হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার এই যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি পাইল যে, তাঁহাকে বিবি মায়মুনার গৃহে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। এই সময় তিনি একান্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বিবিদের প্রত্যেকের হক সমভাবে আদায় করিতে পালাক্রমে প্রত্যেকেরই গৃহে গমন করিতেছিলেন।

অসুখের ভিতরই একদিন তিনি বিবিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন আগামী দিন আমি কাহার ঘরে অবস্থান করিব? বিবিগণ মনে করিলেন, হুযুরে পাক (সঃ) এই পীড়িত অবস্থায় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে থাকিলেই তিনি বেশী শান্তি লাভ করিবেন। তাই সকলে মিলিয়া তাঁহাকে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করিলেন। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে গমন করিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তথায়ই অবস্থান করিয়াছিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ) ক্রমেই বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এমন কি তিনি মসজিদে নামাযের ইমামতী পর্যন্ত করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। পত্নীগণ সকলে মিলিয়া মনে-প্রাণে তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) খোদ রাসূলে পাক (সঃ)-এরই শিখানো দোয়া পড়িয়া তাঁহাকে মাথায় দম করিতে লাগিলেন।

একদা ফজরের ওয়াক্তে জামাতের জন্য সমবেত মুসল্লিগণ হুযুরে পাক (সঃ)-এর আগমন অপেক্ষায় ছিলেন। হুযুরে পাক (সঃ)-ও যাইবার জন্য কয়েকবারই চেষ্টা

করিলেন কিন্তু সক্ষম হইলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া বলিয়া দিলেন, আবুবকর (রাঃ) নামায পড়াইয়া দিবে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর জায়গা অন্যের দ্বারা পূর্ণ করা একটি অশুভ লক্ষণ মনে করতঃ বলিলেন, পিতা আবুবকর (রাঃ) অত্যন্ত কোমল প্রাণ লোক। অতএব তিনি ইমামতী কিছুতেই করিতে পারিবেন না। আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিবেন। হযরত রাসুলে করীম (সঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পুনরায় বলিলেন, না আবুবকর (রাঃ)-ই নামায পড়াইবে। হুযুর পাক (সঃ)-এর এইবারকার নির্দেশ শুনিয়া আর কেহ কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। হযরত আবুবকর (রাঃ) জামাতের ইমামতী করিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ) কোন এক সময় হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ তাহা স্মরণ হওয়ায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, হায় হায়! আল্লাহর নবী স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত রাখিয়া তাঁহার মাবুদের কাছে চলিয়াছে! তিনি তখনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে উহা আনিয়া তাঁহার সম্মুখেই গরীব-দুঃখীকে দান করিয়া দিতে নির্দেশ করিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) সেই নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে পালন করিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে চলিয়াছিল। হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) বক্ষে মস্তক রাখিয়া অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভ্রাতা আবদুর রহমান (রাঃ) হস্তে একখানা মেসওয়াক লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) উহার দিকে উৎসুক নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার মনের কথা উপলব্ধি করিয়া ভ্রাতার হাত হইতে মেসওয়াকখানা লইয়া নিজের দন্তে উত্তমরূপে চিবাইয়া নরম করিয়া হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট দিলেন। তিনি উহাদ্বারা মেসওয়াক করতঃ উত্তমরূপে দাঁত পরিষ্কার করিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) পরবর্তীতে প্রায়শঃ এই কথাটি বলিয়া গৌরব বোধ করিতেন যে, অন্যান্য সপত্নীদের তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর জীবনের শেষ মুহূর্তেও আমার মুখের বস্তু স্বীয় মুখে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর অসুখের ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিয়া একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর পবিত্র হস্ত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাঁহার রোগারোগ্যের জন্য প্রার্থনা করার উদ্যোগ করিতেই হুযুরে পাক (সঃ) স্বীয় হস্ত সরাইয়া লইয়া বলিলেন, হে মাবুদ! আপনিই আমার শ্রেষ্ঠ সঙ্গী। তৎপর তিনি বলিলেন, আয়েশা! আল্লাহ তাঁহার নবীর জীবনের শেষ মুহূর্তে প্রত্যেককেই ইহলোক-পরলোকের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার অধিকার দান করেন। কথাটির মর্ম উপলব্ধি করিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) চমকিয়া উঠিলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত রাসূলে পাক (সঃ)-এর জীবনের শেষ মুহূর্তটি ঘনাইয়া আসিয়াছে।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর কষ্ট দেখিয়া হযরত আয়েশার (রাঃ) আর সহ্য হইতেছিল না। তিনি কি যে করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। একবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সঃ)! আপনার যে অসহ্য কষ্ট

হইতেছে! হুযুরে পাক (সঃ) জবাব দিলেন, আয়েশা! যেখানে কষ্ট অধিক সেখানে পুণ্যও বেশী লাভ হয়।

সহসা হুযুরে পাক (সঃ)-এর দেহ মোবারকের ওজন অত্যন্ত বেশী অনুভূত হইল। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহা আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। দেখিলেন, হুযুরে পাক (সঃ)-এর নেত্রযুগল ধীরে ধীরে নির্মিলিত হইয়া গেল। তিনি সযত্নে হুযুরে পাক (সঃ)-এর মস্তক ধরিয়া তাকিয়ার উপর স্থাপন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

হযরত আয়েশার (রাঃ) জন্য শ্রেষ্ঠ গৌরবের বিষয় ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে যে, সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব খোদ রাহমাতুল্লিল আলামীন তাঁহারই ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া এই জগত হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। (ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

হুযুরে পাক (সঃ) বিদায় গ্রহণের পরে ও হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে

হুযুরে পাক (সঃ)-এর সাথে পরিণয়াবদ্ধকালে হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বল্প বয়স্কা কিশোরী ছিলেন। সুতরাং হুযুরে পাক (সঃ)-এর ইন্তেকালের সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) পুরাপুরি এক যুবতী ছিলেন এবং স্বামীর ইন্তেকালের পর সুদীর্ঘ উনপঞ্চাশ বৎসরকাল তিনি বৈধব্য জীবনযাপন করেন। জীবনভর তিনি স্বামীর কবর নিয়মিত যিয়ারত করিতেন। প্রথম দিকে বহুদিন তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর রওজা মোবারকে রাত্রে শয়নও করিতেন। কিন্তু একদা হুযুরে পাক (সঃ)-কে স্বপ্নে সাক্ষাত করার পর হইতে তিনি রওজা মোবারকে শয়ন করা বন্ধ করিয়া দিলেন।

নবী মহিষীবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তায়ালা যে অহী পাঠাইয়াছিলেন—"তাহারা সকলে মুমিন মুসলমানদের জন্য মাতৃস্থানীয়" এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই হযরত আয়েশা (রাঃ) আমরণ তাঁহার বৈধব্য জীবন পরম নিষ্ঠা ও সাবধানতার সাথে পরিচালনা করিয়াছিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফত আমল হইতেই হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কর্ম জীবনের সূচনা হয়। তিনি প্রত্যক্ষভাবে হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট হইতে যে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহার আলোকে সমাধান এবং ঘটনার নিষ্পত্তি আবুবকর (রাঃ)-এর আমল হইতেই শুরু হইয়া যায়। যেমন হুযুরে পাক (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন ওয়ারিশ হইবে না, উহা সদকার মাল স্বরূপ সর্বসাধরণের অধিকারে চলিয়া যাইবে। খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) এই হাদীসটি কন্যা হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট শুনিয়াই হুযুরে পাক (সঃ)-এর পরিত্যক্ত বাগিচা দুইটি আহলে বাইতকে সোপর্দ না করিয়া উহা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর যুগে ইয়ামামার যুদ্ধে যখন অগণিত হাফেজে কোরআন শাহাদত বরণ করেন, তখন পবিত্র কোরআনের স্থায়ীত্ব রক্ষার তাগিদে হযরত আয়েশা (রাঃ) পিতা আবুবকর (রাঃ)-কে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সঠিক পরামর্শ দান করেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর চিরবিদায় গ্রহণকালে

হযরত আবুবকর (রাঃ) মাত্র দুইটি বৎসর খলীফা ছিলেন। অর্থাৎ হুযুরে পাক (সঃ)-এর ইন্তেকালের মাত্র দুই বৎসর পরেই তাঁহার প্রধান সাহাবী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত আবুবকর (রাঃ)-এরও জীবনাবসান ঘটে।

জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি স্বীয় স্নেহের পাত্রী কন্যা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে নিজ শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া বলিলেন, মা আয়েশা! তোমাকে আমি যে সম্পত্তি দান করিয়াছিলাম তাহা তুমি তোমার ভাই-বোনদের মধ্যে ন্যায়ানুসারে বন্টন করিয়া দাও। সাথে সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহাতে সম্মতি জানাইয়া পিতাকে আশ্বস্ত এবং নিশ্চিন্ত করিলেন।

এক সময় হযরত আবুবকর (রাঃ) কন্যা আয়েশার (রাঃ) কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা মা! আমাদের হুযুরে পাক (সঃ) আমাদের নিকট হইতে কোন তারিখে রোখছত হইয়াছিলেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) জবাব দিলেন, তিনি সোমবার বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঃ কয়খণ্ড কাপড় দ্বারা তাঁহার কাফন তৈরী হইয়াছিল?

ঃ তিন খণ্ড কাপড় দ্বারা ।

ঃ মা! আজ দিনটি কি বার?

ঃ আজ সোমবার।

ঃ মা আয়েশা! মনে হইতেছে আজই আমি তোমাদের সবাইকে ফেলিয়া রাখিয়া আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর নিকট প্রস্থান করিব। আমি তোমাকে অসিয়ত করিতেছি, আমার মৃত্যুর পর আমার চাদরখানার জাফরানের দাগগুলি ধুইয়া উঠাইয়া ফেলিয়া ইহার দ্বারাই আমার কাফনের ব্যবস্থা করিও।

ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, উহা যে পুরানো কাপড় আব্বা!

ঃ হযরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, মা আয়েশা! মৃতের তুলনায় জীবিতদেরই কাপড়ের প্রয়োজন বেশী। এই ভাবে পিতা ও কন্যার মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলিবার পরই হযরত আবুবকর (রাঃ) সহসা নীরব হইয়া গেলেন । সাথে সাথে তাঁহার নেত্রদ্বয়ও নির্মিলিত হইয়া গেল। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি এই দুনিয়া হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ইন্তেকালের খবর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মৃত্যুর পূর্বক্ষণেই তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে খলীফা হিসাবে মনোনীত করিয়া গেলেন, তাই সেই ব্যাপারে মুসলমানদের আর কোন ঝামেলায় লিপ্ত হইতে হইল না।

তাঁহার পবিত্র লাশ হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় হুযুরে পাক (সঃ)-এর পার্শ্বেই সমাধিস্থ হইল।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে

হযরত আয়েশা (রাঃ) পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ) যমানায় যেমন খেলাফতের সুযোগ্য পরামর্শদাত্রী এবং একজন বিশেষ হিতাকাঙ্খীর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালেও ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ব্যাপারে

মুরব্বী এবং পরামর্শদাত্রীর আসনে আসীন ছিলেন। খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিতেন এবং তাঁহাকে মানিয়া চলিতেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে অষ্টাদশ হিজরীতে আমর ইবনুল আস খলীফা কর্তৃক চারি সহস্র সৈন্যসহ মিসর অভিযানে প্রেরিত হন। কিন্তু প্রায় একটি বৎসর পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াও তিনি কোনরূপ সফলতা লাভ করিতে না পারায় হযরত আয়েশা (রাঃ) খলীফা ওমর (রাঃ)-কে জোবায়েরের (রাঃ) নেতৃত্বে নূতন বাহিনী প্রেরণের জন্য পরামর্শ দেন। খলীফা সসম্মানে সেই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া জোবায়েরের অধীনে মিসরে একটি সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করেন। জোবায়ের মিসর গমন করিয়া অনায়াসে সেখানে মুসলিম পতাকা উড্ডীন করেন।

হযরত ওমর (রাঃ) একবার বিশেষ কারণে প্রধান সেনাপতি মহাবীর খালিদ ইবনে অলীদকে পদচ্যুত করেন। এই খবর হযরত আয়েশার (রাঃ) কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে জানাইয়া দেন যে, খালিদ ইবনে অলীদকে সেনাপতি পদ হইতে বরখাস্ত করা হইলেও তাহার সাধারণ সেনাপদ যেন অক্ষুণ্ন থাকে। নতুবা ক্ষতির আশঙ্কা আছে। খলীফা ওমর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এই পরামর্শকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর মনে এক প্রবল বাসনা ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর হুযুরে পাক (সঃ) এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পার্শ্বে যেন তাঁহাকে দাফন করা হয়। কিন্তু হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে তিনি এই বাসনা প্রকাশ করিতে সাহস পাইলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মনের এই প্রবল বাসনাকে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া লোক মারফত হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে ইহা পেশ করিলেন।

আসল কথা হইল, হযরত আয়েশাও (রাঃ) মনে মনে এই একই বাসনা পোষণ করিতেছিলেন যে, তাঁহার ইন্তেকালের পর তাহাকে যেন পিতা ও স্বামীর কবরের পার্শ্বে কবর দেওয়া হয়, কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর মনের বাসনা জানামাত্র তিনি নিজের বাসনা পরিত্যাগ করতঃ ওমরের (রাঃ) বাসনা পূরণের অনুমতি দান করেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) খলীফাদের আমলে জনসাধারণকে দান-ছদকা এবং দুঃস্থ-অসহায়দের অভাব মোচনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে

হযরত আয়েশা (রাঃ) তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাসনামলেও পূর্ববর্তী দুই খলীফার আমলের ন্যায় পূর্ণ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পরামর্শ ও নির্দেশাবলী সসম্মানে প্রতিপালিত হইত। হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা প্রদান করিতেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে বিদ্রোহীদের আন্দোলন যখন দানা বাঁধিয়া উঠিল এবং তাহাদের জনৈক নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি ও মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর (রাঃ) প্রমুখ ব্যক্তিগণ একবার হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে গিয়া বলিলেন, খলীফা ওসমান (রাঃ)-কে পদত্যাগ করানো হউক। যেহেতু তিনি এই পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তি নন।

তাহাদের কথা শ্রবণ করতঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) ধমকের সুরে তাহাদেরকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তাহা কখনও হইতে পারে না, কেননা আমি হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, ওসমান যদি কখনও খেলাফত লাভ করে তবে তাহা স্বেচ্ছায় যেন কখনও পরিত্যাগ না করে।

খলীফা ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত আমলের শেষভাগে যখন তৎকর্তৃক নিয়োজিত প্রাদেশিক গভর্ণরগণের অত্যাচার-অবিচারের কাহিনী সারা আরবে ছড়াইয়া পড়িল, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) খলীফা ওসমান (রাঃ)-কে পরামর্শ দিলেন যে, সমস্ত প্রাদেশিক গভর্ণরকে মদীনায় ডাকিয়া একটি বৈঠক বসাইয়া তাহাদের সাথে এই বিষয় আলাপালোচনা করা হউক। খলীফা তদনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন। গভর্ণরগণ সবাই নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য দলীলাদি পেশ করিলেন। অতঃপর খলীফা আবার হযরত আয়েশারই (রাঃ) পরামর্শক্রমে গভর্ণরদের কার্যক্রমগুলি প্রত্যক্ষভাবে তদন্ত করিবার জন্য বিজ্ঞ, বোযর্গ ও নিষ্ঠাবান সাহাবীদের দ্বারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতঃ তাহাদের প্রতি তদন্ত করার নির্দেশ দান করিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) খেলাফত আমলে

খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) নিষ্ঠুরভাবে নিহত হওয়ার পর সমগ্র আরব ব্যাপিয়া বিপুল অরাজকতা, অস্থিরতা ও নৈরাজ্যের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) খলীফা পদে নির্বাচিত হইলেন। ওসমান (রাঃ) বিরোধী এবং বিপ্লিবী দল হযরত আলী (রাঃ)-কে সমর্থন করিতেছিল। তবে বনী উমাইয়ার লোকেরা (হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বংশ) তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল। অবশ্য খেলাফতের শূন্য আসন পূর্ণ করার জন্য মদীনার প্রায় সকল বিশিষ্ট, প্রবীণ এবং উল্লেখযোগ্য সাহাবীগণই একই সাথে হযরত আলীর (রাঃ) হস্তে বাইয়াত করিয়া তাঁহাকে খেলাফতের পদে বরিত করিলেন। পক্ষান্তরে কিছুসংখ্যক লোক তন্মুহূর্তেই হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যার বিচার এবং হত্যাকারীদের ধ্বংসের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল এবং তাহারা ওসমান (রাঃ) হত্যার ব্যাপারে হযরত আলীর (রাঃ) প্রচ্ছন্ন হাত সক্রিয় ছিল বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এমন কি হযরত জোবায়ের (রাঃ) ও হযরত তালহার (রাঃ) মত বিশিষ্ট ও প্রবীণ সাহাবীদ্বয়ও এই ব্যাপারে হযরত আলীর (রাঃ) ভূমিকা অস্পষ্ট আপত্তিকর মনে করিয়া তাহারাও হযরত আলীর (রাঃ) পক্ষে আগমন করিতে বিরত থাকেন। আসলে কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) ঐ ব্যাপারে মোটেই দোষী ছিলেন না। উপরন্তু তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)-কে বিপ্লবীদের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য সাধ্যাতীত চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহর মর্জী রদ করিবার সাধ্য কাহার আছে?

হযরত আয়েশা (রাঃ) কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) হত্যা এবং হযরত আলীর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার প্রাক্কালে হজ্জোপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। হজ্জব্রত শেষ করতঃ যখন তিনি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন, পথিমধ্যে মক্কাভিমুখী যাত্রী হযরত জোবায়ের (রাঃ) এবং হযরত তালহার (রাঃ) সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইয়া গেল। তাঁহারা হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে মদীনায় ওসমান হত্যার করুণ ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করতঃ আরও বলিলেন যে, আমরা অত্যাচারী বিদ্রোহীদের দ্বারা মদীনা হইতে

বিতাড়িত হইয়াছি। তথাকার নিরপেক্ষ নিরীহ অধিবাসীগণ এখন দারুণ উৎকণ্ঠা ও উদ্বিগ্নতার মধ্যে দিন যাপন করিতেছে।

তাঁহাদের নিকট এই মর্মান্তিক ঘটনা শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। তিনি তখন হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত জোবায়ের (রাঃ)-এর সহিত পরামর্শ করিয়া মদীনা যাত্রা আপাততঃ স্থগিত করতঃ কর্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া মক্কা প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইতোমধ্যে সারাদেশে হযরত ওসমান (রাঃ) হত্যার ঘটনা ছড়াইয়া পড়ায় বিভিন্ন এলাকা হইতে দলে দলে লোক আসিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সমীপে ভিড় জমাইতে লাগিল। তিনি হযরত ওসমান (রাঃ) হত্যাকারী বিদ্রোহীদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান এবং মুসলমানদের মধ্যে যে সকল গর্হিত রীতি-নীতি প্রবেশ করিয়াছিল তাহা বিদূরীত করার জন্য সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া এক হৃদস্পর্শী ভাষণ দিলেন। ভাষণ শুনিয়া সমবেত লোকগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, ইয়া উম্মুল মু'মিনীন! আমরা আপনার সঙ্গে আছি।

এখন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মদীনা যাত্রার প্রয়োজন থাকিলেও হযরত আয়েশা (রাঃ) কোন বিশেষ কারণবশতঃ মদীনায় না গিয়া প্রথমে বসরা গমন করা কর্তব্য মনে করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহাব পতাকা তলে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক আসিয়া জমায়েত হইল। তখন তিনি এই বিরাট বাহিনী লইয়া বসরা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। এই সময় তৎকালীন কূটনীতিবিদ চূড়ামণি মারওয়ান ইবনে হাকামের নেতৃত্বে উমাইয়া বংশীয় একটি দলও আসিয়া হযরত আয়েশার (রাঃ) দলের সহিত মিলিত হইল। তাহাদের উদ্দেশ্য সৎ বা মহৎ ছিল না। তাহাদের ইচ্ছা ছিল এই সুযোগে কৌশলক্রমে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হযরত আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তাঁহাকে খেলাফত হইতে উৎখাত করতঃ তদস্থলে বনী উমাইয়ার কোন লোককে বসাইয়া দেওয়া। আর একদল লোক আসিয়া হযরত আয়েশার (রাঃ) দলে মিলিত হইল এই অসৎ উদ্দেশ্যে যে, তাহারা যে কোন প্রকারে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের ক্ষতি সাধন তথা মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করা এবং উভয় পক্ষ দুর্বল করতঃ ইসলামের ধ্বংস সাধন করা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার সহযাত্রীগণসহ বসরার উপকণ্ঠে উপনীত হইয়া শিবির স্থাপন করতঃ বসরার শাসনকর্তা ও তথাকার নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইতে আহ্বান জানাইলেন। তাঁহারা সবাই উপস্থিত হইলেন। তাহা ছাড়া মহা সম্মানিতা উম্মুল মু'মিনীনের শুভ পদার্পণে বসরার জনসাধারণও দলে দলে তাঁহার সহিত আসিয়া সাক্ষাত করিতে লাগিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) সকলের কাছে তাঁহার অভিপ্রায় বিবৃত করতঃ ওজস্বিনী ভাষায় এক প্রেরণাময়ী ভাষণ দিলেন। ইহাতে বহু লোক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল। অনেকে অবশ্য ভাল-মন্দ কিছুই বলিল না। নেতৃস্থানীয় কতিপয় লোক তাঁহাকে সমর্থন করিলেন, আবার কিছুসংখ্যক লোক এইকথাও ভাবিলেন যে, বিদ্রোহীদের শায়েস্তার দায়িত্ব শুধু খলীফার উপর। এই ব্যাপারে অন্য কাহারও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে যাওয়া প্রকারান্তরে খলীফাকে অবজ্ঞা করা বা তাঁহার বিপক্ষে অবতীর্ণ হওয়া। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা হযরত আয়েশার (রাঃ) অবলম্বিত পথ সমর্থন করিলেন না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বসরার এক ময়দানে বহু সহস্র বসরাবাসীদের সম্মুখে অভূতপূর্ব জ্বালাময়ী ও মর্মস্পর্শী আর একটি ভাষণ দিলেন।

ঐ ভাষণের ভাষা ছিল এইরূপ ঃ

প্রথমে হামদ ও নাতের পর তিনি বলিতে শুরু করিলেন, হে মানবগণ! তোমরা লক্ষ্য করিয়া শুন। তোমাদের উপর আমার মাতৃত্বের দাবী রহিয়াছে। কাজেই তোমাদেরকে উপদেশ দান করিবার মত ন্যায়তঃ অধিকার আমার রহিয়াছে। আমিই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সর্বাধিক প্রিয়তমা মহিষী ছিলাম। তিনি আমারই বক্ষের উপর মাথা রাখিয়া এই দুনিয়া ত্যাগ করেন। আমিই এই সম্মানের অধিকারিণী। আল্লাহ তায়ালা আমাকে মুনাফিকদের অপবাদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আমারই বদৌলতে মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আমারই উসিলায় তোমাদের জন্য তাইয়াম্মুমের সহজ বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন। তোমরা সকলেই জান, আমারই পিতা গারে ছুরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একমাত্র সঙ্গী ছিলেন। একমাত্র তিনিই সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করেন তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায়। তাহা ছাড়া খেলাফতের পবিত্র ও মহান দায়িত্ব সর্বপ্রথম তাঁহারই নিকট অর্পিত হইয়াছিল। অবশেষে যখন ইসলামের লাগাম শিথিল হইয়া পড়ে, তখন আমারই পিতা উহাকে শক্তভাবে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনিই বিপ্লবের মূল উৎপাটন করিয়াছিলেন। ভণ্ড নবীদের ষড়যন্ত্রকে তিনিই ব্যর্থ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনিই ইয়াহুদীদের বিদ্রোহানল নির্বাপিত করিয়াছিলেন। তখন তোমরা ফাতনা ফাসাদের আশঙ্কায় নিমজ্জিত হইয়াছিলে, শোরগোলে তোমাদের কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছিল। তিনিই তখন বিশৃংখলা অবস্থাকে আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমাকে প্রশ্ন করা হয়, আমি নারী হইয়াও সৈন্য-সামন্ত লইয়া বাহির হইয়াছি? ইহার জবাব শুন। বিবাদের সৃষ্টি আমার উদ্দেশ্য নহে। সত্য প্রমাণ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই আমি ময়দানে আসিয়াছি। আমি যাহা কিছু বলিতেছি, সততা ও ইনসাফের খাতিরেই বলিতেছি।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এই বক্তৃতা এতই হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী ছিল যে, বসরায় তাঁহার বিপক্ষীয় দলে যে সকল লোক ছিল তাহাদেরও বহুসংখ্যক লোক নিজেদের দলত্যাগ করিয়া তাঁহার বাহিনীতে আসিয়া যোগদান করিল। শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিরোধী পক্ষের সহিত তাঁহার বাহিনীর একটি সংঘর্ষ ঘটিল, যাহার ফলে বিপক্ষীয়গণ যুদ্ধে পরাজিত হইল। তৎকালীন শাসনকর্তা তখন এই দলভুক্ত ছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে বসরা তাহাদের হস্তচ্যুত হইল এবং সেখানে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল।

ওদিকে হযরত আলী (রাঃ) কিন্তু এসব খবর কিছুই অবগত নন। বরং মদীনায় তিনি বিপ্লবী, বিদ্রোহী এবং হযরত ওসমান (রাঃ) হত্যার প্রতিশোধকারীদের মধ্যে পড়িয়া দারুণ অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে কাল কাটাইতেছিলেন। এই অবস্থায় কর্তব্য নির্ধারণ করণার্থে হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে পরামর্শ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সাতসহস্রজন সৈন্য লইয়া মদীনা হইতে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার নিকট হযরত আয়েশার (রাঃ) পরিকল্পনা ও মক্কা হইতে বসরা গমন এবং বসরার

যাবতীয় ঘটনাসমূহের সংবাদ পৌঁছিয়া গেল। তখন আর তাঁহার মক্কা গমন একেবারে বৃথা মনে করিয়া তিনি দ্রুত বসরা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। এই সময় হযরত আলীর (রাঃ) বাহিনীর সহিত মদীনার বিদ্রোহী এবং বিপ্লবী দলও আসিয়া মিলিত হইল। তাহা ছাড়া মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর (রাঃ)-এর অনুগত দল তদুপরি মদীনার সাবাই নামক দলের লোকগণও আসিয়া তাঁহার বাহিনীতে যোগদান করিল। তখন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা প্রায় বিশ সহস্রে পৌঁছিয়া গেল। অবশ্য এই সমস্ত দলের অধিকাংশ লোকই হযরত আয়েশার (রাঃ) সহিত হযরত আলীর (রাঃ) সংঘর্ষ বাঁধাইয়া নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রত্যাশী ছিল। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশার (রাঃ) দলেও কুমতলব সাধনকামী বহু লোক মিলিত হইয়াছিল, তাহা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, এই ঘটনা হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) উভয়েরই অগোচরে ছিল।

জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রযুদ্ধ

অবিলম্বে হযরত আলী (রাঃ) সসৈন্যে বসরা উপনীত হইলেন। এই সময় তিনি তাঁহার দলের ভিতরে দুষ্কৃতিকারীদের অবস্থিতি অনুভব করিলেন। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) দলেও যে বহুসংখ্যক কুমতলবীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে তিনি সে খবরও জানিতে পারিলেন। ইহা যে মুসলিম সংহতির পক্ষে চরম বিপদস্বরূপ এবং সর্বনাশা ঘটনা তাহা উপলব্ধি করিয়া প্রথমেই তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সহিত সাক্ষাত করিলেন এবং এই বিষয় তাঁহার সহিত বিস্তারিত আলাপ করিলেন। অতঃপর উভয় পক্ষ হইতে অত্যন্ত কঠোরতা ও সাবধানতার সাথে দুষ্কৃতিকারীদের বিতাড়িত করা হইল। তারপর খুবই শান্ত পরিবেশে দুই পক্ষের সুপরিকল্পনা, সৎ উদ্দেশ্য এবং কর্তব্যসমূহ নিয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। হযরত আলী (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত জোবায়ের (রাঃ)-এর মধ্যেই কথাবার্তা ও পরামর্শাদি চলিতেছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছিল যে, হযরত ওসমান (রাঃ) হত্যার মুহূর্ত হইতে ইসলাম যে দুর্যোগময় ঘনঘটার কবলে দ্রুত ধাবিত হইতেছিল সে গতিধারায় হঠাৎ যেন ধাক্কা লাগিয়া উহা স্তব্ধ হইয়া আসিল। ঘনায়িত দুর্যোগের মুখে যেন কিছুটা আশার আলো ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। ক্ষণিকের জন্য মাত্র। দুষ্কৃতিকারীগণ উভয় পক্ষ হইতে বিতাড়িত হইলেও তাহারা একেবারে দূরে না গিয়া বরং সাবধানে ও সংগোপনে পুনরায় আসিয়া উভয় পক্ষের লোকদের মধ্যে প্রবেশ করিল।

অতঃপর তাহারা একটি দুর্বিপাক ঘটাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। শীঘ্রই তাহাদের সেই সুযোগও জুটিয়া গেল।

একদা গভীর রাত্রে যখন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ নিজ নিজ শিবিরে গভীর নিদ্রায় বিভোর, তখন দুই পক্ষ হইতেই ষড়যন্ত্রকারীরা একে অপরের প্রতি অতর্কিত হামলা করিয়া বসিল। তখন উভয় পক্ষের শিবিরে সহসা তুমুল হৈ চৈ ও দারুণ কোলাহল শুরু হইয়া গেল। ঘুমন্ত সৈন্যগণ জাগিয়া উঠিয়া প্রকৃত ঘটনা কিছুই বুঝিতে পারিল না। দুই

পক্ষই মনে করিল যে, তাহারা বিপক্ষ কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের শিকার হইয়াছে। তখন আর ভাবনা-চিন্তা করা বা পরস্পরে আলোচনা করার সময় ছিল না। সুতরাং উভয় পক্ষের সেনাগণ অস্ত্র তুলিয়া লইয়া পরস্পরের প্রতি ঝাঁপাইয়া পড়িল। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। একপক্ষে হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত জোবায়ের (রাঃ) সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। অন্যপক্ষে শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) স্বয়ং অসি হস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইসলামের ইতিহাসেও এ ঘটনাটি বড়ই করুণ ও মর্মন্তুদ ছিল। যুদ্ধে হযরত আয়েশার (রাঃ) পক্ষ বিপক্ষের সহিত কুলাইয়া উঠিতেছিল না। তখন উক্ত পক্ষের সেনাপতিগণ হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে রণাঙ্গনে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অনুরোধ রক্ষা করিয়া একটি উটের পৃষ্ঠে হাওদার ভিতরে থাকিয়া রণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। এইবার তাঁহার পক্ষের সৈন্যগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু ইতোমধ্যে বীর যোদ্ধা তালহা (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। হযরত জোবায়ের (রাঃ)-ও হুযুরে পাক (সঃ)-এর এই যুদ্ধ সম্পর্কিত একটি ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ হওয়ায় হযরত আলীর (রাঃ) নিকট লজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু তবু তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইল না। এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তিনি শাহাদাত বরণ করিলেন।

কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধের গতি মোটেই মন্দিভূত হইতেছিল না। কেননা রণক্ষেত্রে হযরত আয়েশার (রাঃ) উপস্থিতিই তাঁহার পক্ষের সেনাদেরকে মরণ-পণ যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এবং অন্যপক্ষে স্বয়ং হযরত আলীর (রাঃ) যুদ্ধ চালনা তাঁহার পক্ষের সেনাদের দৃঢ় মনোবলের কারণ ছিল। ফলে উভয় পক্ষে বহুসংখ্যক মুসলিম সেনা হতাহত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ হযরত আয়েশার (রাঃ) সেনাদের লাশের স্তূপ হইয়া গেল। হযরত আলী (রাঃ) এইভাবে মুসলিম ক্ষয়ে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমনি সময়ে হঠাৎ জনৈক সৈন্য অগ্রসর হইয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) যে উটের পৃষ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন, অসির এক প্রচণ্ড আঘাতে উহার একখানা পা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। ইহাতে উটটি একদিকে ঝুঁকিয়া পড়ায় উহার পিঠের হাওদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সহ পড়িয়া যাইবার উপক্রম হওয়ায় হযরত আলীর (রাঃ) কতিপয় সেনা দৌড়াইয়া যাইয়া উহা ধরিয়া ফেলিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) কোনরূপ আঘাত পাইলেন না। এই ঘটনায় হযরত আয়েশার (রাঃ) সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তখন অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল। এই সময় হযরত আলীর (রাঃ) পক্ষীয় যোদ্ধা হযরত আয়েশার (রাঃ) বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর (রাঃ) দ্রুত অগ্রসর হইয়া হাওদার ভিতরে নিজের হস্ত প্রবেশ করাইয়া ভগ্নির কুশল জানিতে গেলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার প্রতি অসন্তোষজনক উক্তি করিলেন। হযরত আলী (রাঃ)-ও এই সময় অগ্রসর হইয়া হযরত আয়েশার (রাঃ) কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার হাওদা নিজের মাথায় বহন করিয়া সসম্মানে বসরার এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির গৃহে লইয়া গেলেন। অতঃপর যুদ্ধ ক্ষেত্রের আনুষঙ্গিক কাজ সমাধা করিয়া অর্থাৎ উভয় পক্ষের মুসলিম সেনাদের দাফনাদি সারিয়া নিজে হযরত আয়েশার (রাঃ) সমীপে উপস্থিত হইলেন। দুইজনের মধ্যে প্রাণ খোলা আলাপালোচনা হইল। হযরত আলী (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট তাঁহার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য

ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। একইরূপে হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও তাহাই করিলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে চল্লিশজন মহিলা দিয়া মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর (রাঃ) এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত লোকদের সহায়তায় বিশেষ মর্যাদার সাথে তাঁহাকে মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন।

বসরা হইতে বিদায় গ্রহণকালে হযরত আয়েশা (রাঃ) সমবেত জনগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা কেহ এইরূপ মনে করিও না যে, আলীর (রাঃ) সহিত আমার কোনরূপ মনোমালিন্য আছে। তাঁহার সহিত কখনই আমার কোন অসদ্ভাব ছিল না এবং এখনও নাই। সাথে সাথে হযরত আলী (রাঃ)-ও জনতাকে লক্ষ্য করিয়া একইরূপ উক্তি প্রকাশ করিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এই জঙ্গে জামালের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্তা হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাহার দাওয়াতে ইসলাহ তথা জঙ্গে জামালের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত ছিল কি না। সেইকথা ভাবিয়া তিনি সারাজীবনই অনুশোচনা করিয়াছিলেন। এমন কি অনেক সময় তিনি অত্যন্ত আফসুস করিয়া বলিতেন, হায়! আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্বেই যদি আমার ইন্তেকাল হইত, তবে কতই না ভাল হইত!

হযরত আয়েশার (রাঃ) বৈশিষ্ট্যাবলী

হযরত আয়েশা (রাঃ) যে কেবল উচ্চ বংশজাত এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কন্যা ও সচ্চরিত্রা নারী হিসাবেই বিশিষ্ট গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তাহাই নহে; বরং তিনি স্বীয় অতুলনীয় মেধা, জ্ঞান-গরিমা ও অন্যান্য বহু গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের জন্য মাত্র কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবী ব্যতীত সকল সাহাবী ও সাহাবীয়াতের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারিণী হইয়াছিলেন। ধর্মীয় দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায়, হযরত আয়েশা (রাঃ) কেবল যে উম্মুল মু'মিনীন ছিলেন তাহাই নহে ; বরং তাঁহার আরও এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যে জন্য হুযুরে পাক (সঃ)-এর আজওয়ায়ে মুতাহহরাতের মধ্যে তাঁহার মর্যাদা শীর্ষস্থানীয়। তাইয়াম্মুমের বিধান সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়া, হুযুরে পাক (সঃ) কর্তৃক স্বপ্নে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নবী হেরেমে প্রবেশের সুসংবাদ লাভ করা, হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট হযরত আয়েশার (রাঃ) শয্যায় অহী নাযিল হওয়া, হযরত জিব্রাঈল কর্তৃক তাঁহাকে সালাম জ্ঞাপন করা ইত্যাদি বিষয়গুলি হযরত আয়েশার (রাঃ) বৈশিষ্ট্য, উচ্চ মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের স্পষ্ট প্রমাণ।

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (সঃ) বলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেই উক্তি করিয়াছেন, আমার এমন দশটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, তজ্জন্য অন্যান্য উম্মুহাতুল মু'মিনীনের উপর প্রাধান্য বর্তমান। উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি এই ঃ

(১) হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে ব্যতীত অন্য কোন কুমারী (অবিবাহিতা) নারীকে বিবাহ করেন নাই।

(২) হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিবিগণের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ)-ই এই দুর্লভ মহা গৌরবের অধিকারিণী, যাহার পিতা-মাতা উভয়েই মুহাজির।

(৩) আল্লাহ পাক হযরত আয়েশার (রাঃ) পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করিয়া আয়াত নাযিল করিয়াছেন।

(৪) হযরত জিব্রাঈল হযরত আয়েশার (রাঃ) আকৃতি ধারণ করিয়া হুযুরে পাক (সঃ)-এর খেদমতে আসিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছিলেন।

(৫) হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্মুখে থাকা অবস্থায়ও হুযুরে পাক (সঃ) নামায পড়িতেন।

(৬) অহী নাযিল হওয়ার সময়ে কেবল হযরত আয়েশা (রাঃ)-ই হুযুরে পাক (সঃ)-এর কাছে থাকিতেন।

(৭) হুযুরে পাক (সঃ)-এর পবিত্র রূহ নির্গমনকালে তাঁহার শির মোবারক হযরত আয়েশারই বক্ষের উপর ছিল।

(৮) হুযুরে পাক (সঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) একই পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করিতেন।

(৯) হযরত আয়েশার (রাঃ) যে রাত্রে ঘরে থাকার পালা ছিল, সেই রাত্রেই হুযুরে পাক (সঃ) ইন্তেকাল করিয়াছিলেন।

(১০) হযরত আয়েশার (রাঃ)-ই পবিত্র হুজরা হুযুর পাক (সঃ)-এর দাফনের স্থান হওয়ার গৌরব অর্জন করিয়াছে।

মোটকথা, হযরত আয়েশার (রাঃ) শ্রেষ্ঠত্ব এবং বৈশিষ্ট্যের অভাব নাই। আল্লাহ তায়ালা নানারূপ এবং অসংখ্য বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলেন। উহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। তিনি অশেষ ইবাদত-বন্দেগী করিতেন এবং তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন। জ্ঞান-গরিমায় তিনি অতুলনীয়া ছিলেন। হাজার হাজার হাদীস বিশেষতঃ মহিলাদিগের প্রয়োজন সম্পর্কিত হাদীস অধিকাংশ আমরা তাঁহারই মারফত লাভ করিয়াছি। ফরজ গোসল, হায়েজ, নিফাস প্রভৃতি জরুরী বিষয় সম্পর্কিত মাসয়ালা তাঁহারই মারফত প্রচারিত হইয়াছে।

তিনি অতিশয় সদালাপী, খোশমেজাজী এবং সরলমতি মহিলা ছিলেন। হিংসা-দ্বেষ-পরশ্রীকাতরতার লেশ মাত্র তাঁহার স্বভাবে ছিল না। তিনি জীবনে কখনও কাহারও কুৎসা গাহেন নাই এবং বদনাম করেন নাই।

নারীদের একটি সাধারণ স্বভাব হইল তাহারা স্বামীর নিকট নিজের সতীনদের দুর্নাম গাহিয়া বেড়ায় এবং ইহার দ্বারা তাহাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়া থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) নারীদের এই স্বভাব ধর্মের উর্ধে ছিলেন। সতীনদের সহিত তাঁহার ব্যবহার ও সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাকে অন্যান্য বিবিদের অপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতঃ সতীনদের কোনরূপ ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেন নাই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজে নিঃসন্তানা ছিলেন কিন্তু স্বীয় সতীনের সন্তানদেরকে স্বীয় সন্তানতুল্য স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন। তিনি স্বীয় দাস-দাসী ও সেবক-সেবিকাদের সাথেও অত্যন্ত উত্তম এবং আদর্শ সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিতেন। তাহাদেরকে তিনি যারপর নাই স্নেহও করিতেন। বিপন্ন ও নিরীহ দাসীগণকে খরিদ করিয়া দাসত্ব শৃংখল হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া তাঁহার একটি মহান অভ্যাস ছিল। বর্ণিত রহিয়াছে যে, এইভাবে অন্ততঃ ষাট সত্তরজন দাস-দাসী তাঁহারই অসীম দয়ায় মুক্তিলাভ করিয়াছে।

হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাকে সর্বাধিক ভালবাসিতেন বলিয়া সাহাবীগণও তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখিতেন এবং অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার উপর সকল মুসলমানের এতই ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল যে, তাহারা দোয়া ও বরকত হাসিলের নিমিত্তে নিজেদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে তাঁহার সমীপে নিয়া আসিত।

খলীফা ওমর (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে প্রত্যেক উম্মুল মু'মিনীনদের জন্য বার্ষিক দশ হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশার (রাঃ) জন্য আরো দুই হাজার দিরহাম বৃদ্ধি করিয়া দেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইহার কারণ প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) যেহেতু রাসূলুল্লাহর (সঃ) সর্বাধিক প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন তজ্জন্যই তাঁহার জন্য ভাতা কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

আর অধিক উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। যেই বিষয়সমূহ উল্লেখ করিলাম, তাহার দ্বারাই অতি উত্তমরূপে অনুভব করা যায় যে, মহা মাননীয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) কিরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন।

নারী জগতে হযরত আয়েশার (রাঃ) আসন

মুসলিম রমণী জগতে হযরত আয়েশার (রাঃ) আসন যে কত শীর্ষে ছিল তাহা তাঁহার জ্ঞান-গরিমা, যোগ্যতা, সাধনা, কর্মদক্ষতা, বিদ্যাবত্তা এবং দ্বীনীপরহেজগারী ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়। দুনিয়ার সেরাগুণ সম্পন্না নারী বহু আসিয়াছেন কিন্তু এত বিভিন্নমুখী গুণের সমাবেশ আর কাহারও ভিতর ঘটিয়াছে কিনা বলা যায় না।

তিনি ছিলেন নারী জাতির শ্রেষ্ঠ গৌরব। শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্রে তিনি নিজেকে হুযুরে পাক (সঃ)-এর শ্রেষ্ঠ সাহাবীরূপে প্রতিপন্ন করতঃ বিশ্ব মুসলিম সমাজকে ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও জ্ঞান বিতরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। একদিকে ছিলেন তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর তরুণী ভার্যা, গৃহের অবলা আপন ভোলা কুলবধূ অপরদিকে তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর সুযোগ্য রাজনৈতিক পরামর্শদাত্রী। কখনও বা তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন মৃত্যুভয়াল সমরক্ষেত্রে সেনা পরিচালনাকারিণী রূপে কখনও বা তাঁহাকে দেখা গিয়াছে যুদ্ধরত সৈনিকদের বিভিন্ন রকম সেবা-শুশ্রূষা-যত্নাদি আঞ্জাম দিবার কাজে ব্যস্ত থাকিতে। কোনদিক দিয়াই তিনি পিছনে ছিলেন না। আরবের শ্রেষ্ঠ বাগ্মিনীরূপে তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার অশেষ খ্যাতি ছিল নির্ভীক উপদেষ্টা হিসাবে। আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষয়িত্রীরূপে তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন। তাহা ছাড়া কাব্য-সাহিত্য চর্চায়ও তিনি পারদর্শনী ছিলেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন পরম ধার্মিক এবং ধার্মিকা নারীদের আদর্শস্থানীয়া। তিনি রাত্রি জাগিয়া নফল ইবাদতে কাটাইয়া দিতেন। দিবাভাগে বৎসর ভরিয়া রোযা রাখিতেন। সব সময় আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করিতেন। দুঃখীদরিদ্রের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। অভাবগ্রস্তের অভাব মোচনে কখনও বা গৃহের সামান্য সম্বল শুষ্ক রুটিটিকেও ভিক্ষুককে দান করিতেন।

অবশ্য সাথে সাথে একথাও নিছক সত্য যে, তিনি কল্পলোকের কোন মানব রূপিনী অমানবী ছিলেন না। মানবী তথা প্রকৃত মহিলাসুলভ গুণের প্রকাশ তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তিনি বহুসংখ্যক সপত্নী বেষ্টিতা নবীর ভার্যা ছিলেন। সেখানে, তাঁহাদের সাথে ব্যবহার ও সম্পর্কের মধ্য দিয়া তাঁহার মানবীয় তথা নারীত্বসুলভ প্রকৃতি প্রকাশ পাইয়াছিল। দেখা যায় তাহার প্রতি কুৎসা রটনার অসহনীয় আঘাতে তিনি ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছেন। আবার সাথে সাথে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি একান্ত নির্ভরতায় তিনি পার্থিব ভীতি আশঙ্কার বাহিরে অবিচল রহিয়াছেন।

বস্তুতঃ বিবি আয়েশার (রাঃ) উল্লিখিত গুণরাজি তাঁহাকে এমন এক মর্যাদার আসনে আরোহণ করাইয়াছে, সেখানে তিনি ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে আসন লাভ করা সম্ভব হয় নাই।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন, সেই দীর্ঘ জীবন তিনি কর্মক্ষেত্রের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল এবং সুস্থ ছিল না। কর্ম-জীবনের শুরুতেই তিনি স্বামী হুযুরে পাক (সঃ) ও পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পরলোক গমনজনিত দুইটি বিরাট শোকাঘাত প্রাপ্ত হন। এই নিদারুণ শোক যাতনা হৃদয়ে চাপিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মুহূর্তকাল তাঁহার বিশ্রাম গ্রহণের অবকাশ ঘটে নাই। হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলাম এই সময় নানা দুর্যোগের সম্মুখীন। একদিকে বিপ্লবী ও বিদ্রোহীদের আত্মপ্রকাশ ও তাহাদের দ্বারা খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধৃষ্টতা প্রদর্শন, এই সকল সমস্যা এবং অরাজকতা হযরত আয়েশার (রাঃ) দেহ-মনে ভীষণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি এই দুর্যোগ বিদূরণের জন্য যেভাবে আপ্রাণ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা কোন নারীর পক্ষে তো ভাল, কোন সক্ষম ও সামর্থ্যবান পুরুষের পক্ষেও সম্ভব নহে। এই সকল পরিশ্রমের উপরে প্রতি নিয়ত নিয়মিতভাবে শত সহস্র শিক্ষার্থী ও শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষা দান এবং দিবানিশি হাজার হাজার লোকের বিভিন্ন জটিল মাসয়ালাসমূহের যুক্তিপূর্ণ ও নির্ভুল ফতোয়া প্রদান প্রভৃতি কঠিন দায়িত্বপূর্ণ এবং শ্রমসাধ্য কার্যের চাপে ক্রমেই তিনি দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন।

পরলোক গমন

আমীর মুআবিয়ার (রাঃ) শাসনামলে হিজরী ৫৮ সনের পবিত্র মাহে রমজান। এই সময় হযরত আয়েশার (রাঃ) বয়ঃসীমা সত্তরের কোঠা অতিক্রম করিয়াছিল। রমজান মাস শুরু হইবার সাথে সাথেই তিনি রোগাক্রান্তা হইয়া পড়িলেন। এই সময় তিনি মদীনাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার রোগের কথা শুনিয়া সাহাবীগণ সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। নিকট-আত্মীয় সাহাবীগণ তাঁহার পরিচর্যার জন্য কাছে আসিতে চাহিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রায় সকল লোকই তাঁহার খেদমতে আসিয়া শেষে কথায় কথায় তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিবে। অন্যের মুখে এইভাবে নিজের প্রশংসা শ্রবণ করা তাঁহার নিকট মোটেই ভাল

লাগিত না। কাজেই তিনি অযথা নিজের নিকট লোকের আনাগোনা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

আস্তে আস্তে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। কমিবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। এই সময় কেহ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, ইয়া উম্মুল মুমিনীন ! আপনার অবস্থা কেমন মনে হইতেছে ? জবাবে তিনি বলিতেন, আল্লাহর রহমতে কুশলেই আছি।

তাঁহার নিজের এই ধরনের অনিচ্ছার ফলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট লোকের আনাগোনা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এমতাবস্থায় একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে চাহিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকেও যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অত্যধিক পীড়াপীড়ি এবং আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের বিশেষ সুপারিশের ফলে তাঁহাকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইল।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-ও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নানাভাবে তাঁহার প্রশংসা শুরু করিলেন। তখন উম্মুল মু'মিনীন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ! আমাকে মাফ করুন। আল্লাহর কসম ! আমার এইসব কথা ভাল লাগে না। কি বলিব, আমার জন্ম না হইলেই ভাল হইত। মানুষের প্রশংসা শুনিতে শুনিতে আমি একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছি।

একদা তিনি কিছু লোককে নিকটে ডাকিয়া অসিয়ৎ করিলেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে হুযুরে পাক (সঃ)-এর রওজায় দাফন না করিয়া জান্নাতুল বাকীতে দাফন করিও। কেননা রাসূলুল্লাহর (সঃ) অবর্তমানে হযরত আলীর (রাঃ) খেলাফত আমলে আমি যে দাওয়াতে ইসলাহর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, যতদূর সম্ভব উহা আমার জন্য উচিত হয় নাই। অতএব আমি কোন মুখে হুযুরে পাক (সঃ)-এর পদপ্রান্তে চির নিদ্রায় শায়িত হইব?

কেহ কেহ বলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) শেষ জীবনে এই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া অনুশোচনা করিতে থাকিতেন।

মাহে রমজানের ১৭ তারিখ উপস্থিত হইল। ঐদিন দিবাগত রাত্রে এশার নামাযের বাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) তারাবীহর নামায সমাধা করিলেন। অতঃপর তিনি শয্যায় শায়িত হইবার কিছুক্ষণ পরেই এই পার্থিব দুনিয়া হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। (ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন)

উপস্থিত লোকজন ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। পাড়া-প্রতিবেশীগণ ছুটিয়া আসিয়া ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। আনসার-মুহাজির মহিলাবৃন্দ আপনাপন গৃহ হইতে দলে দলে আসিয়া মহা ভিড় সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। সকলেরই চোখে-মুখে প্রবল শোক ও দুঃখ-বিমর্ষতার করুণ দৃশ্য প্রতিভাত হইয়া উঠিল। মদীনার আকাশ ও বাতাস যেন হযরত আয়েশার (রাঃ) বিচ্ছেদ বেদনায় ও নিদারুণ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ক্রন্দন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয় হযরত আয়েশার (রাঃ) জন্য বেহেশত ওয়াজেব, কেননা তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক

গুণবতী, পুণ্যময়ী এবং হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। তাঁহার প্রতি আল্লাহ পাকের অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হউক।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ইহাও অসিয়ৎ করিয়াছিলেন যে, রাত্রেই যেন তাঁহার কাফন-দাফন কার্য সম্পন্ন করা হয়। তাঁহার সে অসিয়ৎ অনুযায়ী কাজ করা হইল। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) তাঁহার জানাযার নামায পড়াইলেন। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) এবং ওরওয়াহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) তাঁহার লাশ মোবারক কবরে শোয়াইয়া দিলেন।

কথিত আছে, হযরত আয়শার (রাঃ) ইন্তেকালের পরে মদীনার প্রধান সাহাবী হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রাঃ) অন্তর্ধানে মদীনাবাসীরা কিরূপ শোকাভিভূত হইয়াছিলেন?

তিনি জবাবে এইরূপ বলিয়াছিলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) মদীনাবাসীর নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলে তাহারা অবিকল মাতৃহারা শিশুর মত অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হযরত হাফসা (রাঃ)

বংশ ও পিতা-মাতা

হযরত হফসা (রাঃ) ছিলেন হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর চতুর্থা সধর্মিণী। তৃতীয় হিজরী সনে হযরত হাফসা (রাঃ)-কে তিনি বিবাহ করেন। মক্কার প্রসিদ্ধ কোরায়েশ বংশীয় লৌহ মানব সুযোগ্য ও প্রভাবশালী নেতা এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-এর কন্যা ছিলেন হযরত হাফসা (রাঃ)। হযরত ওমর (রাঃ)-এর পিতার নাম ছিল খাত্তাব এবং স্ত্রীর নাম ছিল হযরত জয়নব বিনতে মাযউন (রাঃ)। ইনি প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত ওসমান মাযউনের (রাঃ) সহোদরা ভগ্নি ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) যেমন আরব দেশের জ্ঞানী, গুণী ও যোগ্য পুরুষদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী জয়নব বিনতে মাযউনও তেমনি আরবের মহিলাগণের ভিতরে সবিশেষ সুন্দরী, গুণবতী এবং সুযোগ্যা পরিচিতা ছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) প্রথম জীবনে ইসলাম ও মুসলমানের প্রধান এবং দুর্ধর্ষ শত্রু ছিলেন। একবার তিনি উন্মুক্ত তরবারী হস্তে হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর শিরশ্ছেদ করিতে সদম্ভে উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছিলেন।

জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ

হযরত ওমর (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর শিরচ্ছেদ করিতে যাইয়া অবশেষে নিজেই তাঁহার প্রচারিত দ্বীনে তাউহীদের কাছে স্বীয় শির ঝুঁকাইয়া দিয়াছিলেন। নবুয়তের ষষ্ঠ বর্ষে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণকালে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খান্দানের ও পরিবারের অন্যান্য লোকগণও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর পূর্বে কোরায়েশগণ কর্তৃক কাবাগৃহ মেরামতকার্য পরিচালনাকালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। নবুয়তের ষষ্ঠ বর্ষে হযরত ওমর (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পরিবার-পরিজনও উহার ছায়ায় আশ্রয় নেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে হযরত হাফসা (রাঃ)-ও শামিল ছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করতঃ ইসলাম ও মুসলামানের প্রধান হিতৈষী হইয়াছিলেন। ইসলামের প্রথমাবস্থায় মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রাঃ)-এর অবদান অতুলনীয়। বস্তুতঃ তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলামের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

প্রাক-ইসলামিক যুগে যে হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-কে ওমর (রাঃ) হত্যা করিতে বাহির হইয়াছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তিনি আবার তাঁহাকেই স্বীয় প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন। এমনকি হুযুরে পাক (সঃ)-এর ইন্তেকালে তিনি এতদূর বেশামাল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোষোন্মুক্ত তরবারি হাতে লইয়া তিনি উন্মত্তের মত বলিতে লাগিলেন, হুযুরে পাক (সঃ)-এর মৃত্যু হয় নাই, হইতে পারে না। যে বলিবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাকে এই তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব।

প্রথম বিবাহ

হযরত হাফসা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর অতিশয় স্নেহের দুহিতা ছিলেন। তিনি তাঁহার এই কন্যাকে পরম স্নেহ ও যত্নে লালন-পালন করতঃ মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যখন হাফসা (রাঃ) যৌবনে পদার্পণ করেন, পিতা-মাতা তাঁহাদের প্রাণাধিক কন্যাকে যোগ্যপাত্রের কাছে সমর্পণ করার জন্য যোগ্য পাত্রের খোঁজে আত্মনিয়োগ করেন। যোগ্য-অযোগ্য বহু পাত্রেরই সন্ধান মিলিল, দেখিয়া-শুনিয়া অবশেষে এক শুভদিনে খুনায়স ইবনে হুযাফা (রাঃ) নামক এক সাহাবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। নব-দম্পত্তি পরমানন্দে সংসার যাত্রা শুরু করেন। ইহারা স্বামী-স্ত্রী একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করতঃ মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। হযরত খুনায়স (রাঃ) ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত বদরের যুদ্ধে শরীক হন। কিন্তু যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হইয়া মদীনা শরীফে প্রত্যাগমনের পর তিনি শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। যাহার ফলে হযরত হাফসা (রাঃ) নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হইলেন।

স্বামীর পরলোক গমন

দ্বিতীয় হিজরী সনে মক্কার কোরায়েশদের সাথে মুসলমানদের প্রসিদ্ধ বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত হাফসার (রাঃ) স্বামী খুনায়সও এই যুদ্ধে মুসলমান মুজাহিদদের সাথে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বহু শত্রুর ভবলীলা সাঙ্গ করতঃ অবশেষে শত্রুপক্ষের এক অতর্কিত আক্রমণে মারাত্মকভাবে আহত হন। তখন আর তাঁহার যুদ্ধ করার শক্তি না থাকায় তিনি আহত অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত হাফসা (রাঃ) স্বামীর এহেন রক্তমাখা দেহ অবলোকন করিয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। অতঃপর মুহূর্তে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া আহত স্বামীর সেবা-শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আল্লাহর যাহা মর্জী তাহা ঘটিবেই। খুনায়স আর আরোগ্য লাভ করিলেন না। তিনি স্বামী-সোহাগিনী হাফসার (রাঃ) কোলে মাথা রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই ঘরে হাফসার (রাঃ) কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে শুভ পরিণয়

হযরত হাফসা (রাঃ) যখন বিধবা হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি যুবতী রমণী, তদুপরি যথেষ্ট সুন্দরী। তাই তাঁহাকে যত শীঘ্র সম্ভব পুনরায় বিবাহ দেওয়ার জন্য হযরত ওমর চেষ্টা শুরু করিলেন। তিনি তাঁহার পছন্দ মত কয়েকজন পাত্রের নিকটই প্রস্তাব পাঠাইলেন, কিন্তু তাহাদের তরফ হইতে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না।

পক্ষান্তরে হযরত ওমর (রাঃ)-এর মত ব্যক্তির সুযোগ্য কন্যা হাফসা (রাঃ)-কে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক পাত্রের অভাব ছিল না। বহু স্থান হইতেই হাফসার (রাঃ) বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার একটিও হযরত ওমর (রাঃ)-এর মনমত হইতেছিল না। তিনি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে রহিলেন। এই সময় হুযুরে পাক (সঃ)-এর দ্বিতীয়া কন্যা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সহধর্মিণী বিবি রোকাইয়া ইন্তেকাল করেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর মনে হযরত ওসমান (রঃ)-এর সাথে স্বীয় কন্যা বিবাহ দিবার খেয়াল জাগিয়া উঠে। তদনুযায়ী তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)-এর কাছে প্রস্তাবটি প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি এই বলিয়া প্রস্তাবটি এড়াইয়া যান যে, এখনি তিনি কোনখানে বিবাহ করিতেছেন না। কিছুদিন পরে এই সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা শুরু হইলে হযরত ওসমান (রাঃ) পরিষ্কাভাবেই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে হযরত ওমর (রাঃ) মনে খুবই আঘাত প্রাপ্ত হন।

মূলতঃ হযরত হাফসার (রাঃ) প্রকৃতি অনেকটা পিতা হযরত ওমর (রাঃ)-এরই অনুরূপ কড়া ধরনের ছিল। এইজন্যই হযরত হাফসার (রাঃ) সাথে পরিণয়াবদ্ধ হইতে অনেকেরই ভাবনার কারণ ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ)-ও এই বিষয়টার জন্যই পিছাইয়া গিয়াছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) কন্যার বিবাহ ব্যাপারে অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই সমস্যা বিশেষতঃ হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখান জনিত তাঁহার মনোবেদনার কথা হযরত রাসূলে করীম (সঃ) মর্মে উপলব্ধি করিলেন এবং তিনি নিজে ওমর (রাঃ)-এর কন্যার পাণিগ্রহণ করতঃ এই

সমস্যার সমাধান করিবার মনস্থ করিলেন। এই বিষয় তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সাথেও পরামর্শ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) অবশ্য এই ঘটনা জানিতেন না। তাই তিনি হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক নিরাশ হইয়া অবশেষে একদিন হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট গিয়া তাঁহার সহিতও হাফসার বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) শুনিয়া কোনরূপ মন্তব্য না করিয়া নিশ্চুপ থাকিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) সেখান হইতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

অতঃপর অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হযরত ওমর (রাঃ) একদা হুযুরে পাক (সঃ)-এর দরবারে হাজির হইয়া তাঁহার নিকট সকল ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া হুযুরে পাক (সঃ) এরশাদ করিলেন, ওমর! কোন চিন্তার কারণ নাই। আল্লাহর রহমতে আমি হাফসার জন্য ওসমান অপেক্ষা উত্তম পাত্র এবং ওসমানের জন্যও হাফসা অপেক্ষা উত্তম পাত্রীর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।

ইহার কিছুদিন পরেই হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট নিজের পক্ষ হইতে হযরত হাফসার (রাঃ) সাথে বিবাহ প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। ওমর (রাঃ) কন্যা হাফসা (রাঃ)-কে পরম ভাগ্যবতী মনে করিয়া সানন্দে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে তাঁহার বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। ওদিকে হুযুরে পাক (সঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের সহিত হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিবাহ প্রস্তাব উঠিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং অবিলম্বে শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল।

এইভাবে সমস্যার সমাধান হইবার পর একদা হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে বলিলেন, ওমর ! একটা পিছনের ঘটনার মর্ম উদঘাটন করিতেছি শুন। তুমি যে হাফসা (রাঃ)-কে আমার সহিত বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছিলে, আমি কিছু না বলিবার কারণ ছিল এই যে, তৎপূর্বেই হুযুরে পাক (সঃ) নিজেই হাফসা (রাঃ)-কে বিবাহ করতঃ তোমাকে দায়িত্ব মুক্ত করিয়া দিবার মনস্থ করিয়াছিলেন এবং সে বিষয় আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার আমার সহিত এই গোপন আলাপের কথা তখন তোমার নিকট প্রকাশ করা আমি উচিত মনে করি নাই। তবে একথা সত্য যে, স্বয়ং রাসূলে করীম (সঃ) যদি নিজের ঐরূপ ইচ্ছার কথা আমাকে না বলিতেন, তবে সত্যই আমি হাফসা (রাঃ)-কে বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করিতাম না।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে বিবাহোত্তর জীবনযাপন

নবী সহধর্মিণীগণের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) যেরূপ রূপে-গুণে-জ্ঞানে অদ্বিতীয়া ছিলেন, তদুপরি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কন্যা হিসাবে তাঁহার একটা আলাদা মর্যাদা ছিল। তেমনি হযরত হাফসা (রাঃ)-ও রূপে-গুণে-জ্ঞানে এবং পিতৃমর্যাদায় প্রায় আয়েশার (রাঃ) সমতুল্যা ছিলেন। এজন্য এই দুইজনের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিও ছিল অতিমাত্রায়। অবশ্য এই দুইজনের মধ্যেই কিছুটা আত্মগৌরববোধ বিরাজ করিত। এই গৌরববোধ অনেক সময় তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যেই কিছুটা ঈর্ষার ভাব সৃষ্টির কারণ হইয়া দেখা দিত। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা আবার উহা অঙ্কুরেই বিনাশ করিয়া দিত।

হযরত আয়েশার (রাঃ) মত হযরত হাফসাও (রাঃ) প্রখর ধীশক্তি এবং জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত হাফসার (রাঃ) উল্লিখিত

যোগ্যতার পরিচয় লাভ করিয়া তাহার জ্ঞানচর্চা এবং শিক্ষা-দীক্ষার অনুশীলনে বিশেষভাবে সুযোগ ও ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, হযরত হাফসার (রাঃ) মেজাজ একটু উগ্র ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি তাঁহার সপত্নীদিগের সহিত মাঝে মাঝে কিছুটা রূঢ় ব্যবহার করিয়া ফেলিতেন। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) তাহা মোটেই পছন্দ করিতেন না।

তিরমিজী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, একদা উম্মুল ম'মিনীন সুফিয়া (রাঃ) একাকী নির্জনে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাকে এমতাস্থায় দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত সুফিয়া (রাঃ) জবাব দিলেন যে, হযরত হাফসা (রাঃ) আমাকে ইয়াহুদী কন্যা বলিয়াছে। ঐ মহিলা অবশ্য ইয়াহুদী কন্যাই ছিলেন। কিন্তু এইকথা বলিয়া কেহ তাঁহাকে হেয় করিতে চাহিলে নবীপত্নী হিসাবে তাহা তিনি সহ্য করিবেন কেন ? হুজুরে পাক (সঃ) এইকথা শুনিয়া হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বলিলেন, হাফসা ! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। অতঃপর তিনি সুফিয়া (রাঃ)-কে বলিলেন, সুফিয়া ! তুমি যে নবীর কন্যা। তোমার চাচাও পয়গাম্বর ছিলেন। তদুপরি একজন পয়গাম্বরের সাথেই তোমার বিবাহ হইয়াছে। কাজেই হাফসা (রাঃ) তো তোমার সামনে কোন অহঙ্কারই করিতে পারে না।

আর একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) সুফিয়া (রাঃ)-কে বলিলেন, আমরা দুইজন হুযুরে পাক (সঃ)-এর কাছে তোমা অপেক্ষা বেশী সম্মানের অধিকারিণী। কথাটা হযরত সুফিয়ার (রাঃ) কানে খুবই লাগিল। তিনি একথাটা হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর গোচরে আনিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) শুনিয়া বলিলেন, সুফিয়া ! তুমি কেন এইকথা বলিলে না যে, তোমরা আমা অপেক্ষা কি করিয়া বেশী সম্মানের পাত্র হইতে পার ? আমার স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সঃ), আমার পিতা হারুন (আঃ), আর আমার চাচা হযরত মূসা (আঃ)।

হযরত হাফসার (রাঃ) প্রকৃতি নম্রস্বভাবা নারীদের অনুরূপ ছিল না, বরং কিছুটা ভিন্নরূপ ছিল। তিনি সময়-অসময় স্বামী রাসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে এটা চাই ওটা চাই করিয়া একটু বেশী আবদার পেশ করিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও এই ব্যাপারে তাঁহার কিছুটা সহযোগিতা করিতেন।

স্বভাব-প্রকৃতি

হযরত হাফসার (রাঃ) চরিত্র ছিল আয়নার মত নির্মল এবং স্বচ্ছ। সত্য-সততা, দান-দক্ষিণা, সৎ সাহস এবং নিয়মানুবর্তিতা তাঁহার চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল। তাহা ছাড়া ইবাদত-বন্দেগীতেও তাঁহার ধারা ছিল অনন্য সাধারণ। তিনি সারারাত্রি নফল নামায পড়িতেন ও তাসবীহ-তাহলীলে ডুবিয়া থাকিতেন এবং দিবাভাগে বৎসর ভরিয়া রোযা রাখিতেন। চরিত্রে এরূপ গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্রের ভিন্ন দিকটি ছিল কিছুটা মেজাজের উগ্রতা। ইহা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার স্বভাবের উগ্রতা কখনও কখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়া যাইত যে, তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর সঙ্গেও উগ্র মেজাজে কথা বলিতেন এবং হুযুর (সঃ)-এর কথার জবাব দিতেন।

বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ বোখারী শরীফে হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা মূর্খতার যুগে মহিলাদিগকে সামান্য মর্যাদাও দেই নাই।

ইসলামই তাহাদিগকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছে। কোরআন মজীদে তাহাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হইয়াছে। ইহাতেই তাহারা মর্যাদার অধিকারিণী হইয়া গিয়াছে। একদিন আমার স্ত্রী আমাকে কোন একটা বিষয়ে পরামর্শ দিয়াছিল। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম আরে! তুমি পরামর্শের আর কি-ই বা বুঝ? সে তখন আমাকে বলিল, খাত্তাবের পুত্র! এতটুকু কথা তোমার সহ্য হয় না, অথচ তোমার কন্যা হাফসা সর্বদাই হুযুরে পাক (সঃ)-এর সাথে কথা কাটাকাটি করে, যাহাতে সারাদিনই তিনি মনঃক্ষুণ্ন থাকেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, স্ত্রীর মুখে আমি এইকথা শুনিয়া কন্যা হাফসার (রাঃ) কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, হাফসা ! শুনিলাম তুমি না কি রাসূলে করীম (সঃ)-এর কথার উপরে কথা বল? হাফসা বলিলেন, আপনি ঠিকই শুনিয়াছেন, আমি এইরূপই করি। আমি তখন বলিলাম, হাফসা! তোমাকে আমি আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তুমি হযরত আয়েশার (রাঃ) মত করিও না। তাঁহার প্রতি রাসূলে করীম (সঃ) একটু বেশী অনুরক্ত বলিয়া তিনি নিজ সৌন্দর্যের প্রতি গর্বিতা।

হযরত হাফসা পিতার উপদেশ রক্ষা করিয়া পরে আর কখনও হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে উগ্র ব্যবহার প্রদর্শন করেন নাই।

দাজ্জালের ভয়

হযরত সাওদার (রাঃ) অনুরূপ হযরত হাফসার (রাঃ) মনেও দাজ্জাল সম্পর্কে অত্যন্ত ভয় ও আতঙ্ক বিরাজ করিত। ঐ সময় মদীনায় ইবনে সাইয়্যেদ নামে একটি লোক বাস করিত। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) দাজ্জালের যে সকল নিদর্শনাদির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় অধিকাংশগুলিই ঐ লোকটির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। হযরত হাফসার (রাঃ) ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে পথে লোকটির একদা সাক্ষাত হইল। তিনি দাজ্জালকে ক্ষীণ ও শীর্ণ বলিয়া অভিহিত করায় সে তৎক্ষণাত স্বীয় দেহটিকে এমনভাবে ফুলাইয়া ফেলিল যে রাস্তাই প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। হযরত হাফসা (রাঃ) এই ঘটনার কথা শুনিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে বলিলেন, তুমি কেন এমনটি করিতে গেলে? হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর উক্তি কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ যে, তিনি বলিয়াছিলেন, দাজ্জালের ক্রোধই তাহার আবির্ভাবের একমাত্র কারণ।

ভ্রাতা আবদুল্লাহর প্রতি উপদেশ

বিখ্যাত সিফফীন যুদ্ধের পর হযরত আলী (রাঃ)-এর সহিত আমীর মুআবিয়ার (রাঃ) যখন সালিসী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, তখন হযরত হাফসার (রাঃ) ভ্রাতা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ইহাকে ফাতনা ধারণা করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন না। ইহাতে হযরত হাফসা (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, এই বৈঠকে অংশ গ্রহণে তোমার কোন উপকার না হইলেও তোমাকে ইহাতে শরীক হইতে হইবে। কারণ লোকজন তোমার রায়ের জন্য অপেক্ষা করিবে। তাহা ছাড়া তোমার ইহা এড়াইয়া চলার কারণে এমনও ঘটিতে পারে যে, নিজেদের মধ্যে পরস্পরে প্রবল মতভেদের সৃষ্টি হইয়া পড়িবে।

হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে অপকৌশল প্রয়োগ

হুযুরে পাক (সঃ) অনেক সফরে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) উভয়কেই একসাথে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। রাত্রিকালে কিছু সময় তিনি হযরত আয়েশার (রাঃ) হাওদায় আবার কিছু সময় হযরত হাফসার (রাঃ) হাওদায় অবস্থান করিতেন।

এইরূপ কোন এক সফরে হযরত হাফসা (রাঃ) একদা এক কৌশলের মাধ্যমে সেদিনের মত হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হুযুরে পাক (সঃ)-এর সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত করিলেন। ঘটনা ছিল এই ঃ

হযরত হাফসা (রাঃ) তাঁহার হাওদায় হুযুরে পাক (সঃ) সহ এক মঞ্জিল অতিক্রম করিলেন। পরবর্তী মঞ্জিলে গিয়া কাফেলা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) উভয়েই আপনাপন হাওদা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অতঃপর কোন এক ফাঁকে হযরত আয়েশার (রাঃ) অন্যমনস্কতার সুযোগে হযরত হাফসা (রাঃ) তাহাদের পরস্পরের হাওদা বদল করিয়া ফেলিলেন। তারপর কাফেলার পুনঃযাত্রার সময় হইলে হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত হাফসার (রাঃ) হাওদা নিজ হাওদা মনে করিয়া উহাতে উঠিয়া বসিলেন। তারপরে হযরত হাফসা (রাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) হাওদায় আরোহণ করিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ) এইবার পালামত যথানিয়মে হযরত আয়েশার (রাঃ) হাওদায়ই তাশরীফ নিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি হযরত আয়েশার (রাঃ) পরিবর্তে হযরত হাফসা (রাঃ)-কে দেখিতে পাইলেন। তবে তিনি সাথে সাথে ঐ হাওদা হইতে বাহির না হইয়া হযরত হাফসার (রাঃ) সহিতই কথা-বার্তায় ও গল্পে-সল্পে অনেক সময় কাটাইয়া দিলেন।

ওদিকে কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-কে না পাইয়া বিরহ বেদনায় একবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাহার আর সহ্য হইতেছিল না। পরবর্তী মঞ্জিলে কাফেলা থামিলে তিনি হাওদা হইতে খালি পায়ে ঘাসের উপর নামিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, আল্লাহ! আমাকে কালসাপে দংশন করুক। বোন হাফসাকে আমি আর কি বলিব! কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সঃ) বিচ্ছেদ যাতনা যে আর সহিতে পারিতেছি না। এ কঠিন বেদনা হইতে মৃত্যু বুঝি ভাল।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এবং উল্লেখযোগ্য ভক্ত ও গুণগ্রাহীগণ

হযরত হাফসা (রাঃ) সর্বমোট ষাটখানা হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উক্ত হাদীসসমূহ হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এবং পিতা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

হযরত হাফসার (রাঃ) ভক্ত, অনুরাগী ও গুণগ্রাহীর সংখ্যা ছিল অগণিত! তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), হামজা (রাঃ) (আবদুল্লাহর পুত্র), সুফিয়া বিনতে আবু উবাইয়া (রাঃ), হারিসা বিন ওয়াহাব, আবদুল্লাহ বিন সুফুরান বিন উম্মিয়া, আবদুর রহমান বিন হারিস বিন হিলাল প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরলোক গমন

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) আমীর মুআবিয়ার শাসনামলে হিজরী ৪৫ সনের শাবান মাসে পরলোক গমন করেন। এই সময় তাহাঁর বয়স হইয়াছিল ৬৩ বৎসর। অন্তিম মুহূর্তের পূর্বক্ষণে তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে ডাকিয়া অসিয়ৎ করিয়া যান যে, তাঁহার মৃত্যুর পর যেন তাঁহার বিষয়-সম্পদ সবকিছুই আল্লাহর পথে দান করিয়া দেওয়া হয়।

মদীনার তৎকালীন গভর্ণর মারওয়ান হযরত হাফসার (রাঃ) জানাযার নামায পড়ান। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে মুগীরার (রাঃ) বাড়ী হইতে করবস্থান পর্যন্ত জানাযা লইয়া যাওয়া হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও তাঁহার পুত্রত্রয় সালিম, আবদুল্লাহ এবং হামজা কবরে নামিয়া তাঁহাকে কবরের ক্রোড়ে চির শয়নে শায়িত করেন। মদীনার জান্নাতুল বাকীতে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

হযরত জয়নব বিনতে খুজাইমা (রাঃ)

নাম-ধাম, বংশ ও পিতৃ পরিচয়

হযরত জয়নব বিনতে খুজাইমা (রাঃ) হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর পঞ্চম পত্নী ছিলেন। তৃতীয় হিজরী সনে হযরত হাফসার (রাঃ) পরে হুযুরে পাকের (সঃ) সহিত হযরত জয়নবের (রাঃ) শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হয়।

কবিলায় বনি হাওয়াজিন আরব দেশের একটি বিখ্যাত গোত্র ছিল। এই কবিলার লোকেরা প্রায় সকলেই ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিত। এইজন্য আরবে এই কবিলার লোকদের সাধারণ পরিচয় ছিল বণিক সম্প্রদায়। উল্লিখিত কবিলার হারিস নামে একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। কবিলার অন্যান্য লোকদের স্বভাব-চরিত্রের সাথে তাহার স্বভাবের কোন মিল ছিল না। সে যুগের আরবগণ যেরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং উচ্ছৃংখলতায় লিপ্ত ছিল তিনি তদ্রূপ ছিলেন না, বরং শান্তিপূর্ণ ও নিরিবিলিভাবে সদা-সর্বদা আপনার ব্যবসায়কর্মে নিয়োজিত থাকিতেন। ধন-সম্পদ উপার্জনের প্রতি তাঁহার একটা প্রবল মোহ ও আকর্ষণ ছিল। তিনি এই কথাটাকে সার ভাবিয়া লইয়াছিলেন যে, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য একমাত্র অর্থ ও সম্পদের প্রয়োজন। বস্তুতঃ অর্থ উপার্জন করতঃ তিনি সে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব-চরিত্রও যথেষ্ট উত্তম ও উন্নত ধরনের ছিল। সমাজের লোকজন তাঁহাকে যারপর নাই সম্মানও প্রদর্শন করিত।

উক্ত হারিসের খুজাইমা নামক এক পুত্রসন্তান ছিলেন। পিতার সব রকম গুণ ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তিনি। পিতৃ পেশা ব্যবসায় ছাড়া অন্য কোন দিকে তাঁহার কোনরূপ আকর্ষণ ছিল না। সুতরাং অচিরেই তিনি আরবের এক প্রধান ধনী ব্যক্তিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। বলিষ্ঠ চরিত্র ও অর্থানুকূল্যে তিনি সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

উক্ত খুজাইমার কন্যা ছিলেন হযরত জয়নব (রাঃ)। অপূর্ব সৌন্দর্য, উজ্জ্বল কান্তি এবং অত্যুত্তম চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। মাতা-পিতার পরম আদর ও যত্নে তিনি লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। অত্যধিক বুদ্ধিমত্তার সাথে কিছু শিক্ষা-দীক্ষাও তাহার ছিল।

বিভিন্ন গুণাবলী

হযরত জয়নব (রাঃ) বাল্যাবধিই কতকগুলি সৎগুণের অধিকারিণী ছিলেন। বিশেষতঃ গরীব-দুঃখীর কষ্ট-ক্লেশ দেখিলে তাহা দূর করিতে না পারা পর্যন্ত তিনি সুস্থির হইতে পারিতেন না। পিতা তাহার বিভিন্ন খরচ-পত্রের জন্য তাহাকে যে অর্থ দিতেন, তাহার পরিমাণ একেবারে সামান্য ছিল না। উহা তিনি নিজের জন্য মোটেও খরচ না করিয়া সমস্তই দুঃস্থ ও অসহায়দের মধ্যে বিতরণ করিতেন। কখনও কখনও এইরূপও দেখা যাইত যে, নিজে খাইতে বসিয়াছেন, এই সময় কোন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক আসিয়া খাবার প্রার্থনা করিলে নিজে না খাইয়া তখন উহা উক্ত ভিক্ষুককে দিয়া দিতেন। মোটকথা, দান-খয়রাতের দিক দিয়া একমাত্র হযরত খাদীজা (রাঃ) ব্যতীত নবী মহিষীবৃন্দের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সেরা দানশীলা ছিলেন। এইরূপ বদান্যতা গুণের জন্য তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বাল্যাবধিই উম্মুল মাসাকীন বা নিঃস্বদিগের জননী আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথম বিবাহ

যৌবনে উপনীত হইবার সাথে সাথে হযরত জয়নব (রাঃ)-এর রূপ ও গুণাবলী আরও বিকশিত হইল। এমন সুন্দরী ও গুণবতী রমণীকে বিবাহ করিতে কে না লালায়িত হয়! স্বভাবতঃই তাহাকে বিবাহ করার জন্য বহুস্থান হইতে পয়গাম আসিতে লাগিল। পক্ষান্তরে পিতা খুজাইমাও তাঁহার সর্ব গুণান্বিতা রূপবতী কন্যাটিকে একটি উত্তম পাত্রের হাতে সমর্পণ করার জন্য উহার সন্ধানে রত হইলেন। অচিরেই মনোমত একটি পাত্র জুটিয়া গেল। এক সম্ভ্রান্ত ও ধনী খান্দানের এই যুবক পাত্রটি অতিশয় সুদর্শন ও চরিত্রবান ছিলেন। পাত্রটির নাম ছিল আবদুল্লাহ ও তাহার পিতার নাম ছিল জাহাশ।

যথাসময়ে এই পাত্রের সহিত হযরত জয়নব (রাঃ)-এর বিবাহ হইয়া গেল। ইহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হযরত জয়নব (রাঃ) স্বামী-গৃহে আগমন করিয়া স্বামীর অকপট ভালবাসা ও শ্বশুরের আন্তরিক স্নেহ-আদরের ফলে জনক-জননীর বিচ্ছেদ যাতনা বিস্মৃত হইলেন। পরম সুখ ও শান্তিতে তাঁহার পারিবারিক জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ইতোমধ্যে মুসলমানদের সাথে মক্কার কোরায়েশদের ওহুদের যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। মুসলিম মুজাহিদগণ হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর নেতৃত্বের ওহুদের প্রান্তর অভমুখে ধাবিত হইলেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশও তাঁহার নব-পরিণিতা পত্নীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ধর্মযুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

আল্লাহ তায়ালার মর্জীর কোন পরিবর্তন নাই। আবদুল্লাহ এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করিলেন। হযরত জয়নব (রাঃ)-এর পারিবারিক সুখ-শান্তি অকালেই মুছিয়া গেল। তিনি স্বামীর শাহাদাত লাভের খবর শুনিয়া শোকাঘাতে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িলেন।

নবী-সহধর্মিণীর মর্যদা লাভ

স্বামীর শাহাদাত বরণে খোদ হযরত জয়নব (রাঃ) যত বেশী শোকাভিভূত হইলেন, তদপেক্ষা কয়েকগুণ বেশী আঘাত পাইলেন ও ব্যথিত হইলেন তাঁহার পিতা খুজাইমা। কারণ তাঁহার এমন স্নেহের কন্যা হযরত জয়নবের এই করুণ বৈধব্য তাহাকে স্বচক্ষে দেখিতে হইবে, ইহা তাঁহার ধারণারও অগোচর ছিল। বিশেষতঃ সুন্দরী বয়স্কা কন্যা ঘরে রাখা চিন্তার কারণ। বাস্তবিকই তিনি এ ব্যাপারে একেবারে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। শীঘ্রই তিনি কন্যার পুনর্বিবাহের জন্য চেষ্টা শুরু করিয়া দিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা-সাধনা সত্ত্বেও কোন সৎপাত্রের সন্ধান মিলিল না।

এই সংবাদ হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট পৌঁছিল। তিনি কতিপয় সাহাবীকে রাজী করাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আর্থিক অনটন ও অন্যান্য ওজর উত্থাপন করতঃ সকলেই পিছাইয়া রহিলেন। তখন বাধ্য হইয়া করুণার সাগর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জয়নব (রাঃ)-এর পিতার নিকট নিজের পক্ষ হইতে প্রস্তাব পাঠাইলেন। পিতা কন্যার অনুমতি গ্রহণ করতঃ যথাসময়ে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন। হিজরী তৃতীয় সনের শেষদিকে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হযরত জয়নব নিজের এই সৌভাগ্যে ধন্য এবং সার্থক হইলেন।

পরলোক গমন

হযরত জয়নব (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর অর্ধাঙ্গিনীর গৌরব লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার এই সৌভাগ্য খুব বেশীদিন স্থায়ী হইল না।

একদা নবী মহিষীবৃন্দ হুযুরে পাক (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর নবী !আমাদের মধ্যে সকলের আগে কে পরলোক গমন করিবেন? আল্লাহর নবী আল্লাহর তরফ হইতে ইহা জানিয়া লইয়া জবাবটি সরাসরি না দিয়া ইঙ্গিতে বলিয়া দিলেন। তোমাদের মধ্যে যাহার হাত সর্বাপেক্ষা বড় সে-ই সকলের আগে মৃত্যুবরণ করিবে। হাত বড় দ্বারা সর্বাপেক্ষা বড় দানশীলা জয়নব (রাঃ)-এর কথাই বলা হইয়াছিল। নবী মহিষীগণ তখন মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বড় হাতের অধিকারিণী বিবি সাওদার মৃত্যুই নিকটবর্তী ভাবিয়া লইয়াছিলেন। তারপর জয়নবের বিবাহের মাত্র তিনমাস পরে তিনি যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন তখন তাঁহাদের নিকট হুযুরে পাক (সঃ)-এর মন্তব্যের মর্ম পরিষ্কার হইয়া গেল।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর জীবদ্দশায় হযরত খাদীজা (রাঃ) ব্যতীত একমাত্র জয়নব (রাঃ)-ই পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

মদীনার বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে তিনি সমাহিত হইয়াছিলেন।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)

নাম-ধাম ও বংশ-গোত্র

হযরত জয়নব বিনতে খুজাইমার (রাঃ) পরে রাসূলে করীম (সঃ)-এর সহধর্মিণী হওয়ার গৌরব লাভ করেন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)। ইনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর ষষ্ঠ স্থানীয়া মহিষী। চতুর্থ হিজরী সনে হুযুরে পাক (সঃ) এই মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইহার পিতা-মাতা প্রদত্ত প্রকৃত নাম ছিল হিন্দা। তবে আরবের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী পারিবারিক পরিচিতি উম্মে সালমা (সালমার মাতা) নামেই তিনি পরিচিতা হইয়া উঠেন। মক্কার বিখ্যাত কোরায়েশ বংশীয় মাখজুম কবিলার মহিলা ছিলেন ইনি। তাঁহার পিতা আবু উমাইয়া সহিল ইবনে মুগীরা উক্ত কবিলার জনৈক গণ্যমান্য এবং সুবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সমাজে তাহার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। ইহার পিতা ছিলেন মুগীরা ওরফে আলমগীর। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহর পুত্র। আবদুল্লাহ ছিলেন ওমরের পুত্র। ওমর ছিলেন মাখজুম-এর পুত্র।

উম্মে সালমার (রাঃ) পিতা আবু উমাইয়া মক্কার সম্ভ্রান্ত বনু ফরাম গোত্রের আতিকা নাম্নী এক সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মহিলাকে বিবাহ করেন। উম্মে সালমা (রাঃ) এই মহিলার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন।

আতিকার পিতার নাম ছিল মামের। মামের ছিলেন মালেকের পুত্র। মালেক ছিলেন হুজাইমার পুত্র। হুজাইমা ছিলেন আলকামার পুত্র। আলকামা ছিলেন জাযালুত তায়ানের পুত্র। ইনি ছিলেন ফারানের পুত্র। ফারান ছিলেন গানামের পুত্র। গানাম ছিলেন মালেকের পুত্র। মালেক ছিলেন কেনানার পুত্র।

হযরত উম্মে সালমার পিতা আবু উমাইয়া যে কেবল সমাজে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিই ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গুণও ছিল। তিনি অত্যন্ত নেককার, দানশীল এবং উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। দানশীলতায় তাহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল দেশে-বিদেশে। তাহার বদান্যতার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল এই যে, তিনি যে কাফেলাভুক্ত হইয়া বিদেশ সফর করিতেন, কাফেলার প্রত্যেকটি লোকের যাবতীয় পাথেয় ও রসদ-পত্র খরচ তিনি একাই বহন করিতেন। এই কারণে তাঁহাকে জাদুর রাকীব (অর্থাৎ সওয়ার পথিকদের পাথেয়) বলা হইত। দানশীলতা গুণ ছাড়া তাহার স্বভাব-চরিত্র অতি উত্তম ছিল।

আবু উমাইয়ার স্ত্রী আতিকাও নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। একদিকে যেমন তিনি অতি সুন্দরী ও রূপসী রমণী ছিলেন, অন্যদিকে সততা, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং অন্যান্য বিভিন্ন গুণেও তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ধর্মপরায়ণা ও লোক হিতকাঙ্ক্ষিনী বলিয়া সমাজে তাহার খ্যাতি ছিল।

উল্লিখিত জ্ঞান-গুণ এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী পিতা-মাতার সন্তান হিসাবে উম্মে সালমা স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের উভয়ের গুণাবলী এবং উত্তম চরিত্র অর্জন করিয়াছিলেন। তদুপরি জনক-জননীর বিশেষ মনোযোগ সহকারে লালন-পালন তাহার জীবনকে অধিকতর সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল।

প্রথম বিবাহ

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথে তাহার পিতা-মাতা তাঁহাকে তদুপযোগী পাত্রের কাছে বিবাহ দিবার জন্য মনোযোগী হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে তাহারা উম্মে সালমার (রাঃ) চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদকেই শ্রেষ্ঠ পাত্র হিসাবে নির্বাচন করিলেন। ইনি হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর দুধভ্রাতা হইতেন।

আবদুল্লাহ সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্যবান এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আবদুল্লাহর কিছু শিক্ষা-দীক্ষাও ছিল। তদুপরি তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

মক্কার লোকেরা তখনও ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নাই। কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক লোক সবরকম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ইসলামের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়াছে। এ সময় এই নব দম্পতি হুযুরে পাক (সঃ)-এর হস্তে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর নিষ্ঠুর কোরায়েশদের অত্যাচার আরম্ভ হইয়া গেল। যাহার ফলে তাঁহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিতে বাধ্য হইলেন।

হিজরত

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) স্বামী আবু সালমা (রাঃ) সহ প্রথমে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলেন। কিন্তু আবিসিনিয়ার আবহাওয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় তাহারা সেখান হইতে মক্কা ফিরিয়া আসেন এবং অল্প কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করিয়া পুনরায় তাঁহারা উভয়ে মদীনা হিজরত করেন।

মদীনায় হিজরতকালে তাহাদের যে সকল দুর্যোগ, সমস্যা এবং বিপদাপদের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা ছিল খুবই কঠিন। এই সম্পর্কে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর বর্ণিত বিবরণ তাঁহার নিজ যবানেই উল্লেখ করিতেছি ঃ

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, আমার স্বামী আবু সালমা যখন মদীনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার নিকট একটি মাত্র উট ছিল। উহাতেই আমাকে ও আমাদের শিশুপুত্র সালমাকে বসাইয়া দিয়া নিজে উটের লাগাম ধরিয়া আমাদেরকে লইয়া মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই

মক্কাবাসীরা আমাদের গতিরোধ করে। আমার মাতৃকুল বনী মুগীরার লোকেরা আবু সালমার গতিরোধ করিয়া বলে, আমরা আমাদের মেয়েকে এইরূপ দুরবস্থার মধ্যে যাইতে দিব না। তাহারা এই কথা বলিয়া আবু সালমার হাত হইতে উটের লাগাম কাড়িয়া লয় এবং আমাকে লইয়া যাত্রা করে। এমনি মুহূর্তে আবু সালমার গোত্র বনী আবদুল আসাদের লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমার পুত্র সালমাকে ছিনাইয়া লইয়া বনী মুগীরার লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলে, তোমরা যদি তোমাদের মেয়েকে তাহার স্বামীর সহিত যাইতে না দাও, তাহা হইলে আমরাও আমাদের শিশু সন্তান সালমাকে তোমাদের মেয়ের সহিত যাইতে দিব না।

অতঃপর আমি, আমার স্বামী এবং আমার শিশুপুত্র তিনজনই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি। দুঃখে ও বেদনায় আমি ম্রিয়মান হইয়া পড়িলাম। হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর তরফ হইতে ইতোপূর্বেই মদীনায় হিজরতের নির্দেশ হইয়া গিয়াছিল, কাজেই স্বামী আবু সালমা মদীনায় পৌঁছিয়া গেলেন। মক্কায় আমি একা রহিয়া গেলাম। আমি প্রত্যেক দিন ভোরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একটি টিলার উপর বসিয়া পথের দিকে তাকাইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকিতাম। এইভাবে প্রায় একটি বৎসর অতিবাহিত হইল। এই সময় একদা আমার মাতৃকুল বংশীয় জনৈক আত্মীয় তাহার স্ববংশীয় বনী মুগীরার লোকদেরকে বলিল যে, তোমরা কেমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক বলত? তোমাদের বংশেরই অমুক মেয়েটিকে এভাবে কাঁদাইয়া মারিয়া তোমাদের কি লাভ হইবে বলতো? তোমরা ইহাকে স্বামী ও সন্তানের কাছে যাইবার অধিকার দিয়া দুঃখী মেয়েটির প্রাণ রক্ষা কর। সেদিন ঐ লোকটির কথায় হঠাৎ আমার মাতৃকুলের লোকদের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তাহারা আমাকে স্বামীর নিকট যাওয়ার অনুমতি দান করিল।

এই সংবাদ পাইয়া আমার স্বামীর বংশের লোকেরাও আমার শিশু পুত্রকে আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। তখন আমার হৃদয় আনন্দ এবং খুশীতে ভরিয়া গেল। আমি তখন আর মদীনাগামী কোন দল বা কাফেলার জন্য অপেক্ষা না করিয়া একটি উট সংগ্রহ করতঃ জিনিস-পত্র লইয়া পুত্র সালমাসহ উহাতে উঠিয়া পড়িলাম এবং একান্ত একাকীই শিশু পুত্রটিকে নিয়া মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। এই সুদীর্ঘ ও সঙ্কটময় পথ আমি একাকী মহিলা মানুষ কিভাবে অতিক্রম করিব সেই সব চিন্তা না করিয়াই আমি চলিতে চলিতে "তায়গাম" নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে আমার ওসমান ইবনে তালহার সাথে সাক্ষাত হইল। এই লোক কাবাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অবশ্য তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তিনি আমার মদীনা যাত্রার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সহিত আর কেহ আছে কি? আমি বলিলাম, না, আমি আর আমার শিশু সন্তান ছাড়া আমাদের সাথে আর কেহ নাই। ইহা শুনিয়া তিনি আমার উটের লাগাম ধরিয়া আগে আগে চলিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন, আমি সমগ্র আরবে ওসমান ইবনে তালহার মত সৎ ও ভদ্র মানুষ আর দেখি নাই। যখন কোন মঞ্জিলে আমাদের থামিতে হইত তখন তিনি কোন বৃক্ষের আড়ালে চলিয়া যাইতেন। আবার যাত্রা করিবার সময় হইলে তিনি উষ্ট্রকে প্রস্তুত করিয়া আনিতেন। আমি পুত্রসহ ধীরস্থিরভাবে উহাতে আরোহণ করিলে পুনরায় তিনি লাগাম ধরিয়া আগে আগে চলিতে শুরু করিতেন। সমগ্র পথ এই নিয়মে

অতিক্রম করিলাম। মদীনা পৌঁছিয়া বনী আমর ইবনে আওফ-এর বস্তির নিকটবর্তী হইলে ওসমান ইবনে তালহা আমাকে বলিলেন যে, তোমার স্বামী এই গ্রামেই আছেন। তিনি আসিয়া এখানেই উঠিয়াছিলেন। আমি আল্লাহর প্রতি ভরসা করিয়া ঐ মহল্লায়ই প্রবেশ করিলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃপায় আমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাত হইল। ওসমান ইবনে তালহা আমার স্বামীর ঠিকানা বলিয়া দিয়া মক্কা চলিয়া গেলেন।

উম্মে সালমা (রাঃ) যখন উক্ত বস্তিতে প্রবেশ করিলেন তখন তথাকার লোকজন তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি তাঁহার পিতার নাম-ধাম বলিলে লোকজন তাহা বিশ্বাস করিল না। কেননা তাহাদের ধারণা ছিল যে, তাহার পিতার মত একজন বিশিষ্ট ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তির পরিবারস্থ কোন মহিলা কিছুতেই এভাবে একা সফর করিতে পারে না। তবে ঘটনাক্রমে ঐ সময় উক্ত বস্তির কতিপয় লোক মক্কায় হজ্জোদ্দেশ্যে রওয়ানা করিলে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাহাদের কাছে মক্কায় স্বীয় পিতৃপরিবারে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য একখানা পত্র অর্পণ করিলেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই উম্মে সালমার নিজের ও তাঁহার পিতার এবং গোত্রের পরিচয় নিঃসন্দেহে স্বীকার করিল।

মদীনায় হিজরত উপলক্ষে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-কে যে কঠোর পরীক্ষা এবং দুর্যোগের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই মর্মান্তিক। সুতরাং হিজরত সম্পর্কিত কোন আলোচনা উঠিলেই হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) সগৌরবে বলিতেন, ইসলামের মহব্বতে আবু সালমার পরিবার যেরূপ বিপদ বরণ করিয়াছে নবী পরিবারে আর কেহ তদ্রূপ বিপদাপদ বরণ করিয়াছে বলিয়া আমি জানি না।

মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতকারিণী পর্দানশীন মহিলাগণের মধ্যে উম্মে সালমা (রাঃ)-ই ছিলেন প্রথম। ইহা তাঁহার এইটি অনন্য বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়।

স্বামী আবু সালমার শাহাদাত

মদীনায় পৌঁছিয়া হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) স্বামীর সাথে সুখে-দুঃখে পারিবারিক জীবন-যাপন করিয়া চলিয়াছিলেন। সংসারে অভাব-অনটন লাগিয়া থাকিলেও তাহাদের মানসিক শান্তির অভাব ছিল না। কিন্তু এই শান্তি বেশীদিন স্থায়ী হইল না। কিছুদিনের মধ্যেই ওহুদ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। বীর যোদ্ধা আবু সালমা (রাঃ) কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ছুটিয়া গেলেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তিনি কতিপয় কাফির সংহার করতঃ অবশেষে নিজেও শত্রুর তীরের আঘাতে আহত হইলেন। তাহার শরীর হইতে প্রবল ধারায় রক্ত স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় তিনি এতবেশী দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে, তাহার পক্ষে আর যুদ্ধ করা সম্ভব হইল না। তিনি কোন রকমে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

আবু সালমা (রাঃ) দুইটি পুত্র সন্তান রাখিয়া গিয়াছিলেন।

স্বামীর মৃত্যুতে শোকাকুল উম্মে সালমা (রাঃ) পাগলিনীর মত বিলাপ শুরু করিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) সংবাদ শুনিয়া আবু সালমার (রাঃ) গৃহে গমন করতঃ উম্মে সালমা (রাঃ)-কে নানাভাবে প্রবোধ এবং সান্ত্বনা দান করিলেন। তারপর বিশেষ যত্ন সহকারে আবু সালমার জানাযার নামায আদায় করেন। এই নামাযে চারিটি তাকবীরের

স্থলে একে একে তিনি নয়টি তাকবীর বলেন। ইহাতে সাহাবীবৃন্দ নামাযের পরে হুযুর (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! নামাযে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি হয় নাই তো ! হুযুরে পাক (সঃ) জবাব দিলেন, তোমরা আমার অধিক তাকবীর বলায় এই প্রশ্ন করিতেছ তো ? আসলে ঘটনা কি জান? এখন যাহার জানাযা পড়িলাম, সে লোক হাজার তাকবীর বলার যোগ্য।

অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে যে, আবু সালমা (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধে আহত হইলেও তাহাতে তিনি সাথে সাথে ইন্তেকাল করেন নাই। বরং একমাস চিকিৎসার পর তাঁহার যখম আরোগ্য হয়। ইহার পর তিনি রাসূল (সঃ)-এর আদেশে আর একটি ছোট যুদ্ধে যোগদান করেন। সেখানে তাহার প্রায় মাসাধিককাল কাটিয়া যায়। অতঃপর যখন তিনি সেখান হইতে মদীনাভিমুখে রওয়ানা করেন ঐ সময় তাঁহার সেই পুরাতন শুকানো যখমী আবার কাঁচা ও নূতন হইয়া উঠে। আবার উহা চিকিৎসা করা হয়; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না; বরং কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করেন।

উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁহার স্বামীর ইন্তেকালের খবর হুযুরে পাক (সঃ)-কে জানাইতে আসেন। হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহার বাড়ীতে গমন করিয়া দেখিলেন, সারা বাড়ী বিষাদ ও শোকের ছায়ায় আচ্ছন্ন। উম্মে সালমা (রাঃ) বার বার বলিলেন, দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে হায়, হায় কি শোচনীয় মৃত্যু। হুযুরে পাক তাঁহাকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়া বলিলেন, উম্মে সালমা ! তুমি তোমার স্বামীর জন্য শুধু দোয়া কর। আর বল, আল্লাহ তুমি আমাকে তদপেক্ষাও উত্তম স্বামী নছীব কর।

মৃত্যুর পর আবু সালমার (রাঃ) চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল, হুযুরে পাক (সঃ) নিজ হাতে তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

স্বামীর প্রতি গভীর ভালবাসা

স্বামীর প্রতি উম্মে সালমার গভীর ভালবাসা ছিল অতুলনীয়। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁহার স্বামীকে বলিলেন যে, যদি কোন স্ত্রীর স্বামী বেহেশতবাসী হয়, আর স্ত্রী তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ না করে, তবে আল্লাহ সেই স্ত্রীকেও তাহার স্বামীর সঙ্গে বেহেশতে স্থান দান করেন। এইরূপ যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয় তবে স্বামীও তাহার সাথে বেহেশতে প্রবেশ করে। অতএব হে স্বামীন! আসুন আমরা উভয়ে চুক্তি করিয়া লই যে, আপনার পরে আমি অথবা আমার পরে আপনি আর বিবাহ করিবেন না। উত্তরে হযরত আবু সালমা (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু পুনর্বিবাহ যে সুন্নত। আচ্ছা তুমি কি আমার উপদেশ মান্য করিবে? উম্মে সালমা (রাঃ) বলিলেন, কেন করিব না? আপনার আনুগত্য ছাড়া আমি আর কোন কিছুতে খুশী হইতে পারিব কি? তখন আবু সালমা (রাঃ) বলিলেন, তবে শুন! আমি মরিয়া গেলে আমার পরে তুমি বিবাহ করিয়া ফেলিও। অতঃপর আবু সালমা (রাঃ) তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিলেন, আয় মাবুদ! আমার পরে সালমাকে আমার চাইতে উত্তম স্থলাভিষিক্ত করিও।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, আমার স্বামী আবু সালমার (রাঃ) মৃত্যুর পর আমি ভাবিতাম যে, তাঁহার চাইতে উত্তম ব্যক্তি আর কে হইতে পারে। ইহার কিছুদিন পরেই আমার হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হইল।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর সাথে শুভ পরিণয়

হযরত আবু সালমার (রাঃ) মৃত্যুর পর উম্মে সালমা (রাঃ) চরম অর্থকষ্টে পতিত হইলেন। হুযুরে পাক (সঃ) ইহাতে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন। উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁহার স্বামীর মৃত্যুকালে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ঐ সন্তান প্রসবের পর হযরত আবুবকর (রাঃ) উম্মে সালমার (রাঃ) নিকট নিজের তরফ হইতে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলেন। কিন্তু উম্মে সালমা (রাঃ) তাহাতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু এই ব্যাপারটি উম্মে সালমার (রাঃ) জন্য উপস্থিত ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করিল। কেননা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর মত ব্যক্তির প্রস্তাব যেখানে ব্যর্থ হইয়াছে, সেখানে আর কেহ বিবাহের প্রস্তাব দিতে সাহসী হইল না। ফলে সালমার (রাঃ) সংসার যাত্রায় প্রায় অচল অবস্থা দেখা দিল। তখন এই অনাথা মহিলার এবং তাঁহার পিতৃহীন সন্তান-সন্ততিদের দুঃখ-ক্লেশ লাঘব করিতে দয়াল নবীর (সঃ) হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাই একদা তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে ডাকিয়া উম্মে সালমার (রাঃ) নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর তরফ হইতে তাঁহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব পেশ করিলেন।

এই প্রস্তাব শুনিয়া হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল। কিন্তু ধৈর্যশীলা ও বুদ্ধিমতি মহিলা বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, জনাব! ইহা আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় এবং উত্তম প্রস্তাব বটে। কিন্তু আমার দুইটি কথা আছে। আমি কিছুটা আত্মসচেতন মহিলা বৈ কি! তদুপরি আমার সন্তান-সন্ততি রহিয়াছে। তারপর আমার বয়সও একটু বেশী। বলা বাহুল্য হযরত রাসূলে করীম (সঃ) কথাগুলি শুনিয়া উল্লিখিত সমস্যাসমূহ নিজের উপরে বরণ করিয়া লইয়া উম্মে সালমা (রাঃ)-কে তাহা জানাইয়া দিলেন। অতঃপর একদিন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাহার দ্বিতীয় পুত্র ওমরকে বলিলেন, চল পুত্র, চল মহানবীর (সঃ) সহিত আমার বিবাহ পড়াইয়া দিবে।

চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষভাগে এই বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হইল। আল্লাহর মর্জী, উম্মে সালমার (রাঃ) প্রথম স্বামীর মৃত্যুজনিত সকল শোক-দুঃখ-বেদনা এই বিবাহের মাধ্যমে দূর হইয়া গেল।

বিবাহের পরবর্তীকাল

উম্মে সালমা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহধর্মিণীরূপে পরিগণিতা হইবার পর হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাকে দুইটি যাঁতা, একটি কলসী এবং খুরমার বাকলে ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ দান করিয়াছিলেন।

এই মহিলা যদিও হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সহধর্মিণী হইলেন, তবু তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-কে অত্যন্ত লজ্জা এবং সংকোচ করিতেন। হুযুরে পাক (সঃ) যখন তাঁহার গৃহে আগমন করিতেন, তখন তিনি লজ্জায় স্বীয় শিশু কন্যা জয়নবকে কোলে তুলিয়া নিতেন। এই অবস্থা দেখিয়া হুযুরে পাক (সঃ)-ও কোনরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন না; বরং সহজ সরল হৃদয়েই প্রত্যাবর্তন করিতেন। কিন্তু এই ঘটনা হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) ভ্রাতা আম্মার বিন ইয়াসের (রাঃ)-এর কর্ণগোচর হইলে তিনি

অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং ভগ্নিকে তিরস্কার করিলেন। পরে অবশ্য উম্মে সালমা (রাঃ)-এর এই লজ্জা দূরীভূত হইয়াছিল এবং অন্যান্য মহিষীদের ন্যায় তিনিও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিলেন।

উম্মে সালমা (রাঃ)-কে হুযুরে পাক (সঃ) অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এই কারণে যে, তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তিনি যথেষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ) ব্যতীত অন্যান্য বিবিগণ যখন কোন প্রয়োজনের সম্মুখীন হইতেন, তখন তাহা হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট পেশ করিবার জন্য সকলের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে উম্মে সালমা (রাঃ)-ই তাঁহার নিকট গমন করিতেন। সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

হুযুরে পাক (সঃ)-এর পত্নীগণের মধ্যে দুইটি দল বর্তমান ছিল। একদলে হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ) হযরত সাওদা (রাঃ) ও সুফিয়া (রাঃ)। হযরত আয়েশা এই দলের নেত্রী ছিলেন।

দ্বিতীয় দলটিতে ছিলেন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এবং অবশিষ্ট বিবিগণ, এই দলের নেতৃত্ব করিতেন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)।

হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি একটু বেশী অনুরক্ত ছিলেন। এজন্য লোকজন সাধারণতঃ হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহেই রাসূলুল্লাহর (সঃ) জন্য হাদিয়া-তোহফা পাঠাইতেন। আত্মমর্যাদাশীল হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এই ব্যাপারটিকে সহজভাবে মানিয়া লইতে পারিলেন না। তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর কাছে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আমরাও কি হযরত আয়েশার (রাঃ) মত সকলের কল্যাণ কামনা করি না। আমাদের প্রতি তাহাদের এই বৈরী ভাবের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।

জবাবে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলিলেন, উম্মে সালমা ! তুমি আয়েশা সম্পর্কে আমার মনে আঘাত দিতে চেষ্টা করিও না। জানিও একমাত্র আয়েশা (রাঃ) ব্যতীত তোমাদের অন্য কাহারও বিছানায় লেপের নীচে আমার নিকট অহী অবতীর্ণ হয় নাই। হুযুরে পাক (সঃ)-এর এই জবাব শুনিয়া হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) স্বীয় ভুল স্বীকার করতঃ হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর হুযুরে পাক (সঃ)-এর শান্তি ও আরামের দিকে অত্যধিক খেয়াল ছিল। সাফীনা নামে তাঁহার এক ক্রীতদাসী ছিল। তিনি তাহাকে এই শর্তে মুক্তি দিয়াছিলেন যে, যতদিন হুযুরে পাক (সঃ) জীবিত থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার খেদমত করিতে হইবে।

স্বভাব-চরিত্র

উম্মে সালমা (রাঃ) অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। একবার তিনি গলায় এক ছড়া হার ব্যবহার করিলেন। উহার কিছু অংশ স্বর্ণ নির্মিত ছিল। হুযুরে পাক (সঃ)-এর ইহা পছন্দ হইল না। উম্মে সালমা (রাঃ) ইহা অবগত হইবামাত্র হার ছড়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার একটি নিয়মিত অভ্যাস ছিল প্রত্যেক মাসের বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার এই তিনদিন রোযা রাখিতেন। সদা-সর্বদা তিনি ছওয়াব লাভের কাজেই রত থাকিতেন। তিনি তাঁহার পূর্ব স্বামীর সন্তানদেরকে নিজের কাছেই রাখিতেন এবং

তাহাদিগকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। প্রতিটি মন্দ কাজ হইতে তিনি বিরত থাকিতেন এবং যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বীরের ন্যায় মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতেন। দানশীলা হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল, নিজে তো দান করিতেনই একইভাবে অন্যকেও দান করার জন্য উৎসাহিত করিতেন।

শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গরিমা

শিক্ষা-দীক্ষা এবং জ্ঞান-গরিমায় রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রায় সব বিবিগণই উচ্চাসনের অধিকারিণী ছিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) অত্যন্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবু হোরায়রা (রাঃ) জ্ঞানের সাগর ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা উম্মে সালমার ফায়েজ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেন।

কোরআন, হাদীস এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার কোরআন তেলোওয়াতে হুযুরে পাক (সঃ)-এর পঠন রীতির হুবহু অনুকরণ প্রকাশ পাইত।

প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে সকল ফতোয়া ও মাসয়ালা প্রদান করিতেন তাহা অত্যন্ত সহজ-সরল হইত এবং তাহাতে কোনরূপ বিতর্ক বা দ্ব্যর্থবোধের অবকাশ থাকিত না।

তাবেয়ীনদের একটি বিরাট দল তাঁহার বাড়ীতে একরূপ স্থায়ী আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছিলেন।

অনেকেরই মতে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) মুজতাহিদ ছিলেন। আসবা' গ্রন্থ রচয়িতা উল্লেখ করিয়াছেন যে, উম্মে সালমা (রাঃ) পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার রায় সম্পূর্ণ নিখুঁৎ এবং সঠিক হইত। আল্লামা ইবনে কাইউম বলেন যে, তাঁহার ফতোয়াসমূহ সংকলন করিলে তাহাতে ছোট-খাট একখানা গ্রন্থ হইতে পারে।

একবার কতিপয় সাহাবী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হুযুরে পাক (সাঃ) সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, হুযুরে পাক (সঃ)-এর ভিতর ও বাহির অবিকল একই রকম। ঠিক এই মুহূর্তে হুযুরে পাক (সাঃ) উপস্থিত হইলে সাহাবীগণ তাঁহার নিকট উম্মে সালমা (রাঃ)-এর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তখন হুযুরে পাক (সঃ) উম্মে সালমা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, উম্মে সালমা! তুমি যথার্থই বলিয়াছ।

বিভিন্ন ঘটনাবলী

হুযুরে পাক (সঃ)-এর ঔষধ সেবন ঃ একাদশ হিজরী সনে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে অবস্থান করেন। এই সময় উম্মে সালমা (রাঃ) বার বার আয়েশার (রাঃ) গৃহে গমন করিতে থাকেন। একদিন হুযুরে পাক (সাঃ)-এর অবস্থা অত্যন্ত অবনতির দিকে চলিয়া গেলে উম্মে সালমা (রাঃ) অস্থির হইয়া পড়িয়া সজোরে চীৎকার দিয়া উঠিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিলেন, এইরূপ করিতে নাই, ইহা মুসলমানদের রীতি নহে। ধৈর্যধারণ কর। আর একদিন হুযুরে পাক (সঃ)-এর রোগের

তীব্রতা দেখিয়া বিবিগণ তাঁহাকে ঔষধ সেবনের জন্য পীড়া-পীড়ি করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি তাহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, ইহার একটু পরেই তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়েন। এই সময় উম্মে সালমা (রাঃ) ও বিবি আসমা বিনতে আমিস উভয়ে মিলিয়া তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া দেন। হুঁশ হইবার পর হুযুরে পাক (সঃ) ইহা অনুভব করিতে পারিয়া তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ঃ হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। উক্ত সন্ধির চুক্তিসমূহ বাহ্যতঃ খুবই অপমানকর দৃষ্ট হওয়ায় মুসলমানগণ খুবই বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহার ফলে হুযুরে পাক (সঃ) সকলকে কোরবানী করার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা উদ্যোগী হইলেন না। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, পর পর তিনবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সকলেই অনড় রহিলেন। একান্ত অনুগত মুসলমানদের এই বিস্ময়কর অবস্থা অবলোকন করিয়া হুযুরে পাক (সঃ) আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন, তখন তিনি আর কিছু না বলিয়া তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করতঃ উম্মে সালমার (রাঃ) নিকট ব্যাপারটি বলিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আপনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজে গিয়া কোরবানী করতঃ এহরাম খোলার উদ্দেশ্যে চুল মুণ্ডন করুন। তখন সত্যই তিনি বাহিরে আসিয়া কোরবানী করিয়া মাথা মুণ্ডন করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া মুসলিমগণ যেন চৈতন্য লাভ করিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এই সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। সুতরাং সকলেই কোরবানী করতঃ চুল কামাইতে শুরু করিলেন। এই সময় তাহাদের মধ্যে এমনভাবে তাড়াহুড়া পড়িয়া গেল যে পরস্পরের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিও হইতে লাগিল।

হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) এই পরামর্শটি যে সুতীক্ষ্ণ ও গভীর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ইহা মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতারও একটি দৃষ্টান্ত বৈ কি! মানুষের মনোভাব অনুভব করতঃ তাহার পরিবর্তন সাধন করিতে এই ধরনের বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতা প্রদর্শন করা নারী তো দূরের কথা, বহু বিজ্ঞ ও সুযোগ্য পুরুষদের দ্বারাও সম্ভব হয় না।

হযরত ইমামুল হারামাইন (রহঃ) বলেন যে, মহিলাজগতের ইতিহাসে যথার্থ পরামর্শদানের এমন নজির স্থাপন করা বিস্ময়কর ঘটনা বৈ কি !

ওমর (রাঃ)-কে ধমকি প্রদান ঃ নবম হিজরী সনে ঈলার ঘটনাকালে হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় কন্যা হাফসা (রাঃ)-কে কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া দেন এবং তিরস্কার করেন। অতঃপর তিনি কিছুটা আত্মীয়তা এবং স্নেহপ্রীতির সম্পর্কের দাবীতে হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) নিকট গিয়া তাঁহার সাথেও একটু মুরুব্বিয়ানার সুরে কথা-বার্তা শুরু করেন। ইহাতে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া ধমকের সাথে বলেন, ওমর ! তুমি দেখিতেছি প্রত্যেকটি ব্যাপারেই অনধিকার চর্চা করিতেছ। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁহার বিবিদের মধ্যকার ব্যাপারেও নাক গলাইতে আসিতেছ।

হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) কঠোর উক্তিতে হযরত ওমর (রাঃ) চুপ হইয়া যান। পরদিন তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বিবৃত করেন। এমনকি উম্মে সালমার বক্তব্যটি উল্লেখ করেন। হুযুরে পাক (সঃ) কথাটি শুনিয়া কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকিয়া মৃদু হাস্য করেন।

স্বপ্নযোগে রাসূল (সঃ)-এর সাক্ষাত লাভ

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর স্নেহের পুত্তলি ইমাম হোসায়েন যখন কারবালার প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন, তখন একদা রাত্রে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন, তাঁহার স্বামী রাসূলে করীম (সঃ) বিমর্ষ চেহারায় তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার চেহারা দেখিয়া তাঁহাকে খুব বিব্রতও মনে হইতেছে।

তাঁহাকে দেখিয়া একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! এরশাদ করুন খবর কি? নবী (সঃ) বলিলেন, আমি হোসায়েনের শাহাদাতের স্থান হইতে আগমন করিয়াছি।

এই স্বপ্ন দেখিয়া উম্মে সালমা (রাঃ) যখন জাগিয়া উঠিলেন, তখন তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। এই অবস্থায়ই তিনি বলিয়া উঠিলেন, ইরাকের লোকগণ হোসায়েনকে হত্যা করিয়াছে। আল্লাহ তাহাদিগকে হত্যা করুন। তাহারা হোসায়েনকে অপমান করিয়াছে। আল্লাহর লানত তাহাদের উপর পতিত হউক।

হাদীস বর্ণনা ঃ উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে হাদীস বর্ণনার সংখ্যার দিক দিয়া হযরত আয়েশার (রাঃ) পরেই হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) স্থান। তিনি ৩৭৮টি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) যাহা বলেন ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, আমি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম। ইনি আমার হুজরায় আসিলে তাঁহাকে আমি আমার নিজের আসনে বসাইয়া দিতাম। তিনি কখনও আমাকে আদর করিয়া আমার কপোল চুম্বন করিতেন। এই মহিলার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল অদ্ভুত ধরনের। যখন ইনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর সাথে এই বিষয় নিয়া আলাপ-আলোচনা করিতেন, গভীর মনোযোগের সহিত আমি তাহা শ্রবণ করিতাম।

ইহা ছাড়া উম্মে সালমা (রাঃ)-এর যোগ্যতা ছিল যুক্তি-তর্কেও অদ্ভুদ রকমের। তিনি যখন কোরআন শরীফের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা লইয়া রাসূলুল্লাহর (সঃ) সহিত মতভেদ করিতেন তখন তাঁহার অদ্ভুত ও অপূর্ব যুক্তি শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) যারপর নাই আনন্দ এবং তৃপ্তি উপভোগ করিতেন।

শিষ্যমণ্ডলী

একটি বৃহৎ জামাত হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) নিকট হইতে হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে কিছুসংখ্যক লোকের নাম এখানে উল্লেখ করা হইল। যথা ঃ

(১) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর (রাঃ)। (২) উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)। (৩) হিন্দা বিনতে হারিস। (৪) সুফিয়া বিনতে শায়বা। (৫) ওমর (রাঃ)। (৬) জয়নব। (৭) মাসআব ইবনে আবদুল্লাহ। (৮) আবদুল্লাহ ইবনে রাফে'। (৯) আবু বাকী। (১০) সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব। (১১) আবু ওসমান। (১২) সুফিয়া বিনতে মহসিন। (১৩) শা'বি। (১৪) আবদুর রহমান ইবনে হারিস। (১৫) ওরওয়া ইবনে জোবায়ের। (১৬) নাফে'। (১৭) মাওলা ইবনে ওমর। (১৮) ইয়ালা ইবনে

মালিক এবং আরও অনেকে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর নিকট হইতে হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর পবিত্র কেশ লাভ

হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত উম্মে সালমার (রাঃ) গভীরতর মহব্বত এবং অন্তরঙ্গতার নির্দশনস্বরূপ তিনি তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পবিত্র কেশের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। হুযুরে পাক (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর লোকগণ উহা যিয়ারত করণার্থে সব সময়ই হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) কাছে ভিড় জমাইয়া থাকিত।

উম্মে সালমার (রাঃ) দৈহিক সৌন্দর্য

হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিবিগণের মধ্যে কয়েকজন খুবই বেশী সুন্দরী ছিলেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) বয়স বেশী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার দৈহিক গঠন এবং রূপ-লাবণ্য এমনই সুন্দর ছিল যে, হযরত আয়েশার (রাঃ) মত শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মহিলাও উম্মে সালমার রূপের আলোচনা উঠিলে কেমন যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতেন।

সন্তান-সন্ততি

হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) হুযুরে পাকের (সঃ) গৃহে কোন সন্তান হয় নাই। কিন্তু পূর্ব স্বামীর গৃহে তাঁহার কতিপয় সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যথা ঃ

(১) সালমা ঃ ১ম পুত্র। ইনি পিতা-মাতা আবিসিনিয়ায় হিজরতকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) তাহার সহিত হযরত আমীর হামজাহর কন্যা ইমামার বিবাহ পড়াইয়া দেন।

(২) ওমর ঃ ২য় পুত্র। ইনিই মাতা উম্মে সালমা (রাঃ)-কে হুযুরে পাক (সঃ)-এর সাথে বিবাহ পড়াইয়া দেন। হযরত আলীর (রাঃ) শাসনামলে ইনিই পারস্য ও বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

(৩) দুররাহ ঃ ৩য় পুত্র। যাহার কথা বোখারী শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়।

(৪) উম্মে সালমার (রাঃ) ৪র্থ সন্তান একটি কন্যা। এই কন্যার শৈশবকালীন নাম ছিল বারাহ। পরে হুযুরে পাক (সঃ) তাহার নাম জয়নব রাখিয়াছিলেন।

ইন্তেকাল

উম্মে সালমা (রাঃ) দীর্ঘজীবি মহিলা ছিলেন। হুযুরে পাক (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরেও তিনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। হিজরী ৬৩ সনে দীর্ঘ ৮৪ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) তাঁহার জানাযা নামায পড়াইয়াছিলেন এবং মদীনার বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

বর্ণিত রহিয়াছে, ঐ সময় মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন আবু সুফিয়ানের পৌত্র অলীদ ইবনে ওৎবা। রীতি অনুযায়ী তাহারই জানাযা নামাযের ইমামতী করার কথা। কিন্তু হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ৎ করিয়া গিয়াছিলেন যে, সেই ব্যক্তি যেন তাঁহার জানাযার নামায না পড়ান। তদনুসারেই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) তাঁহার জানাযার নামায পড়াইয়াছিলেন।

হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)

নাম, পিতা-মাতা, বংশ

হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) ছিলেন হুযুরে পাকের (সঃ) ৭ম স্থানীয়া সহধর্মিণী। ইনি রাসূলুল্লাহর (সঃ) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া হইতেন। এই মহিলার নাম ছিল জয়নব, পারিবারিক নাম বা কুনিয়াৎ ছিল উম্মে হাকাম। ইনি কোরায়েশ বংশীয় প্রসিদ্ধ আসাদ বিন খুজাইমার খান্দানোদ্ভূত মহিলা ছিলেন।

হযরত জয়নব (রাঃ)-এর পিতার নাম ছিল জাহাশ, ইনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। আর তাঁহার মাতার নাম ছিল উমায়মা (রাঃ)। ইনি ছিলেন হুযুরে পাক (সঃ)-এর আপন ফুফু। অতএব তাঁহার কন্যা হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাক্ষাত ফুফাতো বোন হইতেন। এই মহিলার সাথে হিজরী পঞ্চম সনে হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম বিবাহ

তৎকালীন যুগে আরব দেশে অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের মত মানুষও বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হইত। এইভাবে ক্রীত লোকগুলি ক্রীতদাসরূপে জীবন-যাপন করিত। হযরত খাদীজার (রাঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র হাকীম ইবনে খুজাইমা একদা বাজার হইতে যায়েদ ইবনে হারেসা নামক জনৈক দাসকে ক্রয় করিয়া আনিয়া ফুফু খাদীজার (রাঃ) খেদমতের জন্য তাঁহার হস্তে সোপর্দ করিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) এই দাসটিকে স্বামী হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর খেদমতের জন্য ন্যস্ত করিলেন। কিন্তু যিনি জগতে আসিয়াছেন বিশ্ব মানবের মধ্য হইতে বৈষম্য দূরীভূত করিতে এবং ভেদাভেদ তুলিয়া দিতে, যিনি আসিয়াছেন মানুষের মাঝে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে আর দাসত্ব মোচন করা ছিল যাঁহার জীবনের প্রধান পণ, তিনি কিভাবে মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ রাখিতে পারেন? অচিরেই তিনি যায়েদকে দাসত্ব মুক্ত করিয়া তাহাকে স্বীয় পুত্রতুল্য স্নেহে পালন করিতে লাগিলেন। মুক্ত যায়েদ হুযুরে পাক (সঃ)-এর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম ধর্ম

গ্রহণ করিলেন। উল্লেখ্য যে, হুযুরে পাক (সঃ)-এর ফুফাত ভগ্নি হযরত জয়নব (রাঃ)-ও ইসলামের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহার পালিত পুত্র যায়েদের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়াও নিজের জন্য কর্তব্য মনে করিলেন এবং তদনুসারে তিনি স্বীয় ফুফাত ভগ্নি জয়নবের সহিত যায়েদের বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। এই বিবাহের মাধ্যমে তিনি মুসলিম সমাজে এক অপূর্ব সাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। আরবের লোক বিস্ময়াভিভূতভাবে অবলোকন করিল যে, ইসলামে উচ্চ-নীচ বা দাস-মুনীবের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই। মক্কার শ্রেষ্ঠ অভিজাত কোরায়েশ মহিলার সাথে অতি নীচ স্তরের সামান্য এক ক্রীতদাসের বিবাহ হইতে পারে। ইসলাম মানুষকে ভেদাভেদ মোচনের এই শিক্ষা দান করিতেছে।

স্বামী-স্ত্রীতে অবর্গ-অমিল

হযরত জয়নব ও হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর মধ্যে বিবাহ হইল ঠিকই, কিন্তু ইহা তেমন শান্তিময় হইল না। জয়নব (রাঃ) তাঁহার শ্রদ্ধেয় ও সুযোগ্য অভিভাবক হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর নির্দেশ ও মন রক্ষার্থে যদিও এই বিবাহে রাজী হইলেন তবুও এক সদ্যমুক্ত ক্রীতদাসের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে সত্যিকারভাবে এই ব্যাপারে সায় মিলিতেছিল না। মনমরা অবস্থায় তাঁহাদের পারিবারিক জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জয়নব (রাঃ)-এর হৃদয়ের ক্ষোভ প্রকাশ পাইতে শুরু করিল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হইল। যায়েদের ভীষণ অশান্তির মধ্যে দিন কাটিতে লাগিল। এই ঘটনা তিনি হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর গোচরে আনিলেন এবং জয়নব (রাঃ)-এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাকে ধৈর্য রক্ষার উপদেশ দিলেন। এইভাবে একটি বছর অতিবাহিত হইল। কিন্তু কোন রকম শুভ লক্ষণ দেখা না দিয়া বরং সম্পর্কের ক্রমেই অবনতি হইতে লাগিল। অবশেষে যায়েদ (রাঃ) জয়নবের ধৃষ্টতায় অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে তালাক দিলেন এবং এইকথা হুযুরে পাক (সঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করিলেন। হুযুর (সঃ) শুনিয়া নীরব রহিলেন, যায়েদকে কিছুই বলিলেন না।

মূলতঃ এই ঘটনার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল এবং তজ্জন্যই সবকিছু ঘটিতেছিল। ইহা প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না।

বিবি জয়নব এইবার স্বাধীন হইলেন। জয়নব (রাঃ)-এর ইদ্দত অতিক্রান্ত হইবার পর আল্লাহ তায়ালা হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রতি জয়নবকে নিজের স্ত্রীরূপে গণ্য করিয়া লইতে নির্দেশ দান করিলেন।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) কর্তৃক জয়নবের পাণিগ্রহণ

সে সময়ে আরবে নানা ধরনের কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, পালিত পুত্রকে ঔরসজাত পুত্রের মত মনে করা হইত এবং তৎকর্তৃক পরিত্যাজ্য বা তাহার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করা একটি মারাত্মক গর্হিত ও পাপের কাজ বলিয়াই সকলে মনে করিত। কিন্তু আল্লাহর মনোনীত ইসলাম ধর্মে এই ধারণার কোন মূল্যই ছিল না ; বরং এই কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিতেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। আর এই

সকল ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করায় নওমুসলিমদের মনে যেহেতু কিছুটা দুর্বলতা বিরাজ করিতেছিল, তজ্জন্য স্বয়ং রাসূলে করীম (সঃ)-এর মাধ্যমেই আল্লাহ ইহার দৃষ্টান্ত করিতে চাহিলেন এবং সেই কারণেই আল্লাহর পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি জয়নব (রাঃ)-কে বিবাহ করার নির্দেশ হইল।

উক্ত নির্দেশ অনুসারেই একদা হুযুরে পাক (সঃ) যায়েদ (রাঃ)-কে আদেশ দিলেন, তুমি আমার পক্ষ হইতে জয়নবকে বিবাহের পয়গাম পেশ কর।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর পক্ষ হইতে ইঙ্গিত আসিবার পরও হুযুরে পাক (সঃ) মহা ভাবনায় পড়িয়াছিলেন যে, আরবের সর্বজনস্বীকৃত সংস্কার হইল, আপন পুত্রবধূর মতই ধর্মপুত্রের স্ত্রীকেও বিবাহ করা যায় না। হঠাৎ সেই যুগ-যুগান্তরের সংস্কারের উপর কিভাবে তিনি আঘাত হানিবেন? অথচ আল্লাহ তায়ালার মর্জীর বিরুদ্ধে যাইবার ইচ্ছাও তাঁহার থাকিতে পারে না। হুযুরে পাক (সঃ)-এর এইরূপ দোদুল্যমান অবস্থা দেখিয়া আল্লাহ তায়ালা তন্মুহূর্তে সতর্কবাণী প্রেরণ করিলেন ঃ

'অ তুখফী ফী নাফসিকা মাল্লাহু মুবদীহি অ তাখশান্নাসা। অল্লাহু আহাক্কু আন তাখশাহু"।

অর্থাৎ ঃ (হে নবী) ! আপনি আপনার অন্তরে তাহা গোপন করিতেছেন, আল্লাহ যাহা প্রকাশ করিয়া দিতে চাহেন; আর আপনি মানুষকে ভয় করিতেছেন, অথচ আল্লাহ তায়ালাই উপযুক্ত পাত্র যাঁহাকে আপনার ভয় করা উচিত। বলা বাহুল্য, এই নির্দেশবাণী পৌঁছিবা মাত্রই হুযুরে পাক (সঃ) মনের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জয়নবের নিকট তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) নির্দেশ অনুযায়ী যায়েদ (রাঃ) জয়নব (রাঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট রাসূলুল্লাহর (সঃ) প্রস্তাব পেশ করিলেন। বিবি জয়নব (রাঃ) তখন রুটি বানাইবার জন্য আটার খামিরা প্রস্তুত করিতেছিলেন। তিনি প্রস্তাব শুনিয়া যারপর নাই খুশী হইলেন। কিন্তু যায়েদকে জানাইয়া দিলেন, ইহা খুবই ভাল কথা তবে ইস্তেখারা করিয়া যাহা হয় বলিতেছি। এই বলিয়া সাথে সাথে তিনি জায়নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন। ইস্তেখারায় অনুকূল সাড়া পাওয়া গেল। অতঃপর যথাসময় হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

পর্দার নির্দেশ

এই বিবাহে অলিমার (বিবাহ ভোজ অনুষ্ঠান) আয়োজন করা হইল। আনসার ও মুহাজিরগণকে দাওয়াত করা হইল। প্রায় তিনশত মেহমান উপস্থিত হইলেন। একেকবারে দশজন করিয়া লোক খানা খাইয়া যাইতে লাগিলেন। শেষবারে কতিপয় লোক খানা খাইবার পর উঠিয়া না গিয়া ঐ বৈঠকেই জয়নবের গৃহে বসিয়া গল্প-গুজবে সময় কাটাইতে লাগিলেন। তাহারা ইহাতে দীর্ঘ সময় কাটাইয়া দিলেন। গৃহমধ্যে জয়নব (রাঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহর (সঃ) অস্বস্তি অনুভব করিতে পারিয়া অনেকে তখন উঠিয়া গেলেন। কিন্তু কেহ কেহ তখনও বসিয়া রহিলেন। এই সময় আল্লাহ তায়ালা পর্দার আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

"হে মুমিন ব্যক্তিগণ ! তোমরা নবীর গৃহে যখন-তখন প্রবেশ করিও না। অবশ্য খাইবার দাওয়াত পাইলে যাইবে তবে ডাকিবার পূর্বে গিয়া অনর্থক বসিয়া থাকিবে না।

বরং ডাকিবার পরে যাইবে, খাওয়ার পরে চলিয়া আসিবে। বসিয়া গল্প-গুজবে রত হইবে না। ইহা রাসূলে করীম (সঃ)-এর মনঃপুত নহে। তিনি লজ্জার খাতিরে কিছু বলিবেন না। কিন্তু আল্লাহর যাহা বলিবার তাহা বলিয়াই দিবেন। হ্যাঁ, তোমরা যখন তাঁহাদের কাছে কিছু চাহিবে, তখন পর্দার অন্তরাল হইতেই চাহিবে।

গুণ-গরিমা, গৌরব ও বৈশিষ্ট্য

উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে হযরত জয়নবের গৌরবের সত্যিই কারণ ছিল। তাঁহার বিবাহের উপলক্ষে আল্লাহর তরফ হইতে অহী নাযিল হইয়াছিল। তাহাছাড়া তাঁহারই বিবাহের মাধ্যমে আরবের কতকগুলি কুসংস্কার বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং ইসলামের সাম্য শিক্ষার সেই গৌরবময় ভূমিকার অবতারণা হইয়াছিল, যাহাতে ক্রীতদাস ও স্বাধীন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য রহিত হইয়াছিল। এই বিবাহের অলিমা অনুষ্ঠানে বহু ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ ও আপ্যায়ন করা হইয়াছিল। এই বিবাহের প্রাক্কালেই পর্দা প্রথার সূত্রপাত হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণে হযরত জয়নব (রাঃ) নিজেকে অন্যান্য নবী-মহিষীদের তুলনায় গৌরবান্বিতা মনে করিতেন।

নবী-পত্নীগণের মধ্যে তাঁহার গৌরবের পরিমাপ স্বয়ং হযরত আয়েশার (রাঃ) একটি হাদীস দ্বারাই করা যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ)-ই বলিয়াছিলেন ঃ বিবিদের মধ্যে হুযুরে পাক (সঃ)-এর দৃষ্টিতে সে-ই (জয়নব) সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়া আমার সমকক্ষতার দাবী করিতে পারে।

চরিত্র ও ইবাদত-বন্দেগী

জয়নব (রাঃ)-এর অন্যতমা সপত্নী বিবি উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, হযরত জয়নবের স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত মধুর ছিল। তিনি অতিশয় সৎ মহিলা, নামাযী ও রোযা প্রিয় ছিলেন।

এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি জয়নব অপেক্ষা বেশী দ্বীনদার, খোদা-ভীরু, সত্যভাষিণী, উদার, দানশীলা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি সন্ধানী আর দেখি নাই।

হযরত জয়নব (রাঃ)-এর খোদাভীতি, ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যপ্রিয়তার একটি উজ্জ্বল নজির পাওয়া যায় হযরত আয়েশার (রাঃ) জীবনের সেই দুর্ঘটনার মধ্য দিয়াও। যখন তাঁহার সম্পর্কে একটি অবাঞ্ছিত কুৎসা রটানো হয়, তখন ইহার সঙ্গে হযরত জয়নব (রাঃ)-এর ভগ্নি হাসনা জড়িত ছিল। হুযুরে পাক (সঃ) জয়নব (রাঃ)-এর কাছে এই সময় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তখন পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিলেন অস্তাগফিরুল্লাহ! আমার হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছু জানা নাই।

হযরত জয়নব (রাঃ)-এর চরিত্রে নানাগুণের সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মধ্যে কখনও কিছুটা রুক্ষতা প্রকাশ পাইত। অবশ্য এজন্য তিনি নিজে অনুতপ্ত ছিলেন। সাধারণভাবে তিনি হৃষ্টচিত্তের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন উপায়ে অর্থোপার্জন করতঃ আল্লাহর পথে তাহা খরচ করিতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত জয়নব (রাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন মদীনার গরীব-দুঃখীগণ দুঃখে-শোকে মাতম শুরু করে।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক প্রেরিত তাঁহার বার্ষিক ভাতা আসিয়া পৌঁছিলে তিনি তাহা সমস্তই গরীব-দুঃখীদের মাঝে বিলাইয়া দেন এবং দুইহাত তুলিয়া আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন, হে মাবুদ! অন্যের দানের উপর আর কতকাল নির্ভর করিব? ইহার পর আর যেন ওমর (রাঃ)-এর দানের দ্বারা আমাকে চলিতে না হয়। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাঁহার প্রার্থনা কবুল করিয়াছিলেন। কেননা সেই বৎসরই তিনি পুনরায় ভাতা প্রাপ্তির পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

দৈহিক গঠন

উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে প্রায় সকলেই দীর্ঘাকৃতি, মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন, তবে ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন কেবলমাত্র হযরত জয়নব (রাঃ)। তাঁহার আকৃতি কিছুটা খাট ছিল। অবশ্য তিনি যথেষ্ট সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারিণী ছিলেন।

হাদীস বর্ণনা

হযরত জয়নব (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরে খুব অল্পদিনই জীবিত ছিলেন। সুতরাং তৎকর্তৃক খুব বেশী হাদীস বর্ণিত হয় নাই। মাত্র এগারটি হাদীস তিনি রাওয়ায়েত করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার নিকট হইতে হাদীস রাওয়ায়েত করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন ঃ (১) বিবি উম্মে হাবীবাহ (২) জয়নব বিনতে আবি সালমা (৩) মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাহাশ এবং (৪) কুলসুম বিনতে তালক প্রমুখ।

ইন্তেকাল

বিশ হিজরী সনে ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হযরত জয়নব (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে ত্যাজ্য সম্পত্তি হিসাবে তিনি কেবল একটি বাড়ী রাখিয়া যান। পরবর্তীকালে উমাইয়া শাসক অলীদ ইবনে আবদুল মালেক স্বীয় শাসনকালে পঞ্চাশ হাজার দেরহাম মূল্যে বাড়ীটি খরিদ করিয়া উহা মসজিদে নববীর শামিল করিয়া দেন।

হযরত জয়নব (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে নিজেই নিজের কাফন-দাফনের সরঞ্জামসমূহ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। আর খলীফা ওমর (রাঃ) কাফনের কাপড় দিলে তাহা গরীবকে দান করিয়া দিতে অসিয়ৎ করিয়া যান। তাঁহার এই অসিয়ৎ অনুযায়ী কাজ করা হইয়াছিল।

তাঁহার জানাযার নামাযের ইমামতী করিয়াছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)। উসামা বিন যায়েদ (রাঃ), মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ জাহাশ এবং আবদুল্লাহ বিন আবু আহমদ বিন জাহাশ তাঁহার লাশ কবরে নামাইয়াছিলেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছিল।

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ)

নাম, বংশ ও পিতৃকুল পরিচিতি

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ) হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর প্রায় পরে পরেই নবী সহধর্মিণীর মর্যাদায় ভূষিত হন। সুতরাং নবী-মহিষীদের ক্রমিক সংখ্যায় হযরত জুওয়াইরিয়ার (রাঃ) স্থান ৭ জনের পরে।

এই মহিলার প্রকৃত নাম ছিল "বাররাহ"। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) তাহা পরিবর্তন করিয়া জুওয়াইরিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর পিতা হারেস ইবনে আবু যিয়ার বা আবি দাররা খুযাআ বংশের বনু মুসতালিক গোত্রের সর্দার ছিলেন।

হারেসের পিতার নাম ছিল আবি দাররা, তাহার পিতা হাবিব আয়িজ, তাহার পিতা মালেক, তাহার পিতা জাযীমা, তাহার পিতা সাদ, তাহার পিতা আমর, তাহার পিতা রাবিয়া, তাহার পিতা হারেস এবং তাহার পিতা ছিলেন আমর মুজাইরিয়া।

হারেস সুঠাম স্বাস্থ্যবান এক পুরুষ ছিলেন। তাহার দৈহিক গঠন অনুরূপ শৌর্য-বীর্যেও তিনি খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। তাহা ছাড়া তাহার হৃদয়টি ছিল অতিশয় উদার ও মহৎ। লোকগণ তাহাকে যারপর নাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত।

এই সর্দার হারেসেরই একটি কন্যা সন্তান ছিল। রূপে, গুণে এই কন্যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। একে তো সর্দারের কন্যা, তদুপরি রূপে-গুণে ছিলেন অদ্বিতীয়া, তাই তাঁহার পরিচয় ছড়াইয়া পড়িল সর্বত্রই। এই কন্যাই ছিলেন বাররাহ তথা জুওয়াইরিয়া।

প্রথম বিবাহ

বাররাহ যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথেই পিতা হারেস তাহার বিবাহ দিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সহজেই স্ববংশীয় একটি উত্তম পাত্র জুটিয়া গেল। এই পাত্রের নাম ছিল মুশাফি ইবনে সাফওয়ান। মুশাফি নানাগুণে গুণবান ছিলেন। হারেস তাহার কন্যা বাররাহকে এই পাত্রের নিকটই বিবাহ প্রদান করেন। হারেস কন্যাকে অত্যধিক আদর করিতেন বলিয়া তাহাকে বিবাহ দিবার পরও তাহার যে কোন আবদার ও দাবী-দাওয়া পূরণ করিতেন। পক্ষান্তরে তাহার স্বামীও তাহাকে অত্যধিক ভালবাসিতেন বলিয়া তিনি স্বামীকে যখন যাহা বলিতেন তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিতেন। এইভাবে পিতা ও স্বামীর নিকট অত্যধিক স্নেহ এবং প্রীতিলাভ করতঃ জুওয়াইরিয়া স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা আত্মাভিমানী এবং দাম্ভিক প্রকৃতির হইয়া উঠিলেন।

মুরাইসীর যুদ্ধ

মুরাইসী এলাকার কবিলায় বনু মুসতালিকের লোকগণ ইসলাম ধর্ম বিরোধী ছিল। বিশেষতঃ কবিলার সর্দার হারেস এবং জুওয়াইরিয়ার স্বামী-মুশাফি উভয়েই হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত চরম শত্রুতা পোষণ করিতেছিলেন। যে কোন সুযোগে তাহারা মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার করিতে এতটুকু কসুর করিত না। হিজরী ৫ম সনে এইরূপ

একটি খবর ছড়াইয়া পড়িল যে, উক্ত কবিলায় বনু মুসতালিকের লোকেরা মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

এই সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হুযুরে পাক (সঃ) উহাদের বিরুদ্ধে একদল আনসার সেনা প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা মুরাইসীর প্রান্তসীমায় গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। হারেস মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না মনে করিয়া আগে ভাগেই আত্মগোপন করিলেন। কিন্তু তাহার অধীনস্থ লোকগণ পিছু হটিল না। মুসলমানদের সাথে তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিল, কিন্তু বেশীক্ষণ তিষ্ঠিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মুসলিম সেনাগণ সহজেই জয়লাভ করিয়া প্রায় ছয়শত শত্রুসেনা বন্দী করিলেন। তাহা ছাড়া উহাদের প্রায় ২০০০ হাজার উষ্ট্র, পাঁচ হাজার বকরী এবং আরও অন্যান্য দ্রব্য মুসলমানদের হাতে আসিল। বন্দীগণের মধ্যে হারেস দুহিতা জুওয়াইরিয়াও ছিলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে, যুদ্ধবন্দী সকল শত্রুসেনা গোলামরূপে মুসলমানদের মধ্যে বন্টিত হইল। বন্টনে জুওয়াইরিয়া সাবিত বিন কায়েসের ভাগে পড়িলেন। তখন আত্মাভিমানী জুওয়াইরিয়া দাসীজীবনের কথা খেয়াল করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং মুক্তিপণ আদায় করতঃ মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সাবিত বিন কায়েসের কাছে এই প্রস্তাব দেওয়ায় নয় আওকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে তিনি তাহাকে মুক্তিদান করিতে পারেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু জুওয়াইরিয়ার নিকট ঐ পরিমাণ স্বর্ণ মৌজুদ ছিল না। তাই তিনি উহা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে খোদ হুযুরে পাক (সঃ)-এর খেদমতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করিলেন। হুযুরে পাক (সঃ) মহিলাটির স্বাধীন জীবনযাপনের প্রবল স্পৃহা দেখিয়া উহার প্রতি মনে মনে খুশীই হইলেন এবং তিনি নিজেই প্রয়োজনীয় অর্থ দান করতঃ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

জুওয়াইরিয়া হুযুরে পাক (সঃ)-এর এইরূপ উদারতা ও মহত্ত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাত ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন

জুওয়াইরিয়া যখন বন্দীমুক্ত হইয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন তখন তিনি মাত্র বিশ বৎসরের যুবতী। আল্লাহ তাহাকে অমূল্য নেয়ামত রূপ ও সৌন্দর্য দান করিয়াছিলেন বিশেষভাবে। তাই ধর্মান্তরের সাথে সাথে তাঁহাকে লইয়া এক জটিল সমস্যা দেখা দিল হুযুরে পাক (সঃ)-এর সম্মুখে। কেননা জুওয়াইরিয়া এখন পিতা-মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজন সকলের সাথেই সম্পর্কহীন। অতএব, এখন তিনি কাহার আশ্রয় ও কিভাবে জীবন যাপন করিবেন এবং নিজের ইজ্জত ও মান-সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবেন? এই সময় মুসলমানদের সংখ্যাও খুবই নগণ্য। যে অতিকতক পুরুষ মুসলমান ছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই সকলেই আর্থিক সঙ্কটাপন্ন। নিজ নিজ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়াই চলা মুশকিল। এমতাবস্থায় জনৈক নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া বা আশ্রয় দিয়া তাহার সকল দায়িত্ব মাথায় তুলিয়া লওয়া তাহাদের কাহারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সমস্যার জটিলতায় খোদ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ও ভাবনায় পড়িলেন। কিন্তু তিনি যে আল্লাহর মহানবী, শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের বাহক ও প্রচারক। মানুষের মুক্তি, শান্তি ও

সমস্যা মোচনের পথ প্রদর্শক, তিনি ভাবনায় পড়িলে চলিবে কি করিয়া? তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্য হইল সুদূর প্রসারী। সুতরাং সহসাই তিনি কর্তব্য স্থির করিয়া নিজের পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলেন।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) তরফ হইতে বিবাহের প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়া জুওয়াইরিয়া আল্লাহর দরবারে অশেষ শোকরিয়া জ্ঞাপন করিলেন। আনন্দে তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অতি আনন্দের সাথে তিনি এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অতঃপর যথাশীঘ্র হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত বিবি জুওয়াইরিয়ার (রাঃ) শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে স্বামীরূপে লাভ করিয়া জুওয়াইরিয়া (রাঃ) যেন এক নূতন জীবন ফিরিয়া পাইলেন। এই সময় তিনি তাঁহার অতীত জীবনের যাবতীয় পাপ ও অধর্মাচার হইতে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বন্দীমুক্তি ঘটনা

হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত যখন হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ) বিবাহের কথাবার্তা পাকাপাকি হইয়া গেল, তখন কিন্তু জুওয়াইরিয়া কবিলার ছয়শত বন্দী দাসরূপে মুসলিম সেনাদের মাঝে বন্টিত হইয়া গিয়াছে। এমনি অবস্থায় মুসলিম সেনাগণ ভাবিলেন, যে বংশে হুযুরে পাক (সঃ) বিবাহ করিতে যাইতেছেন সেই বংশের কোন লোকের গোলাম হিসাবে জীবনযাপন করা কোনরূপে শোভা পায় না। কেননা ইহা আল্লাহর নবীর মর্যাদার প্রতি দাগতুল্য। অতএব তাহারা সকলেই আপনাপন গোলামকে তক্ষণি আজাদ করিয়া দিলেন।

হযরত জুওয়াইরিয়ার (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর সাথে বিবাহের উসিলায় আল্লাহর রহমতে বনি মুসতালিক কবিলার ছয়শত বন্দী গোলাম এইভাবে মুক্ত হইয়া গেল। ইহা জুওয়াইরিয়াকে (রাঃ) উল্লিখিত কবিলার বরকতময় আওরত বা কল্যাণকর রমণী নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

উত্তম চরিত্র ও গুণাবলী

হযরত জুওয়াইরিয়ার (রাঃ) চরিত্র অতিশয় উত্তম ছিল। তিনি সকলের সাথে স্নিগ্ধ হাস্যে ও মধুর বচনে কথা-বার্তা বলিতেন। তাঁহার ব্যবহারে যে কোন লোক মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। সত্য, সততা, বিনয়, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকার ও দান-দক্ষিণা তাঁহার চরিত্রের দিকগুলি ছিল।

তিনি অত্যধিক ধর্মনিষ্ঠ ও ইবাদতগুজার মহিলা ছিলেন। আল্লাহর দরবারে অত্যধিক রোনাজারী করা তাঁহার নিত্যকার অভ্যাস ছিল। একদা ভোরে তিনি মসজিদে বসিয়া দোয়ায় রত হইলেন। এই সময় হুযুরে পাক (সঃ) মসজিদের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময়ে তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া গেলেন। দ্বি-প্রহরে ফিরিবার সময়েও তিনি তাঁহাকে সেই একই অবস্থায় দোয়ায় মগ্ন দেখিতে পাইলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, হযরত জুওয়াইরিয়া অত্যন্ত মধুর ভাষিণী এবং শিষ্টাচারিণী ছিলেন। তাঁহার চেহারায় এমন এক উজ্জ্বল সৌন্দর্য ও মধুর কান্তি ফুটন্ত ছিল যে, তাঁহাকে দেখা মাত্র লোকের মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া যাইত।

তিনি বলেন যে, হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ) তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, আদর করিতেন এবং নানা ব্যাপারে সাহায্য করিতেন। আমাকে বিষণ্ন বদনে দেখিলে আমার মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ) অনেক সময় আমাকে তাঁহার পূর্ব জীবনের কাহিনী বলিয়া শুনাইতেন।

হাদীস বর্ণনা

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ) মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) জাবের (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), ওবায়দা বিন আসহাক, তোফায়েল, আবু আইউব মুবাগী, কুলসুম, ইবনে মুস্তালিক, আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বিন আলহাদ এবং কারীব প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করিয়াছিলেন।

পরলোক গমন

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ) হিজরী ৫০ সনের রবিউল আউয়াল মাসে ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন। মদীনার গভর্ণর মারওয়ান তাঁহার জানাযার নামাযের ইমামতী করিয়াছিলেন এবং মদীনার বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ)

নাম, পিতা-মাতা ও বংশ পরিচয়

হযরত উম্মে হাবীবাহর (রাঃ) সাথে হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিবাহ হইয়াছিল আটজন মহিষীর পরে। সুতরাং তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর নবম স্থানীয় সহধর্মিণী ছিলেন। তাঁহার সহিত হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল হিজরী ষষ্ঠ সনে।

হযরত উম্মে হাবীবাহর (রাঃ) নাম ছিল রমলা এবং তাঁহার কুনিয়াৎ (পারিবারিক নাম) ছিল উম্মে হাবীবাহ (রাঃ)।

হযরত উম্মে হাবীবাহর (রাঃ) পিতা ছিলেন আরবের বিখ্যাত কোরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান। ইনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানের সর্বপ্রধান শত্রু ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন ইনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবু সুফিয়ানের পিতা ছিলেন সাখার, তাহার পিতা ছিলেন হারাব, তাহার পিতা ছিলেন উমাইয়া, তাহার পিতা ছিলেন আবদে শামস।

হযরত উম্মে হাবীবাহর (রাঃ) মাতার নাম ছিল সুফিয়া। তাহার পিতা ছিলেন আবুল আস। উম্মে হাবীবাহর (রাঃ) মাতা সুফিয়া হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ফুফু হইতেন। হুযুরে পাক (সঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির ১৭ বৎসর পূর্বে উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রথম বিবাহ ও বৈধব্য প্রাপ্তি

আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন। আবু সুফিয়ানের মত কোরায়েশ প্রধানের কন্যা এবং উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া বহু যোগ্য পাত্রের তরফ হইতে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। কিন্তু একে একে সকল প্রস্তাবই আবু সুফিয়ান বাতিল করিয়া দিলেন। শেষ পর্যন্ত বনু আসাদ গোত্রের ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ নামক এক গুণবান পাত্রকে পছন্দ করিয়া আবু সুফিয়ান কন্যা উম্মে হাবীবাহকে (রাঃ) তাহার নিকট বিবাহ প্রদান করেন। অত্র যুবক খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। খৃষ্টান ধর্মে মদ্যপান নিষিদ্ধ নয় তাই ওবায়দুল্লাহর সীমাতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যাস ছিল।

উম্মে হাবীবাহর (রাঃ) বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রী একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাহারা মনে-প্রাণে ইসলামের নির্দেশাবলী পালন করিতে থাকেন। কিন্তু তখন মুসলমানদের প্রতি মক্কার কোরায়েশদের অত্যাচার সীমাতিক্রম করিতে থাকিলে বাধ্য হইয়া উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) স্বামীসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তথায় কিছু দিন পর্যন্ত তাঁহাদের পারিবারিক জীবন বেশ সুখেই অতিবাহিত হইল। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দারুণ অশান্তির সূত্রপাত হইল। ওবায়দুল্লাহর মদ্যপানের তীব্র অভ্যাস ইসলামোত্তর জীবনেও পরিত্যাগ করা কঠিন হইয়া পড়িল। মদ্যপান ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সুতরাং সে অভ্যাসের তাড়নায় ইসলাম পরিত্যাগ করতঃ পুনরায় খৃষ্ট ধর্মে প্রত্যাবর্তন করিল এবং যথেষ্টভাবে মদ্যপান করিতে লাগিল। স্ত্রী উম্মে হাবীবাহ (রাঃ)-কেও খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিতে বলিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাতে রাজী হইলেন না। যে ধর্মকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা দৃঢ়ভাবেই ধারণ করিয়া রহিলেন এবং এই ধর্মের জন্য তিনি প্রিয় স্বামীও বিসর্জন দিলেন। ওদিকে তাঁহার স্বামীরও জীবনাবসানকাল ঘনাইয়া আসিয়াছিল। অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত কারণে শীঘ্রই সে অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) এইবার স্বামী, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনহারা হইয়া একান্ত অসহায় অবস্থায় চরম অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত বিবাহ

উম্মে হাবীবাহর (রাঃ) বৈধব্য এবং চরম অসহায় অবস্থার খবর শীঘ্রই হুযুরে পাক (সঃ)-এর কর্ণগোচর হইল। তাঁহার এই সঙ্কট ও সমস্যা সমাধানের কোন উপায় না দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া হুযুরে পাক (সঃ) নিজের পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাবসহ আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ)-কে আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশীর সমীপে প্রেরণ

করিলেন। নাজ্জাশী এই প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পরিচারিকা আবরাহাকে উম্মে হাবীবাহর (রাঃ) নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি পরম আনন্দে এই প্রস্তাব কবুল করেন এবং এই সুসংবাদ দানের বদলে আবরাহাকে রূপার দুইটি চিরুণী ও আংটি উপহার দেন এবং তাহার সাথে নিজের পক্ষ হইতে খালিদ বিন সাঈদ উমুরীকে উকীল নিযুক্ত করতঃ নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেন। নাজ্জাশী স্বয়ং হুযুরে পাক (সঃ)-এর তরফ হইতে উম্মে হাবীবাহর মোহরানা আদায় করিয়া বিবাহ পড়াইয়া দেন। বিবাহের কিছুদিন পরেই উম্মে হাবীবাহ জাহাজে আরোহণ করতঃ আবিসিনিয়া হইতে মদীনা চলিয়া আসেন।

স্বভাব-চরিত্র

এই মহিলার স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত সৎ ও মহৎ ছিল। তাঁহার ব্যবহার ও আচরণে সকলেই খুশী হইত। তাঁহার ইবাদাতের ধারা ছিল অতি আশ্চর্য ধরনের। একবার তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট শুনিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন বার রাকাত নফল নামায পড়িবে, তাহার জন্য অবশ্যই বেহেশতে বাসগৃহ নির্মিত হইবে। এইকথা শুনিবার পর হইতে তিনি কোনদিন আর ঐ বার রাকাত নামায তরক করেন নাই।

অধার্মিক ব্যক্তি তাঁহার যতই আপন হউক না কেন, কোনদিন তিনি তাঁহার এবং অধর্মের সহিত কোনরূপ আপস করেন নাই।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে কুফরী অবস্থায় তাঁহার পিতা আবু সুফিয়ান একদা তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করতঃ হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিছানায় বসিবার উপক্রম করিলে তিনি পিতাকে স্বামীর পবিত্র বিছানায় বসিতে নিষেধ করেন। ইহাতে আবু সুফিয়ান মনে দারুণ আঘাত পাইয়া কন্যাকে এইকথা বলিয়া তাঁহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যান যে, হে উম্মে হাবীবাহ! তোমার নিকট আমা অপেক্ষা তোমার স্বামীর বিছানাও কি এত উত্তম?

জবাবে উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলিলেন, এই বিছানা যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবীর। আর আপনি একজন মুশরিক অপবিত্র লোক, সুতরাং আপনি ইহাতে বসিবার যোগ্য নন।

সন্তান-সন্ততি

হযরত উম্মে হাবীবাহর (রাঃ) প্রথম স্বামীর ঘরে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে। পুত্রটির নাম ছিল আবদুল্লাহ এবং কন্যাটির নাম ছিল হাবীবাহ। হাবীবাহ হুযুরে পাক (সঃ)-এর আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয় এবং দাউদ বিন ওরওয়া বিন মাসউদের সহিত পরিণয়াবদ্ধ হয়।

দৈহিক গঠন

হযরত উম্মে হাবীবাহর (রাঃ) দৈহিক গঠন অত্যন্ত সুন্দর এবং সুঠাম ছিল। তাঁহার চেহারাও ছিল উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্ট। আবু সুফিয়ান নিজেই অনেক সময়ে বলিতেন, আমার গৃহে আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মহিলা উম্মে হাবীবাহ রহিয়াছে।

হাদীস বর্ণনা

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) সর্বমোট ৬৫ খানা হাদীস বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে নিম্নোক্ত লোকগণ হাদীস শ্রবণ করিয়া উহা বর্ণনা করিয়াছিলেন। যথা ঃ হাবীবা (রাঃ), মুআবিয়া, ওৎবাহ, আবু সুফিয়ান, আবদুল্লাহ বিন ওৎবাহ, সালিম বিন সাওয়াব, আবুল জিরাহ, সুফিয়া বিনতে শায়বা, জয়নব বিনতে আবু সালমা, ওরওয়া বিন জোবায়ের, আবু ছালেহ আসসামান এবং শাহার বিন হাওশা প্রমুখ।

ইন্তেকাল

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) ভ্রাতা মুআবিয়ার শাসনামলে হিজরী ৪৪ সনে পরলোক গমন করেন এবং মদীনাতেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৩ বৎসর। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর গৃহে তাঁহার কবর দেওয়া হইয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং উম্মে সালমা (রাঃ) সপত্নীদিগকে নিজের নিকট ডাকিয়া পাঠান। তাঁহারা উপস্থিত হইলে তিনি বলেন, সপত্নীদের মধ্যে সাধারণতঃ আপসে যাহা হয়, আমাদের মধ্যেও তাহা কখনও কখনও হইয়াছিল এখন আপনারা আমাকে তাহা মাফ করিয়া দিন। আমার অন্তিম মুহূর্ত সমুপস্থিত। সপত্নীগণ জবাব দিলেন, আমরা আপনাকে ক্ষমা করিলাম। তখন উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলিলেন, আপনারা আমাকে খুশী করিলেন, অতএব আল্লাহও আপনাদিগকে খুশী করুন।

হযরত মায়মুনা (রাঃ)

পিতা-মাতা ও বংশ পরিচয়

হযরত মায়মুনা (রাঃ) উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের অন্তর্ভুক্ত হন হিজরী সপ্তম সনের যিলকদ মাসে। এই মহিলার অন্য নাম ছিল বাররাহ বিনতে হারেস। হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত বিবাহের পর তিনি মায়মুনা নামে পরিচিতা হইতে থাকেন। তাঁহার পিতা-মাতা ও বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

তাঁহার পিতার নাম হারেস, তাহার পিতা হাজান, তাহার পিতা বাজীর, তাহার পিতা হাজম, তাহার পিতা বোয়েরতা, তাহার পিতা আবদুল্লাহ, তাহার পিতা হেলাল, তাহার পিতা আমের, তাহার পিতা সা'মা, তাহার পিতা নাবিয়া, তাহার পিতা বাকার, তাহার পিতা মানছুর, তাহার পিতা আকরামা, তাহার পিতা খাছীফা, তাহার পিতা কায়েস, তাহার পিতা আইলান, তাহার পিতা মুযার। এই ব্যক্তিগণ কোরায়েশ বংশেরই সন্তান ছিলেন।

হযরত মায়মুনার (রাঃ) মাতার নাম ছিল হেন্দা। তিনি হামীর বংশোদ্ভূতা মহিলা ছিলেন। হেন্দার পিতা ছিলেন আওফ, তাহার পিতা জহীর, তাহার পিতা হারেস, তাহার পিতা হাসাতাহ এবং হাসাতাহর পিতা ছিলেন জারশ।

প্রথম দুই বিবাহ

হযরত মায়মুনার (রাঃ) সর্বমোট বিবাহ তিনটি। হুযুরে পাক (সঃ)-এর সাথে বিবাহের পূর্বে তাঁহার আরও দুইটি বিবাহ হইয়াছিল। প্রথম বিবাহটি হইয়াছিল মাসউদ ইবনে আমের নামক জনৈক যুবকের সঙ্গে। প্রথমত, কিছুদিন তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন বেশ সুখেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু হঠাৎ তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীতে দারুণ অবর্গ ও অমিল দেখা দেয়। তখন হযরত মায়মুনা তাঁহার স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হন।

কিছুদিন এই অবস্থায় অতিবাহিত হইবার পর আবু রাহাম বিন আবদুল ওযযা নামক এক ব্যক্তির সাথে মায়মুনার (রাঃ) আবার বিবাহ হয়। কিন্তু এই ঘরেও তেমন শান্তি মিলিল না। বিবাহের কিছুদিন পরেই আবু রাহাম রোগাক্রান্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল।

এইভাবে পর পর দুইটি বিবাহের ফলই অশুভ হওয়ায় হযরত মায়মুনা স্বীয় জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িলেন এবং তিনি আর বিবাহ করিবেন না বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহার কতিপয় হিতৈষী ব্যক্তি এই সময় হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সহিত তাঁহার বিবাহের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা শুরু করিল।

নবী-মহিষী হওয়ার মর্যাদা লাভ

হযরত মায়মুনার (রাঃ) কতিপয় হিতাকাঙ্খী এবং আপন লোক হযরত মায়মুনার (রাঃ) শোক-দুঃখ এবং কষ্ট ক্লেশ দেখিয়া তাঁহাকে তাহারা হুযুরে পাক (সঃ)-এর পত্নীত্ব লাভের ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহারা মায়মুনার (রাঃ) কাছে এই সংবাদ জানাইয়া এই ব্যাপারে তাঁহাকেও আশ্বস্ত এবং আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিলেন। পক্ষান্তরে হুযুরে পাক (সঃ)-এর কাছে মায়মুনার (রাঃ) দুঃখময় জীবনের কথা বিবৃত করিয়া তাঁহাকেও মায়মুনার (রাঃ) প্রতি আগ্রহান্বিত ও সহানুভূতিশীল করিয়া লইলেন। অতঃপর তাঁহারা তাঁহার নিকট হযরত মায়মুনা (রাঃ)-কে স্বীয় পত্নীত্বে বরণ করিয়া তাঁহার দুঃখ মোচন করার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধ বিবেচনা করিয়া তিনি হযরত মায়মুনা (রাঃ)-কে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হন এবং সপ্তম হিজরীর যিলকাদ মাসে তিনি ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রাকালে হযরত মায়মুনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহে হুযুরে পাক (সঃ)-এর পক্ষে অভিভাবকত্ব করেন হুযুর (সঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ)। অতঃপর ওমরা আদায়ের পরে হুযুরে পাক (সঃ) মদীনা প্রত্যাবর্তন কালে পথে সারাফা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। এখানে হুযুরে পাক (সঃ)-এর গোলাম আবু রাফে হযরত মায়মুনা (রাঃ)-কে নিয়া আসেন এবং এইখানে বসিয়াই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা কার্যাদি সমাধা করা হয়।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং লিখক বলেন যে, মায়মুনার (রাঃ) সাথে এই বিবাহই ছিল হুযুরে পাক (সঃ)-এর সর্বশেষ বিবাহ । আসলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণ

বলেন যে, না, হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিবাহ আরও ছিল এবং হযরত মায়মুনা (রাঃ) তাঁহার পত্নীদের মধ্যে দশম স্থানীয়া কিন্তু সর্বশেষ স্থানীয়া নহে।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর নির্দেশ পালন

হযরত মায়মুনা (রাঃ) স্বামী রাসূলে করীম (সঃ)-এর নির্দেশ পালন এবং রীতি অনুসরণে অত্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন। একবার তাঁহার এক পরিচারিকা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর গৃহে গিয়া দেখিল যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাঁহার বিবির বিছানা বেশ দূরুত্ব রক্ষা করিয়া পাতা। সে মনে করিল যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়ত কোন মনোমালিন্যের কারণে এইরূপ করা হইয়াছে। তারপর সে খোঁজ নিয়া জানিতে পারিল যে—না, তাহা নহে। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বিবির স্রাবজনিত কারণে ঐরূপ করা হইয়াছে। সে গৃহে আসিয়া হযরত মায়মুনার (রাঃ) কাছে ঘটনাটি বলিল। তিনি শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন এবং পরিচারিকাকে বলিয়া পাঠাইলেন, তুমি গিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা কর যে, হুযুরে পাক (সঃ)-এর রীতি-নীতির প্রতি তাহারা এরূপ পরান্মুখ কেন? হুযুরে পাক (সঃ) তো সকল সময়ই আমাদের শয্যায় শয়ন ও আরাম করিতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত মায়মুনার (রাঃ) খোদাভীতি সম্পর্কে বলেন যে, তিনি আল্লাহকে এত বেশী ভয় করিতেন যে, তাহার দৃষ্টান্ত মিলা ভার। তাহা ছাড়া গরীব-দুঃখী এবং আত্মীয়-স্বজনের বিশেষভাবে খোঁজ-খবর লওয়া তাঁহার খাস বৈশিষ্ট্য ছিল।

হাদীস বর্ণনা

হযরত মায়মুনা (রাঃ) মোট ৪৬টি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। শুনা যায়, ইলমে ফিকাহতে তাঁহার ভাল দখল ছিল।

একবার জনৈকা মহিলা এইরূপ নিয়ত করিল যে, তাহার রোগ ভাল হইলে সে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়া নামায আদায় করিবে। আল্লাহর রহমতে সে সুস্থ হইয়া বাইতুল মুকাদ্দাস যাত্রার আয়োজন শুরু করিল। রওয়ানা করার পূর্বে সে মহিলা হযরত মায়মুনার কাছে বিদায় নিতে আসিলে তিনি তাহাকে বলিয়া দিলেন, যাও তুমি গিয়া মসজিদে নববীতে নামায আদায় কর। অন্য মসজিদ অপেক্ষা এই মসজিদের নামাযে হাজার গুণ বেশী ছওয়াব লাভ হইয়া থাকে।

পরলোক গমন

হযরত মায়মুনা (রাঃ) ৬১ মতান্তরে ৫১ সনে প্রাণত্যাগ করেন। যে সারাফা নামক স্থানে হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ বন্ধন হইয়াছিল, আল্লাহর কুদরতে সেই স্থানেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিয়াছিল।

তাঁহার জানাযার নামাযের ইমামতী করিয়াছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তিনিই তাঁহাকে কবরেও নামাইয়াছিলেন।

হযরত সুফিয়া (রাঃ)

পরিচিতি

হযরত সুফিয়া (রাঃ) উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের অন্যতমা ছিলেন। সপ্তম হিজরী সনে খায়বর যুদ্ধের পরে হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত তাহার শুভ পরিণয় স্থাপিত হয়। ইহার পিতৃ-মাতৃ প্রদত্ত নাম ছিল জয়নব, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সুফিয়া নামে পরিচিতা হইয়াছেন।

পিতৃ-মাতৃ দুই কুল হইতেই হযরত সুফিয়া (রাঃ) সৈয়দ বংশোদ্ভূতা। তাঁহার পিতার নাম ছিল হাই বিন আখতাব। ইনি কবিলায় বনু নাজির গোত্রের অপ্রদ্বন্দ্বী নেতা এবং নবী হযরত হারুণ (আঃ)-এর বংশধর।

সুফিয়ার (রাঃ) জননীর নাম ছিল জরু। ইনি ছিলেন বিখ্যাত কবিলা বনু কুরাইজা গোত্রের প্রসিদ্ধ সর্দার সামওয়ানের কন্যা। উল্লেখ্য যে, বনি ইস্রাঈলের সমগ্র কবিলাগুলির মধ্যে বনু নাজির ও বনু কুরাইজা নামক কবিলা দুইটিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহারা বহুদিন অবধি আরবের উত্তর সীমান্তে বসবাস করিয়া আসিতেছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ

হযরত সুফিয়ার (রাঃ) সর্বমোট তিনটি বিবাহ হইয়াছিল। অর্থাৎ হুযুরে পাক (সঃ)-এর সাথে বিবাহ ব্যতীত ইহার আরও দুই স্থানে বিবাহ হইয়াছে।

সুফিয়া বাল্যাবধি অত্যন্ত ধীর-স্থির প্রকৃতি বিশিষ্টা ছিলেন। শৈশবে ও কৈশোরে সমবয়সীদের সাথে অত্যন্ত মধুর আচরণ প্রদর্শন করিতেন। প্রভাবশালী সর্দার দুহিতা বলিয়া তিনি বহু দাসদাসী পরিবেষ্টিতাবস্থায় কাল যাপন করিতেন কিন্তু কোনদিন কোন একটি দাস-দাসীর সাথে কঠোর আচরণ প্রদর্শন করা তো দূরের কথা সামান্য একটি কর্কশ কথা পর্যন্ত বলিতেন না।

যৌবনে উপনীত হইবার পর আরব দেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি সালাম বিন মাশকাসুল কারাজীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। প্রথম দিকে নব দম্পত্তির মধ্যে সুখ-শান্তি বিরাজ করিলেও উহা স্থায়ী হইল না। কিছুদিনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে ভীষণ কলহের সৃষ্টি হইল। যাহার ফলে শেষ পর্যন্ত হযরত সুফিয়া স্বামী কর্তৃক পরিত্যাজ্য অবস্থায় পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই অবস্থায় কিছুদিন যাইবার পর পুনরায় বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিনানা ইবনে আবদুল হাকীম নামীয় এক যুবকের সহিত সুফিয়ার (রাঃ) দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুবকটি হেজাযের ধনাঢ্য বণিক এবং খায়বরের প্রসিদ্ধ সর্দার আবু রাফে'র ভ্রাতুষ্পুত্র। খায়বর যুদ্ধের সময় তিনি প্রাণত্যাগ করেন। একই সময় তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতাও যুদ্ধে নিহত হন।

হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহিত সুফিয়ার (রাঃ) বিবাহ

খায়বর যুদ্ধে মুসলমানদের নিরবচ্ছিন্ন জয়লাভ ঘটিল এবং ইয়াহুদীগণ চরমভাবে পরাজিত হইল। তাহাদের মধ্যে যাহারা ধরা পড়িল তাহাদেরকে বন্দী করিয়া একই জায়গায় জড় করিয়া রাখা হইল।

এমন সময় সাহাবী হযরত দাহিয়া কালবী (রাঃ) নিজের জন্য জনৈকা দাসী নিয়োগ সম্পর্কে বন্দিনীগণের মধ্য হইতে যে কোন একটি বন্দিনীর জন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আবেদন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে বন্দিনী সুফিয়াকে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। তখন জনৈক সাহাবী প্রতিবাদ করতঃ অভিযোগ করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! বনু নাজির ও বনু কুরাইজার সর্দার কন্যাকে দাহিয়াকে দেওয়া ঠিক হইবে না; বরং উহাকে আপনার নেওয়া শোভনীয় হইত।

হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহার কথা শুনিয়া তখন দাহিয়ায়ে কালবী (রাঃ)-কে অন্য একটি রমণী প্রদান করেন এবং সুফিয়া (রাঃ)-কে নিজে গ্রহণ করেন। সুফিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাকে স্বীয় পত্নীত্বে শামিল করেন।

অতঃপর খায়বর হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তন কালে পথে সাহবা নামক স্থানে সঙ্গীদিগকে এই শুভ বিবাহোপলক্ষে হুযুরে পাক (সঃ) বিবাহ ভোজ প্রদান করেন। খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের পর হুযুরে পাক (সঃ) এবং হযরত সুফিয়া (রাঃ) একই উষ্ট্রে আরোহণ করতঃ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা করেন।

শারীরিক গঠন

হযরত সুফিয়া (রাঃ) তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র আকৃতি বিশিষ্টা এবং অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা ছিলেন।

হাদীস বর্ণনা

হযরত সুফিয়া (রাঃ) নামমাত্র সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ হাদীস শ্রবণ করিয়াছিলেন। যথা ঃ জয়নুল আবেদীন (রাঃ), ইসহাক বিন আবদুল্লাহ, মুসলিম বিন সাফওয়ান, কেনানা এবং ইয়াজিদ ইবনে মাতাব প্রমুখ।

বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী

হযরত জয়নবের কটুক্তিঃ একবার হুযুরে পাক (সঃ)-এর সফর যাত্রাকালে বিবিগণও সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন উটে সওয়ার হইয়াছিলেন। পথে ঘটনাক্রমে হযরত সুফিয়ার (রাঃ) উটটি অসুস্থ হইয়া পড়ে। হযরত জয়নবের (রাঃ) একটি প্রয়োজনাতিরিক্ত উট সঙ্গেই ছিল। হুযুরে পাক জয়নব (রাঃ)-কে তাঁহার উটটিকে হযরত সুফিয়ার (রাঃ) সাহায্যের জন্য দিতে বলায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমি ইয়াহুদী কন্যার সাহায্যের জন্য উট দিব না কি? জয়নব (রাঃ)-এর কথায় হুযুরে পাক (সঃ) এত বেশী অসন্তুষ্ট হইলেন যে, একাধারে প্রায় দুইমাস পর্যন্ত তাঁহার সহিত যোগাযোগ পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন।

বিপ্লবীদের বেতমিজীঃ হিজরী ৩৫ সনে তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) যখন বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের দ্বারা গৃহে অবরুদ্ধ হইলেন, তখন হযরত সুফিয়া (রাঃ) পরম সাহসিকতার সাথে খলীফাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। খলীফার গৃহে যখন রসদ পানীয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তখন তিনি খচ্চরে আরোহণ করতঃ কিছু পানিসহ খলীফার গৃহ অভিমুখে রওয়ানা করেন হঠাৎ

বিপ্লবীগণ দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার খচ্চরটিকে প্রহার করিতে থাকে। তিনি তখন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, ওহে বাপ্‌গণ! তোমরা এইভাবে আমাকে অপমানিত করিও না, আমি চলিয়া যাইতেছি। এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া হযরত আলীর (রাঃ) পুত্র ইমাম হাসান (রাঃ)-কে খলীফার গৃহে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার কাজে পাঠাইয়া দেন। হযরত হাসান (রাঃ) এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন।

রাসূল কর্তৃক সান্ত্বনা দান ঃ একবার হজ্জ সফর কালে হযরত সুফিয়ার (রাঃ) দুর্বল উটটি চলৎশক্তি হারাইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। তখন সুফিয়া (রাঃ) মনের দুঃখে ক্রন্দন শুরু করিলেন। হুযুরে পাক (সঃ)-এর নিকট এই খবর পৌঁছিলে তিনি সুফিয়ার (রাঃ) কাছে উপস্থিত হইয়া নিজের পবিত্র চাদর দ্বারা তাঁহার চোখের পানি মুছিয়া দিলেন এবং যথাযথ সান্ত্বনা দান করিলেন।

উত্তম রান্না ও আয়েশার (রাঃ) অশোভন আচরণ ঃ সুফিয়ার (রাঃ) গুণসমূহের মধ্যে উত্তম রান্নাও অন্যতম। তিনি বহু উপাদেয় খাদ্য পাকাইয়া রাসূলুল্লাহকে ও সপত্নীগণকে আহার করাইতেন। হুযুরে পাক (সঃ) যখন হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে অবস্থান করিতেন, তখন সুফিয়া (রাঃ) ভাল খাবার পাকাইয়া হুযুরে পাক (সঃ)-এর জন্য আয়েশার (রাঃ) গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত সুফিয়া (রাঃ) দুইজনেই হুযুরে পাক (সঃ)-এর জন্য পৃথক পৃথকভাবে গোশত পাকাইতেছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) কিন্তু রান্নাবান্না কাজটিতে মোটেই সুযোগ্য নহেন। হযরত রাসূলে পাক (সঃ) ঐদিন হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন।

সুফিয়ার (রাঃ) রান্না পূর্বেই হইয়া গেল। তিনি স্বীয় পরিচারিকার দ্বারা পেয়ালা ভর্তি মাংস হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) রান্না তখনও হয় নাই। সুফিয়ার (রাঃ) মাংস দেখিয়া তিনি খুবই বিরক্ত হইলেন এবং পরিচারিকার হাত হইতে মাংসের পেয়ালাটি নিয়া দূরে ছুড়িয়া দিলেন। গোশত চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িল ও পেয়ালাটি ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গেল।

এই ব্যাপার দেখিয়া হুযুরে পাক (সঃ) বলিলেন, আয়েশা ! ইহা অত্যন্ত খারাপ কাজ। তখন আয়েশা (রাঃ)-ও তাঁহার অন্যায় উপলব্ধি করিতে পারিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আমার এই অন্যায়ের এখন কি প্রতিবিধান করা যায়?

হুযুরে পাক (সঃ) উত্তরে বলিলেন, ইহার প্রতিবিধান হইবে ঐরূপ একটি পেয়ালা এবং ঐরূপ পাকানো এক পেয়ালা মাংসের দ্বারা।

বিদায় হজ্জের সঙ্গিনী ঃ হুযুরে পাক (সঃ)-এর বিদায় হজ্জের সঙ্গিনী বিবিগণের মধ্যে হযরত সুফিয়া (রাঃ)-ও ছিলেন অন্যতম।

পরলোক গমন

হযরত সুফিয়া (রাঃ) হিজরী ৫০ সনের রমজান মাসে প্রাণত্যাগ করেন। মদীনার জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। প্রাণত্যাগ কালে তিনি প্রায় লক্ষাধিক টাকার বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া যান। তাহা হইতে তাঁহার অসিয়ৎকৃত এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি তাঁহার ইয়াহুদী ভাগিণীকে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়া (রাঃ)

পরিচিতি

হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়া সম্পর্কে অনেক লিখক, ঐতিহাসিক এবং ওলামায়ে কেরাম এই মত পোষণ করেন যে, তিনি হুযুরে পাক (সঃ)-এর মহিষীগণের মর্যাদাশালিনী তথা পুণ্যময়ী আজওয়াযে মুতাহহারাতের অন্তর্ভুক্ত মহিলা ছিলেন না। তিনি ছিলেন হুযুরে পাক (সঃ)-এর এক দাসীতুল্যা মহিলা। আসলে এই ধারণাটি ভুল তথ্যভিত্তিক সন্দেহ নাই। প্রকৃত ঘটনা এই যে, হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়াও উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের অন্যতমা। প্রায় সকল অভিজ্ঞ, বহুদর্শী এবং মুহাক্কিক লিখকগণেরই মত ইহা।

হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়া (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর দ্বাদশ স্থানীয় পত্নী ছিলেন। ৭ম হিজরী সনের শেষের দিকে আফ্রিকার শাসনকর্তা মিকাউকাস মদীনায় হুযুরে পাক (সঃ)-এর দরবারে শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্যের নিদর্শন হিসাবে বহু মূল্যবান সম্পদসহ স্বীয় চাচাত ভগ্নি মারিয়ায়ে কিবতিয়াকে রাষ্ট্রীয় উপঢৌকন বা খেলয়াতস্বরূপ প্রেরণ করেন।

হুযুরে পাক (সঃ) তৎকালীন আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি অুনযায়ী উহা গ্রহণ করেন। অতঃপর উপঢৌকন প্রেরক শাসনকর্তার সম্মানের লক্ষ্যে হুযুর (সঃ) মারিয়ার প্রতি ইসলাম পেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহার সহিত স্বীয় বিবাহ কার্য সম্পন্ন করতঃ তাঁহাকে নবী-মহিষীদের পর্যায়ভুক্ত করিয়া দিলেন।

এই বিবাহ সংঘটিত হয় হিজরী ৭ম সালের শেষের দিকে এবং এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আর কোন স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই। এর পরেই নূতন কোন স্ত্রী গ্রহণ ও বর্জন অহীযোগে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়ার গর্ভেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অন্যতম পুত্র হযরত ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেন। হিজরী ৮ম সালে আওয়ালী নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়া সেখানেই বসবাস করিতেন। হযরত ইব্রাহীমের জন্ম উপলক্ষে লোকেরা আওয়ালীকে মাশরাবাই ইব্রাহীম নামে অভিহিত করে।

হযরত ইব্রাহীমের ধাত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন সাহাবী আবু রাফে'র পত্নী বিবি ছালমা। হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়া পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন এই সংবাদ নিয়া তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে আগমন করিলেন তখন শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে একটি গোলাম দান করিলেন।

ইব্রাহীমের বয়স যখন ৭ দিন হইল, তখন তাঁহার আকীকা দেওয়া হইল এবং মাথা মুণ্ডন করিয়া চুলের ওজন পরিমাণ রূপা খয়রাত করা হইল। আল্লাহ পাকের প্রিয়নবী ইব্রাহীমের নামেই তাঁহার নামকরণ করা হইল।

ইব্রাহীমকে দুধপান করানোর জন্য বহু আনসার মহিলা প্রার্থী হইলেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইব্রাহীমের জন্য খাওলা বিনতে যায়দুল আনসারীকে দাই নিযুক্ত করেন এবং প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে কয়েকটি ফলবান খেজুর বৃক্ষ দান করেন।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, ইব্রাহীমের দুধপান করানোর জন্য যে দাই নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহার নাম ছিল উম্মে রাফে'। এই প্রসঙ্গে কাজী আয়াজ বলিয়াছেন যে, উম্মে রাফে' এবং খাওলা একজনেরই দুইটি নাম। কারণ উম্মে রাফে' ছিল ডাক নাম এবং খাওলা ছিল আসল নাম। আর তাঁহার স্বামীর নাম ছিল বারা বিন আউদু। আর তাহার ডাক নাম ছিল আবু ছাইফ। এইজন্য তাঁহার স্ত্রীকে উম্মে ছাইফাও বলা হইত।

তাহাদের বাসস্থান ছিল মদীনার উপকণ্ঠে। বারা কর্মকারের কাজ করিত। এইজন্য তাহার গৃহে প্রায়ই ধোয়ার আধিক্য পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুত্র স্নেহের টানে সেখানে যাইতেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন।

হযরত ইব্রাহীম ধাত্রীমাতা খাওলার গৃহেই পরলোক গমন করেন। মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবী আবদুর রহমানসহ সেখানে গমন করিলেন। হাত সম্প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া নিলেন। উভয় চোখ বাহিয়া বিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আবদুর রহমান আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)! আপনার অবস্থা এমন কেন? অর্থাৎ আপনি এইভাবে চোখের পানি ফেলিতেছেন? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আজ আমার অপত্য স্নেহ অশ্রুবিন্দু হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। আসলে আমি কাঁদিতেছি না।

ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্য গ্রহণ হইয়াছিল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ছেলে মারা গিয়াছে বলিয়াই আজ সূর্য গ্রহণ হইয়াছে এবং আকাশ শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছে এবং সারা পৃথিবীতে বিদঘুটে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ করার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, সূর্য গ্রহণ এবং চন্দ্র গ্রহণ হইল আল্লাহর নিদর্শন। কাহারও জীবন ও মরণের সঙ্গে এইগুলির কোন যোগাযোগ নাই। সুতরাং গ্রহণ লাগা বা না লাগার পিছনে কাহারও মৃত্যুর কোন সংযোগ নাই।

ছোট একটি খাটিয়ায় করিয়া ইব্রাহীমের লাশ আনা হইল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাহার নামাযে জানাযা পাঠ করিলেন। বিশিষ্ট সাহাবী উসমান বিন মাজউনের কবরের পার্শ্বে তাঁহার কবর খনন করা হইল। হযরত উসামা ও ফজল বিন আব্বাস লাশ কবরে রাখেন। দাফন শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ) কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। তারপর দাফন কাজ শেষ হইলে তাঁহার কবরের উপর সামান্য পানি ছিটাইয়া দেওয়া হইল এবং নির্দিষ্ট চিহ্নের দ্বারা কবরটিকে চিহ্নিত করা হইল।

হযরত ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন-ক্ষণ নিয়ে মতভেদ আছে। এই প্রসঙ্গে আবু দাউদ ও বায়হাকীর বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, তিনি অষ্টম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দুইমাস দশদিন বয়সে হিজরী নবম সালে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

কিন্তু ওয়াকেদীর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, হযরত ইব্রাহীম দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মৃত্যু বরণ করেন। এই বর্ণনা অনুসারে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল সম্ভবতঃ পনের মাস।

আবার কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে, তাঁহার বয়স হইয়াছিল এক বছর দশমাস ছয়দিন। এই ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে জান যায় যে, হযরত ইব্রাহীমের মৃত্যুকালে বয়স ছিল সতের কিংবা আঠার মাস। এই মতই অধিক গ্রহণযোগ্য।

পরিশিষ্ট

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর বহু বিবাহের হেতু

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা সবারই জানা কথা। একাধিক বলিলেই ঠিক হইবে না, যেহেতু তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন একে একে মোট বারটি এবং একসাথে একই সময় তাঁহার মোট দশজন পত্নীই বর্তমান ছিলেন।

তবে অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, তাঁহার এই বহু বিবাহের বিষয়টিকে একটি সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করিয়া বহু বিধর্মী বিদ্বেষপরায়ণ ঐতিহাসিক তাঁহাদের হিংসা ও ঈর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে এতটুকু কসুর করে নাই। তাহারা এই বস্তুর দ্বারা রাসূল (সঃ)-এর নিষ্পাপ, নিখুঁৎ চরিত্রে কলঙ্কের কালি লেপন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে তাহারা ইতিহাসের জ্বলন্ত প্রমাণ ও সত্যকে ঢাকিয়া রাখিয়া অসত্য ও অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে এতটুকু মাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। অবশ্য তাহাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উজ্জ্বল ও মহান চরিত্র এতটুকু মাত্র ম্লান হয় নাই। কারণ যাহা দিবালোকের মত চিরসত্য, তাহাকে মিথ্যা ও কপটতার দ্বারা কোনদিনই বিকৃত করা বা উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

বিধর্মী ঐতিহাসিকেরা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) দুষ্ট কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছে তিনি শ্লথ চরিত্র এবং কামুক লোক ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। ইহা তাহাদের জাজ্জ্বল্যমান স্পষ্ট মিথ্যা প্রচারণা এবং ঈর্ষা ও হিংসা প্রসূত কু-সমালোচনা ছাড়া আর কিছু নহে। আসলে সত্য ভিত্তিক ও নিরপেক্ষ ইতিহাসের আলোকে তাঁহার বহু বিবাহের কারণগুলি উদঘাটন করিলে যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহা কিছুটা বিস্তারিতভাবে আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দান করে—আরবের মধ্যে মক্কার কোরায়েশ বংশ সম্মান ও মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। সেই অতুলনীয় সম্মানিত ও প্রভাবশালী বংশোদ্ভূত সন্তান হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বাল্য হইতেই সত্য-সততা, বিনয়-নম্রতা প্রভৃতি মহৎ গুণে অদ্বিতীয় ছিলেন। যৌবনে তাঁহার চরিত্র মহিমার খ্যাতি সমগ্র আরবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি তাঁহার সবল সুঠাম স্বাস্থ্য, দৈহিক গঠন ও অপরূপ লাবণ্য প্রতিটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সত্যি বলিতে কি, এই সমস্ত কারণে মুগ্ধ আরবদের যে কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট নিজের কন্যা বা ভগ্নি বিবাহ দিয়া নিজেকে ধন্য এবং গৌরান্বিত ভাবিতে আগ্রহী ছিল। এজন্য তাহারা লালায়িতও ছিল। মোটকথা, সে যুগে আরব দেশের যে কোন প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির রূপসী ও গুণবতী কন্যা বা ভগ্নি ভার্য্যারূপে লাভ করা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্য কেবলা মাত্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। অথচ দেখা যায়, পঁচিশ বৎসরের যুবক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এসবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া চল্লিশোর্ধ বয়স্কা প্রৌঢ়া রমণী খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহ করিলেন। নিশ্চয়ই ইহা তাঁহার কাম প্রবণতা বা যৌবন বেগের নিদর্শন নহে; বরং নিঃসন্দেহরূপে ইহা তাঁহার চারিত্রিক সবলতার সাক্ষ্য বহন করে।

তারপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি সেই বিবি খাদীজা (রাঃ)-কে নিয়াই পারিবারিক জীবনযাপন করেন। বিশেষতঃ নবুয়ত প্রাপ্তির পর যখন তিনি জোরে-শোরে মানব মুক্তির

প্রকৃত ধর্ম ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন তখন বিধর্মী আরবগণ তাঁহাকে বাধা প্রদানে ব্যর্থ হইয়া অবশেষে এই প্রস্তাব দেয়—মুহাম্মদ (সঃ)! তোমাকে আমরা আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কন্যা বিবাহ করাইয়া দেই, তুমি তোমার এই প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত হও। কিন্তু তিনি তাহাদের এই প্রস্তাব একান্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করতঃ স্বীয় কর্তব্যে অবিচল থাকিয়া নিষ্ঠা ও সবল চরিত্রের পরিচয় দেন। ইহা অপেক্ষা নিষ্কলুষ চরিত্র আর কি হইতে পারে?

বিবি খাদীজার (রাঃ) মৃত্যুর পরে তিনি যে আর একটি বিবাহ করেন, তাহাতে তাঁহার নিষ্কাম চরিত্রের প্রমাণ আরও বেশীরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাঁহার সাওদা নাম্নী সেই মহিষী ছিলেন সম্পূর্ণই বৃদ্ধা রমণী। যে কোন বৃদ্ধ পুরুষও এইরূপ রমণীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয় না। কারণ মানুষ বিবাহ করিয়া থাকে মুখ্যতঃ এবং প্রধানতঃ দাম্পত্য সুখ ভোগের জন্য। কিন্তু হযরত রাসূলে পাক (সঃ)-এর জীবনে তাহা ছিল অতি তুচ্ছ এবং সাধারণ বিষয়। সুতরাং সাওদা যখন বলিলেন, হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আমি পরকালে বেহেশতে আপনার অতি নিকটবর্তীনীরূপে বসবাসের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। অতএব আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন।

দয়ালু নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) অনাথা বৃদ্ধা নারীর এই করুণ মিনতি প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইলেন না। বরং বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। কত কঠোর ত্যাগী ও বলিষ্ঠ চরিত্র যুবকের পক্ষে এইরূপ কাজ করা সম্ভব—পাঠকগণ তাহা চিন্তা করুন।

কোন কোন বিদ্বেষপরায়ণ লিখকেরা বলেন, প্রৌঢ়া বয়স্ক মুহাম্মদ (সঃ) বিবি আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ কতিপয় অল্পবয়স্কা ও যুবতী রমণী বিবাহ করিয়া কামুকতার পরিচয় দিয়াছেন। একাজ তাঁহার মত মহান ধর্ম প্রচারকের পক্ষে শোভনীয় হয় নাই। একথাও তাহাদের হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষসূচক অন্যায় উক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পবয়স্কা ও যুবতী রমণী রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিবাহ করিয়াছিলেন, একথা সত্য; কিন্তু তাহার কারণসমূহ নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ দ্বারা হুযুরে পাক (সঃ)-এর চরিত্র দুর্বল নয় বরং তাহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর ইহাই প্রমাণিত হয়।

হুযুরে পাক (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে যখন বিবাহ করার প্রস্তাব দেন তখন আয়েশার (রাঃ) বয়স মাত্র ছয় বৎসর। অর্থাৎ তিনি তখন মাত্র একটি কচি কিশোরী বালিকা। এইরূপ একটি কচি বয়সের বালিকাকে কেহ বিশেষ প্রবৃত্তির টানে যে বিবাহ করিতে চাহিবে, তাহা কখনও কল্পনাও করা যায় না। তবে হুযুরে পাক (সঃ) তাঁহাকে বিবাহ করিতে আগ্রহী হইলেন কেন এই প্রশ্নের উদয় হওয়া একান্তই স্বাভাবিক।

মূলতঃ হুযুরে পাক (সঃ)-এর এই আগ্রহের মূলে ছিল সুদূর প্রসারী কারণ নিহিত এবং সে কারণসমূহ ছিল আল্লাহর ধর্ম ইসলামের প্রসার এবং মুসলিম সমাজের হিত ও কল্যাণ সাধন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে প্রাক-ইসলামিক যুগ হইতে হযরত আয়েশার (রাঃ) পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল এবং এই উসিলায় হুযুরে পাক (সঃ) বন্ধু আবুবকর (রাঃ)-এর গৃহে যাতায়াত করিতেন। এই সুযোগে শিশু আয়েশার (রাঃ) চারিত্রিক গুণাবলী তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছিল। তিনি পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, অপূর্ব ধীশক্তিসম্পন্না এই বালিকার দ্বারা পরিণামে মুসলিম সমাজের অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। সুতরাং তিনি তাঁহাকে নিজের

একান্ত সন্নিকটে ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আনিয়া শিক্ষা-দীক্ষায় পরিপূর্ণ এবং সুযোগ্য করিয়া তোলা নিজের একটি বড় কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। বস্তুতঃ বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর পরিণত জীবনে তাঁহার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আকাঙ্খা পরিপূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরে পাক (সঃ)-এর সহধর্মিণীর আসন গ্রহণ করিয়া দীর্ঘদিন তাঁহার ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সাহচর্য লাভের ফলে রাসূলে করীম (সঃ)-এর যবানী এবং আমালী শিক্ষাসমূহ পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ নারীদের প্রয়োজনীয় গোপনীয় শরয়ী বিধি-বিধানগুলি যাহা স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত অন্যের পক্ষে কার্যকরভাবে শিক্ষালাভ করা বিশেষ কষ্টকর। সেগুলি অত্যন্ত নিখুঁৎ ও সুষ্ঠুরূপে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হইতে অবাধে জানিয়া লইয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) মুসলিম নারী সমাজকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাহাছাড়া সাধারণভাবেও স্বীয় ধীশক্তি ও গুণজ্ঞান বলে রাসূল (সঃ)-এর শিক্ষাসমূহ যত ব্যাপকভাবে তিনি অর্জন করিয়াছিলেন, রাসূলুল্লাহর (সঃ) অনেক নামজাদা পুরুষ সাহাবীও ততটা শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, অনেক জটিল বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধানে ব্যর্থ হইয়া প্রধান সাহাবীগণ বিবি আয়েশার (রাঃ) নিকট উহার মীমাংসাকল্পে উপস্থিত হইয়াছেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) অবলীলাক্রমে সেই সব বিষয় নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। এই অপরিসীম যোগ্যতা তিনি অর্জন করিয়াছিলেন মাত্র দুইটি কারণে। উহার একটি তাঁহার সুগভীর জ্ঞান ও অপূর্ব ধীশক্তি এবং অপরটি তাঁহার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণীর আসন লাভের সুযোগ।

হযরত আয়েশার (রাঃ) মত রমণীর দ্বারা সমাজের এইরূপ ব্যাপক উপকার লাভের আশায়ই দূরদর্শী রাসূলে করীম (সঃ) তাঁহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অথচ হিংসুটে জীবনী লেখক ও ঐতিহাসিকগণ এই সকল ঘটনার দিকে দৃকপাত না করিয়া কিরূপ হীনদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, পাঠক-পাঠিকা তাহা অতি সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন।

কতিপয় যুবতী নারীকে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারও বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমাবস্থায় নানারূপ বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতার মুখে ইসলাম অতি ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করিতেছিল। তদুপরি যে সকল পুরুষগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রায় সকলেই ধন-সম্পদহীন, নিঃস্ব ও দরিদ্র ছিলেন। তাহাদের পক্ষে অন্যের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করা দূরের কথা নিজেরাই তাহারা যারপর নাই কষ্ট-ক্লেশের মধ্য দিয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় কিছু কিছু মহিলাও যখন আত্মীয়-বান্ধবদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতঃ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখন তাহাদের সম্মুখে প্রধানতঃ দুইটি সমস্যাই উপস্থিত হইল। একটি তাহাদের ভরণ-পোষণ, অন্যটি সিদ্ধ উপায়ে নারীত্বের প্রয়োজন মিটাইয়া পবিত্র জীবনযাপন। স্বাভাবিকভাবেই এই দুইটি বিষয়ের দায়িত্ব হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর উপর অর্পিত হইল। নিঃস্ব অভাবগ্রস্ত নওমুসলিমগণ এই জাতীয় গুরুতর বোঝা বহন করিতে অক্ষম হওয়ায় বাধ্য হইয়া হযরত রাসূলে করীম (সঃ) উল্লিখিত প্রকারের কোন কোন অনাথ ও নিরাশ্রয়া মহিলাকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের সর্বপ্রকার দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। অবশ্য তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। কিন্তু তবু একান্ত দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যের তাগীদেই তাঁহাকে এইভাবে সমস্যার সমাধান করিতে হইয়াছিল।

ইহাছাড়া হুযুরে পাক (সঃ)-এর বহু বিবাহের আরেকটি কারণ ছিল, ইসলামী শরীয়ত বিধি নিজের দ্বারাই কার্যকরভাবে প্রচলন করা। প্রাক-ইসলামিক যুগে আরবের লোকগণ কতকগুলি অমূলক কুসংস্কারাবদ্ধ ছিল। যথা ঃ মুখ ডাকা ভ্রাতা বা পিতার কন্যার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে তাহারা একান্ত নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ মনে করিত। কিন্তু ইসলাম তাহা সমর্থন করে না। ইসলামের মহান নীতিতে উহার কোনই স্থান নাই। এইকথা প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম সমাজকে দেখাইয়া উপরোক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সর্বশেষ কথা রাসূলে পাক (সঃ) যত অধিক সংখ্যক বিবাহই করুন না কেন, তিনি ছিলেন আল্লাহর মনোনীত নবী, শ্রেষ্ঠ মানব এবং রাসূলদিগের প্রধান ব্যক্তি। দুনিয়াতে মানবদিগের জন্য শ্রেষ্ঠ বিধান ও আদর্শ স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন তিনি। সুতরাং নবীসুলভ যাবতীয় গুণ ও যোগ্যতাসহ আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তাঁহার এই জগতের বুকে। নিজে তিনি সচ্ছল কিংবা অসচ্ছল যে অবস্থার লোকই হউন না কেন সকল বিবিগণের প্রতিই তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। ইনছাফ বা সমতা রক্ষা করা তিনি নিজের উপরে সর্বপ্রধান কর্তব্য মনে করিতেন। সকলকে তিনি একইরূপ ভালবাসিতেন। সকলের প্রতি সমান খেয়াল রাখিতেন এবং সমভাবে সকলের হক, হকুক ও প্রাপ্য আদায় করিতেন। যাহা সাধারণ বা বহু অসাধারণ মানুষের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাঁহার পক্ষে তাহা অতীব সহজ ও সাধারণ ব্যাপার ছিল। সকল বিবিই তাঁহার প্রতি একইরূপ অনুরক্ত ছিলেন। কেহই তাঁহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হন নাই এবং কখনও কেহ তাঁহার প্রতি অসমদর্শিতার অভিযোগ আনার সুযোগ লাভ করেন নাই।

তাহাছাড়া এত বেশী সংখ্যক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের কেহই কখনও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হইতে নারীত্বের হক লাভে এতটুকু বঞ্চিত হন নাই। ইহার কারণ হইল আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবী-রাসূলকে এক বিশেষ ক্ষমতা, শক্তি-সামর্থ্য ও গুণ দান করিয়াছেন, যাহা সাধারণ লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না। নবী-রাসূলগণও অন্যান্যদের মত একইরূপ মানুষ হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য কেবল এইখানেই। মানব সুলভ জন্মগত উপাদানসমূহ উভয়ের মধ্যে থাকিলেও সাধারণ লোকগণ উহার প্রভাবাধীন হইয়া থাকে আর নবী-রাসূলগণ সেগুলিকে নিজের অধীন করিয়া লন।

নবী-রাসূলগণ যে কেবল সাধারণ মানুষ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক ও মানসিক দিক দিয়াই সবল তাহা নহে, বাহ্যিক তথা দৈহিক বা শারীরিক দিক দিয়াও একজন নবী স্বাভাবিক অবস্থায় অন্ততঃ চল্লিশজন সাধারণ লোকের শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী। এইক্ষেত্রে শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবীর শক্তি-সামর্থ্য যে আরও অধিক হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? অতএব তাঁহার স্ত্রীদিগকে মানবীয় চাহিদা পূরণ করিতেও তাঁহাকে কখনও অন্যায় ও অযৌক্তিক পথের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। এই কারণেই হুযুরে পাক (সঃ)-এর প্রত্যেক পত্নী তাঁহাকে মনে-প্রাণে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার জন্য প্রত্যেকে তাঁহার নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারিতেন। তাঁহাকে তাঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন মনে-প্রাণে একান্তভাবে। তাঁহার ব্যবহার, আচরণ এবং প্রণয় প্রীতিতে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হইয়া নিজেদের জীবন ধন্য ও সার্থক মনে করিতেন।